গল্প-সঞ্চয়ন

প্রবোধ সান্যালের

গল্প-সঞ্চয়ন

সন ১৩৭৬
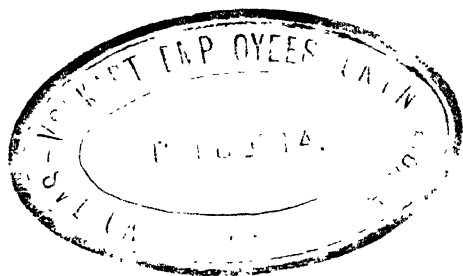
GB8984

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ
কলিকাতা—৬

তাসের ঘর

বিহারের কোনো একটি স্বাস্থ্যকর অঞ্চলে সেবার অনেকগুলি পরিবারের আবির্ভাব ঘটেছিল। সকলেই বাঙালী এমন নয়, বেশি দামের বাড়ী ভাড়া নিয়ে দুই এক ঘর ভদ্র হিন্দুস্থানী পরিবারও আশেপাশে এসে উঠেছিলেন। শহরটি ছোট, কিন্তু নাম ডাক আছে। এখানকার ইদারার জলে নাকি ধাতব পদার্থ অনেক বেশি, বিশেষ চুন আর লোহা; বাঙালীর অন্ত্রে তন্ত্রে এ দুটোর দরকার নাকি প্রচুর! দ্বিতীয় কারণ হোলো, শহরের বাড়ীগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন এবং একটির থেকে আর একটি অনেক দূরে—মাঝখানে মসৃণ প্রান্তর, দূরে দূরে পথগুলি আঁকাবাঁকা। আরো দূরে বনময় উপত্যকা। বাতাসটি লঘু, স্বাস্থ্যকর এবং অগ্নি উদ্রেককারী। আসল কথা, অম্ল অজীর্ণ না থাকায় বাঙালীর কাছে এ অঞ্চল খুবই প্রিয়, এবং এখানকার নিরিবিলি অবকাশ যথেষ্টই আরামদায়ক।

শোন নদী এখান থেকে বেশি দূরে নয়। পাটনা, কিউল, ভাগলপুর ইত্যাদি শহর থেকে প্রায়ই এদিকে বড় বড় বজরা আসে; মহাদেওগঞ্জের মন্দির দর্শনে, শোনপুর মেলায় এই পথ দিয়ে যাত্রীরা চলাচল করে। মাঝপথে হাটতলা, হনুমানপুর, দরিয়াগঞ্জ প্রভৃতি নানা জায়গা আছে।

এই জলপথ দিয়েই কয়েকদিন পূর্বে চৌধুরী সাহেব একখানা বড় দরের বজরা ভাড়া ক'রে সস্ত্রীক এসে এখানে একটি বাড়ীভাড়া নিয়েছিলেন। স্ত্রীর স্বাস্থ্যও ভালো, শরীরও ভালো, কিন্তু মাঝে মাঝে মাথাধরার ব্যারাম আছে। ডাক্তার বলেন, নদীর খোলা বাতাস রোগীর পক্ষে খুবই স্বাস্থ্যকর হবে।

আভাবতী প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিল, কলকাতা ছেড়ে গেলে মাথাধরাও ছেড়ে যাবে। অত টাকা খরচ ক'রে নৌকা ভাড়া ক'রে কাজ নেই।

সে কখনো হয়, তুমি বলো কি?—চৌধুরী সাহেব ব্যস্ত হয়ে বললেন, মাথার সঙ্গে সমস্ত দেহের যোগ। মাথাই ত সব। টাকা সামান্য, কিন্তু শরীরটা সামান্য নয়, আভা।

আভা বললে, এখানকার জল হাওয়াতেই সব সারতে পারতো। ট্রেনে এলে এতো খরচ মোটেই হোতোনা।

কথাটা সত্য, কিন্তু চৌধুরী সাহেব সেকথায় কান দেননি। স্ত্রীর স্বাস্থ্যে সংবাদ স্ত্রীর অপেক্ষা তিনিই বেশি জানেন, স্ত্রীরা স্বামীর ব্যয় সঙ্কোচ করতে চায় নিজের অসুবিধা সত্ত্বেও।

চৌধুরী সাহেব বলেছিলেন, তোমার মন প্রফুল্ল থাকার ওপর আমার ভ্রমণের আনন্দ নির্ভর করছে। আমার অস্বস্তি তোমাকে বোঝাতে পারবো না আভা,—তোমার শরীর আর মন ভালো থাকাটাই হোলো আমার সব কাজের উৎসাহ।

তাদের ছোট বাড়ীটি মাঠের মাঝখানে হোলেও আশেপাশে প্রতিবেশীদের বাগানের সীমানা। পূর্বদিকে দূরে শোন নদী, সুতরাং ভোর হ'তে না হ'তেই রাঙা সূর্যের আলো এসে একেবারে শোবার ঘরের মধ্যে পড়ে অক্টোবরের প্রথম কিন্তু এরই মধ্যে মাঠে মাঠে শিশিরবিন্দু ঝলমল করে নদীর বালুচরের উপর প্রভাত সূর্যের দীপ্তি এখান থেকেই চোখে পড়ে। প্রাতঃভ্রমণ শেষ ক'রে স্বামী-স্ত্রী যখন ফিরে আসে, তখন আশেপাশে পল্লীবাসীরা জেগে ওঠে।

কলকাতা থেকে সেন পরিবাররা এসেছিল। কিন্তু বিদেশে এসেও ওরা কলকাতার অভ্যাসগুলো ভুলতে পারেনি! সকাল সন্ধ্যা বারান্দাতেই বৈঠক বসায়, ভ্রমণের কোনো উৎসাহ প্রকাশ করে না। মেয়েরা অভ্যাস মতো ঘরের কাজকর্ম নিয়েই ব্যস্ত থাকে, পুরুষদের ফাই ফরমাস খাটে, সেবাই করে,—কিন্তু শরীরের দিকে তাদের কোনো নজর নেই। স্বাস্থ্য ফেরাতে এসেও অভ্যাসের দাসত্ব করতে ওরা ভোলেনি। সেই রান্না আর বাসন মাজা, সেই সারাদিন গৃহস্থালীর চক্রান্তে ঘুরপাক খাওয়া,—আনন্দ করবার কোনো অবকাশ নেই।

আভা বললে, কি করবে বলো, খাওয়া দাওয়া ত সঙ্গে সঙ্গেই যায়।

যায় জানি—চৌধুরী বললেন, কিন্তু কেন? কেন ওই ষোড়শ উপচারে ভোজনের আয়োজন। একথা জানা উচিৎ, বিদেশে আহারের ব্যবস্থা সরল হওয়া দরকার,—তোমাকে যদি ওই সব নিয়ে ব্যস্তই থাকতে হোলো, তোমার রিলিফ কোথায়? তোমার শরীরের উন্নতি হবে কেমন ক'রে? ছিছি, ওরা কী অত্যাচর করে বলো ত ওদের মেয়েদের ওপর? নিজেরা স্ফূর্তি করে, তাস খেলে,—আর মেয়েরা খাটে ঝিয়ের মতন! ঘর থেকে

বেরিয়ে ঘরেই এসে ঢুকলো,—মেয়েদের ওপর কতখানি অবিচার হচ্ছে, তুমিই বলো ত আভা?

চৌধুরী সাহেব একটু খুঁতখুঁতে সন্দেহ নেই। স্ত্রীর সুবিধার জন্য তিনি আগেই তাঁর পাচককে ট্রেন যোগে পাঠিয়েছেন, দু'জন চাকর এসেছে তাঁর সঙ্গে। এখানে এসে ফুলবাগান রক্ষা করার জন্য তিনি এক স্থানীয় মালীকে মোতায়েন রেখেছেন। আহারাদি আয়োজন ব্যাপারে আভাকে বিন্দুমাত্র পরিশ্রম করতে হয় না। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি হাতের কাছে তিনি সমস্তই পান, অভিজ্ঞ পাচক আর চাকর কোনো ত্রুটি অথবা অভাব রাখেনা। এখানে এসে কেবল ম[illegible]মণ, স্বচ্ছ জীবনধারা, নিরবচ্ছিন্ন অবকাশ আর আরাম,—স্ত্রীর প্রতি এই হোলো প্রত্যেক স্বামীর কর্তব্য। বাঙলা দেশের মেয়ে চিরকাল স্বামীদের হাতে অনেক উৎপীড়ন সহ্য ক'রে এসেছে, অন্ততঃ এই শরীর রক্ষার ব্যাপারে,—তার হাতে অন্ততঃ সে-সব লাঞ্ছনা আর না ঘটে। এ সম্বন্ধে চৌধুরী সাহেবের যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ ছিল। তিনি, আর যাই হোক, নিরানব্বই জন স্বামীর একজন নয়।

আচ্ছা, দেখেছ তুমি লক্ষ্য ক'রে—তিনি একদিন বললেন, ওই যে চাটুয্যের স্ত্রী, কি রকম যা তা কাপড় প'রে রাস্তায় বেরোয়। আমার স্ত্রী হ'লে আমি সুইসাইড করতুম। আর চাটুয্যেও তেমনি, বিন্দু মাত্র সুরুচি বোধ নেই, সংশিক্ষা নেই,—যাকে বলে কিম্ভূতকিমাকার।

আভা হাসিমুখে বললে, তোমার চোখ যদি কিছুতে এড়ায়! হয়ত বেচারীদের তেমন অবস্থা নেই?

নেই?—চৌধুরী সাহেব বললেন, সেকেণ্ড ক্লাসে ওরা এসেছে, তা জানো? আমার ওপর টেক্কা দিয়ে। চাটুয্যে ত টিন-টিন সিগারেট ওড়ায় দেখি। স্ত্রীর জন্যে একখানা শাড়ী কিনতে পারেনা? কেবল কি চাটুয্যে,—ওই ছাখো না কল্‌কাতার বিখ্যাত বোস পরিবার! বড় মেয়েটা হিল্ তোলা জুতোয় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে, আচ্ছা—দে না বাপু একজোড়া স্যাণ্ডাল কিনে! এতই যদি বড় মানুষী, মেয়ের জন্যে আর দুটো টাকা খরচ করতে পারিসনে? ছেলে দুটোর ত একজোড়া হাফপ্যাণ্টও জোটেনা! বনেদী বংশ বললে কি হবে, নজর বড় ছোট।

স্বামীর মুখ থেকে অন্যের প্রতি কটু মন্তব্য এবং সমালোচনা এইভাবে আভাকে শুনতেই হয়। একথা মিথ্যে নয়, তারা একটি সুখী পরিবার।

বাস্তবিক, অভাব তাদের কোথাও কিছু নেই। সঙ্গে তাদের একটা দামী গ্রামোফোন আছে। চৌধুরী সাহেবের নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যহ প্রভাতে চাকর সেটা বাজায়। ভজন অথবা কীর্তন গানের সুরে আভার ঘুম ভাঙে। সকালে পাখীর কলকূজনে মাঠ ভ'রে ওঠে। মালী এসে ফুলদানীতে টাট্‌কা সূর্যমুখী অথবা চন্দ্রমল্লিকা রেখে যায়। কয়েকটা গাছে গোলাপ ধরতে আর দেরী নেই।

কাছাকাছি কয়েকটি পরিবার থাকা সত্ত্বেও চৌধুরী সাহেব এখানে এসে অবধি কারো সঙ্গে বিশেষ আলাপ করেন নি। সকলের সঙ্গে গলাগলি করা তাঁর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। তাঁর
মেলেনা, সুতরাং দূরত্ব একটু রেখে
উপায় কি? মহৎ আভিজাত্য সব
সে যদি না নেমে আসে তবে তাকে দোষ দেওয়া চলেনা, তার রীতিনীতিই আলাদা।

সেদিন ওদের এই আলাপই চলছিল। হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর অবধি ওরা চলে এসেছে। সন্ধ্যা হ'তে আর বিলম্ব নেই, শোন নদীর জল রাঙা হয়ে এসেছে। কয়েকটা মহাজনী নৌকার ছইয়ের মধ্যে ছোট ছোট কেরোসিনের ডিবে জ্বলে উঠেছে। শরতের আকাশ দেখতে দেখতে ম্লান হ'য়ে এলো। এদিকটা চৌধুরীর ভালো লাগে না। তাঁর বিবাহিত জীবনের চার বছরে স্ত্রীকে নিয়ে নিঃসঙ্গ থাকতেই ভালো লাগে। সন্তানাদি এখনো হয়নি। একটা বটগাছের নীচে নরম ও ঘন ঘাসের উপর দুজনে এসে বসলো। আজ অনেকটা পথ হাঁটা হয়েছে। যদি তাঁদের ফিরতে দেরী হয় তবে চাকর একটা টাঙা এনে হাজির করবে, বলা আছে।

দিগন্ত বিস্তৃত নদীর ওপার থেকে শুক্লপক্ষের চন্দ্র উপরে উঠে এসেছে। বাতাসটি লঘু, চোখে মুখে কেমন যেন নেশার রঙ বুলিয়ে চ'লে যায়। আজ আভাকে খুব ভালো লাগছে। নির্জন নদীর তীরে জ্যোৎস্নার মধ্যে নিয়ে এলে স্ত্রীও যেন কেমন মোহিনীর বেশ ধরে। কাছে থাকলেও যেন তার সর্বাঙ্গে একটা সুদূর রহস্যের ছায়া নেমে আসে, মাদক রসে মন টলমল করে।

আভা উচ্চশিক্ষিত না হ'লেও তার কোনো ক্ষতি ছিলনা। লেখা পড়ায় ভালো ছাত্রী ব'লে তিনি আভাকে বিবাহ করেননি, করেছেন তার রূপ দেখে। বিলাতের মোহ তাঁর মনে ছিল, স্বাধীন সুন্দরীদের সম্পর্কে তাঁর

অভিজ্ঞতা যে একেবারেই নেই তা নয়—কিন্তু তাদের মোহ থেকে তিনি উত্তীর্ণ হ'তে পেরেছেন কেবল মাত্র আভার পরিচয়ে। আর যাই হোক, আভা তাঁর জীবনে কোনো অভাব রাখেনি। বয়সকালের যে ঐশ্বর্যভার ছিল আভার সর্বাঙ্গে, তার সম্পদ অপরিমেয়। অথচ তার চাঞ্চল্য নেই। ভাদ্রের নদী ভরো-ভরো, কিন্তু দুরন্ত স্রোতে সে মাতিয়ে তোলেনা,—কেমন একটি প্রশান্ত আবেদন ছিল তার চেহারায়। চৌধুরীর মন নিবিড় আনন্দে অবগাহন করতো।

আভা?

আভা উত্তর দিল, কি গো?

চৌধুরী একখানা হাতে স্ত্রীর গলা জড়িয়ে বললেন, আচ্ছা, এখান থেকে তুমি আর কোথায় যেতে চাও বলো।

আভা বললে, তুমি যেখানে নিয়ে যাবে।

হ্যাঁ, আমার এখনো অনেক দিন ছুটি। আরো প্রায় দেড় মাস তোমাকে নিয়ে বেড়াতে পারি। আমরা দিল্লী আগ্রা হয়ে রাজপুতানায় ঘুরে আসবো, কেমন?

বেশ ত।

তুমি যে বলেছিলে, সব দেশের শাড়ী এক একখান কিনবে, মনে নেই?

হাসি মুখে আভা বললে, পাগল আর কি, বলেছিলুম ব'লেই কি আর কিনবো? অত খরচ ক'রে দরকার নেই।

না, না সে হবে না। তুমি কেবল আমার অসুবিধের কথাই ভাবো, আনন্দের কথা ভাব না।—চৌধুরী সাহেব বলতে লাগলেন, তুমি যদি জানতে তোমার নতুন নতুন সাজ-সজ্জায় আমার কত উল্লাস, তবে তুমি একথা বলতে না।

আভা তার উত্তরে কেবল তার কোমল একখানি হাতে স্বামীর চুলের মধ্যে আঙুল বুলিয়ে দিতে লাগলো। তারপর মধুর মৃদুকণ্ঠে বললে, শাড়ী না থাকলে তোমাকে বলতুম,—কিন্তু আমার অনেক আছে।

তুমি কি ভাবছো, আভা?

ভাবছি আসবার সময় তোমার ছোট বোন দুটো পশমের গোলা চেয়েছিল, কিন্তু ভুলে দিয়ে আসতে পারিনি। ভারি লজ্জার কথা।

চৌধুরী উত্তেজিত হয়ে বললেন, তার জন্যে কিছু লজ্জা নেই। তুমি কেন দেবে? কেন তুমি বেপরোয়া খয়রাৎ করবে?

আভা বললে, সামান্য জিনিস ত!

না সামান্য নয়, আভা। তোমার যদি কখনো অভাব হয়, কেউ দেবে না তোমাকে। তোমাকে দোহন করাই সকলের কাজ। ওরা সবাই তোমার সংব্যবহার আর মধুর স্বভাবের সুবিধে নিয়ে তোমাকে শোষণ করে। একটুও অন্যায় তুমি করোনি, কারুকে কিছু দিয়ো না; মানুষকে হাতে রাখতে যদি চাও তাহলে তার লোভের উপকরণ হাতের মধ্যে রেখো—তবেই কাজ হবে। বরং দানের ভান ভালো, কিন্তু দান ক'রে ফতুর হওয়া কাজের কথা নয়।

স্বামীর সঙ্গে তার চার বছরের পরিচয়, সুতরাং এই অদ্ভুত যুক্তি শোনা আভার পক্ষে নতুন নয়। সে চুপ ক'রে রইলো।

কতক্ষণ উভয়ে নীরব। চাঁদের আলো নিবিড় হোলো, জ্যোৎস্না হোলো ঘন। চৌধুরী তাঁর নিজের কোলের উপর আভার মাথা টেনে নিলেন। তারপর তার গায়ের উপর একখানা হাত রেখে বললেন, বিদেশে নির্জন জায়গায় তোমাকে আনলে কী যে ভালো লাগে! তুমি শুয়ে আছ, এই গাছের তলাটাই যেন আমার স্বর্গ। চাঁদের আলো পড়েছে তোমার শরীরে, যেন রূপ-কথার পরীর মতন মনে হচ্ছে। নিজের সৌভাগ্য দেখে মনে হয়, বাঙ্গলা দেশের আর সব স্বামীই দুর্ভাগা। আচ্ছা আভা—?

কি বলো?

তোমাকে কি আমি সুখী করতে পেরেছি?

সুন্দর হাসি হেসে আভা বললে, এতদিন পরে এ কথা কি বলতে আছে?

চৌধুরী বললেন, আমাকে কি তুমি সত্যই ভালোবাসতে পেরেছ, আভা?

আভা কেবল তাঁর দেহালিঙ্গন ক'রে বললে, মুখে কি জানাতে আছে?

চৌধুরী সাহেব কেবল হেঁট হয়ে স্ত্রীর অধরে একটি চুম্বন করলেন। আভা কেবল চোখ বুজে রইলো।

জ্যোৎস্নার আলোয় দূর থেকে একখানা টমটম আসতে দেখা গেল। চাকরটা গাড়ী এনেছে সন্দেহ নেই। আভা তাড়াতাড়ি উঠে বসলো। হাসিমুখে বললে, ইস, অনেক দেরী হয়ে গেছে, এর পর তুমি চা খাবে কখন্?

চৌধুরী ক্ষেদোক্তি করে বললেন, চাকর বেটা সব মাটি ক'রে দিল। এমন সুন্দর রাত।

বাসায় যখন দুজনে ফির্‌লো তখন বেশ রাত হয়েছে। সন্ধ্যার দেওয়া ধূপের গন্ধ তখনো ঘর থেকে সব মিলোয়নি। ঘরে আলো জ্বলছে। তাদের ফিরতে দেখে চাকরটা গ্রামোফোনে একটি আশাবরী গানের রেকর্ড ধরে দিল। পাচক চা তৈরী করতে গেল।

বিকালের ডাকে কোনো চিঠিপত্র আছে কি না খোঁজ নেবার জন্য চৌধুরী টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। না, চিঠিপত্র তাঁর নেই। কিন্তু সহসা আর একটি চিঠির দিকে চোখ পড়তেই তিনি চমকে উঠলেন। এই চিঠি তিনি লিখেছিলেন তাঁর আফিসের বড় সাহেবকে। কিন্তু চিঠিটি ডাকে দেওয়া হয়নি দেখে ভয়ে তাঁর মুখ বিবর্ণ হয়ে এলো। সাহেব যাচ্ছেন টুরে, আজকে চিঠি ডাকে না দেবার জন্য যথাসময়ে এ চিঠি সাহেবের হাতে আর পৌঁছবে না। সর্বনাশ!

তিনি উচ্চ কণ্ঠে ডাকলেন, রামবিরিজ?

হুজুর।—ব'লে চাকর এসে দাঁড়ালো।

শুয়োর, আজকের ডাকে এ চিঠি যায়নি কেন?

মাইজী নেহি দিয়া, হুজুর।

বোলাও মাইজীকো, হারামি কাঁহেকা।

মাইজীকে খবর দিয়ে রামবিরিজ গা ঢাকা দিল।

আভা এসে ঘরে ঢুকলো। বললে, কি হোলো গো?

চৌধুরীর মুখখানা তখন দপদপ করছিল। বললেন, এ চিঠি ডাকে দেওয়া হয়নি কেন, আভা?

ও মা, তাইতো, যা—ভুলে গেছি!

কিন্তু তোমার ভুল করার মানে জানো? মিছে কথা ব'লে চলে এসেছি, সাহেবকে জানাচ্ছি খুব আমার অসুখ,—সঙ্গে পাঠাচ্ছিলুম ডাক্তারের সার্টিফিকেট।

আভা অপ্রস্তুত হয়ে বললে, ভারি ভুল হয়ে গেছে!

তোমার এই ভুলের মানে হোলো এই, এখানকার বাসা উঠিয়ে দু'দিনের মধ্যেই আমাদের চ'লে যেতে হবে। কত আশা ক'রে এসেছিলুম!

আভা বললে, আমার শরীর ত এখন ভালই আছে। বেশ ত, চল ফিরে যাই।

কিন্তু তোমার ভুল আজ নূতন নয়, আভা—চৌধুরী একটু উত্তেজিত হ'য়ে বললেন, সে'বার তোমার সামান্য ভুলের জন্য আমার কি ক্ষতি হয়েছিল, মনে পড়ে?

আভা মুখ তুলে বললে, ক্ষতি তোমার হয় নি, কিছু অসুবিধা হয়েছিল মাত্র।

কিন্তু অসুবিধাই বা হবে কেন তোমার জন্যে?

সংসার করতে গেলে ভুলচুক একটু-আধটু হয়েই থাকে। তোমার এ চিঠি যে বিশেষ দরকারী—কই, আমাকে ত সকালে বলনি?

বলিনি, সে আমার খুশি। তোমাকে সব কথাই বলতে আমি বাধ্য নই। চিঠি তোমাকে ফেলতে বলেছিলুম, এই যথেষ্ট। সেই কর্তব্য তুমি পালন করোনি, এই হোলো অভিযোগ।

আভা বললে, বাজে ধমক দিও না, চিঠি ফেলা হয়নি, এটা দৈবাৎ। তুমি নিজেই কোন্ চিঠি ফেলার ব্যবস্থা করলে?

চৌধুরী উচ্চকণ্ঠে বললেন, আমি নিজে? তুমি তবে আছ কি জন্যে?

আমি কি জন্যে আছি তা তুমি বেশ জানো। এ নিয়ে খোঁটা শুনিওনা।

আমার ক্ষতি হোক এই কি তুমি চাও?

আভাও উত্তেজিত হয়ে উঠলো। বললে, আমি কি চাই না চাই সে কথা শুনে লাভ নেই তোমার।

চৌধুরী বললেন, কেন লাভ নেই শুনি? তোমার মতলব কি? কী না করেছি তোমার জন্যে?

যা কিছু করেছ, নিজের জন্যই সব! নিজেকেই খুশী করবার জন্যে, নিজেরই স্বার্থের জন্যে। বেশী কথা ব'লোনা—থামো।

টেবিলটা চাপড়ে চৌধুরী চীৎকার ক'রে বললেন, এমন নির্লজ্জ মেয়ে-মানুষকে আমি বিয়ে করেছিলুম,—তুমি অতি নীচ প্রকৃতির স্ত্রীলোক।

তুমি তার চেয়েও নীচ,—আভাও চেঁচিয়ে উঠলো—ভদ্রতা কা'কে বলে তা তুমিও জাননা। সামান্য ভুলের জন্যে কোনো স্বামী এই ভাবে ঝগড়া করে না।

সামান্য তোমার কাছে, আমার কাছে নয়। আমার প্রতি তোমার ঘোর উপেক্ষা, গভীর অশ্রদ্ধা।

আভা বললে, বেশ, এর বেশী শ্রদ্ধা আমার নেই। তুমি যা খুশী তাই করতে পারো।

চৌধুরী পায়চারী করতে করতে বললেন, জানি তোমার এই স্পর্ধাকে কেমন ক'রে শাসন করতে হয়!

আভা বললে, জব্দ করতে তুমি কম চেষ্টা করোনি। আমিও তোমার সব চাতুরী জানি। তোমার কোনো তোষামোদে আমি ভুলিনে।

চৌধুরী বললেন, সাবধান আভা, সাবধান ব'লে দিচ্ছি!

ভয় দেখিয়োনা, যথেষ্ট সাবধানে আছি! চোখ-লাল করতে হয়, চাকরদের কাছে করোগে।

তোমাকেও তাদের চেয়ে বড় ক'রে দেখিনে।—চৌধুরী চীৎকার করতে করতে বললেন, পায়ের জুতোকে কখনো মাথায় তুলতে নেই। রূপের অহঙ্কার, কেমন? অমন রূপ দু' টাকা খরচ করলে কল্‌কাতায় কিনতে পাওয়া যায়। ইতর মেয়ে মানুষ! পারিনে? খুব পারি। খুব পারি তোমাকে সায়েস্তা করতে। দয়া করতে নেই তোমাদের,—সাপকে কখনো বিশ্বাস করতে নেই।

পাড়ার লোক কয়েকজন বাগানের ফটকের কাছে এসে জড়ো হয়েছিল। জানালা দিয়ে তাদের লক্ষ্য ক'রে চৌধুরী সাহেব বেরিয়ে এলেন। গলাবাজি ক'রে তখনো তিনি খুব হাঁপাচ্ছিলেন।

গেটের কাছে এসে তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, কী চান্ আপনারা?

একটি ভদ্রলোক হাসিমুখে বললেন, আমরা পাশেই থাকি। বিদেশ জায়গা, গলার আওয়াজ শুনে ভাবলুম, বুঝি কোনো বিপদ আপদ ঘটেছে আপনার এখানে। তাই ছুটে এলুম।

মিছে কথা আপনাদের!—চৌধুরী সাহেব চড়াও হয়ে বললেন, এটা আপনাদের বাঙ্গালীপনা। স্বামী-স্ত্রীতে কথা কাটাকাটি হচ্ছে, তাই আপনারা তামাসা দেখতে এসেছেন। আপনাদের লজ্জা করেনা? আপনারা না ভদ্রলোক?

ভদ্রলোকেরা বিমূঢ় স্তম্ভিত হয়ে বললেন, আচ্ছা, আমাদের ক্ষমা করুন। আমরা যাচ্ছি।

যান, নিজেদের ঘর সামলানগে।—এই ব'লে দ্রুতপদে ফিরে এলেন।

ঘরে এসে দেখলেন, আভা শ্রান্ত হয়ে বিছানায় আড় হয়ে পড়েছে। চৌধুরী বললেন, শালাদের দিয়েছি ঠাণ্ডা ক'রে,—অভদ্র ইতর কোথাকার। আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমি ঝগড়া করবোনা, তবে কি তোদের স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করতে যাবো?—ও কি, কি হোলো তোমার?

চৌধুরী স্ত্রীর কাছে গিয়ে হেঁট হলেন। আভা তখন চোখ বুজে চুপ ক'রে প'ড়ে রয়েছে! তাড়াতাড়ি একটু জল এনে স্ত্রীর কপালে বুলিয়ে তিনি বললেন, মাথাটা বুঝি আবার ধরেছে, আভা?

আভা বললে, হুঁ।

দেখলে ত, আমি জানি তোমার শরীর খারাপ। এই জন্যেই ত ছুটি নিতে চাইছিলুম।—এই ব'লে একহাতে স্ত্রীর মাথায় হাত বুলিয়ে অন্য হাতে চৌধুরী সাহেব তাকে বাতাস করতে বসলেন।

ইস্পাতের ফলা

শহরতলীর রেলপথটি চ'লে গেছে পুলের উপর দিয়ে, তা'র নীচেটা অবারিত রাজপথ। ট্রাম লাইন ধ'রে দক্ষিণ দিকে অনেকটা চ'লে যেতে হয়। তারপর বাঁ-হাতি একটি সরু পায়ে চলা গলি। সেই সঙ্কীর্ণ গলিটিতে দু'একটি তেলের আলো জ্বলে, কিন্তু সেই আলোয় কোথাও কিছু ঠাহর করা যায় না। নগরের বিস্তার তখনও অতদূর অবধি পৌঁছয়নি।

সন্ধ্যার পর সমগ্র বস্তিপল্লীটি সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে ওঠে।—একটা অস্পষ্ট চাপা জীবন, ছায়া ঢাকা আলোর রেখা, স্ত্রীপুরুষের রহস্যময় গতিবিধি, অবাঞ্ছনীয় বেকারদের গোয়েন্দাসুলভ গোপন-চারণা,—সবটা মিলিয়ে দেখতে গেলে কেমন যেন কণ্ঠরোধ হয়ে আসে। আশেপাশে এলোমেলো বিশৃঙ্খল একটা জনসমাজ,—সেটা ফেরিওলা, বিড়িওলা, পানওলা ইত্যাদি এদের নিয়েই গ'ড়ে উঠেছে।

ট্রামগাড়ীটি যখন পেরিয়ে যায়, তারই চকিত আলোয় ওই গলির ভিতরকার একটুখানি অংশ পলকের জন্য চোখে পড়ে। গলি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়ার আগে বিনু ওই ট্রামের আলোটা এড়াবার জন্য একবারটি থমকে দাঁড়ায়। চোখদুটি তার সংশয়-চকিত, সতর্ক। নিঃসাড় অরণ্য সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হ'লে হরিণী যেমন অরণ্যকোটর থেকে অতি সন্তর্পণে বেরিয়ে আসে,—বিনু তেমনি ক'রে এগিয়ে যায় বড় রাস্তার দিকে। তাকে ট্রাম ধরতে হবে।

ঠিক এই সময়টিতে নিয়মিত সে ট্রামে উঠে,—প্রায় ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে বলা যেতে পারে। বিনু গরীব, পরিচ্ছদে তা'র গরীবানা, চেহারায় চাকচিক্য কম,—শাদামাটা, শ্যামবর্ণ। ঘোমটার নীচে ললাটের সন্ধিস্থলে এয়োতির সিঁদুর,—যাকে বলে নিতান্ত সাধারণ মেয়ে। এত সাধারণ যে, তা'কে হারালে খুঁজে পাওয়া কঠিন, মনে ক'রে রাখার মতন তা'র মুখে একটি রেখাও নেই, মুখের কাটুনিতে সৃষ্টির কোন শিল্পকলা নেই।

তবু একটুখানি সন্দেহজনক বৈ কি! বস্তির পাড়াটা ভালো নয়,—ওর ভিতর থেকে গা ঢাকা দিয়ে একা বিনু চট্ ক'রে বেরিয়ে আসে,—এবং সে

একা, এবং সন্ধ্যার পর,—এরপর খানিকটা পরিচয় আর না দিলেও চলে বৈকি! বিনুকে একই সময় নিয়মিতভাবে বেরোতেই হয়, না বেরোলে তা'র নিজেরও চলেনা, তা'র ঘরও অচল।

ট্রামের আগেই আস্‌ছে মোটর বাস্‌। সেই ভালো, আজ সে মোটর বাসেই চড়বে। ঠিক সেই সময়ে কারখানার ওপাশ থেকে একটি ছোকরা দ্রুত এসে পাশে দাঁড়ায়, চক্ষের পলকে এবং অলক্ষ্যে উভয়ের হাতে হাতে কি যেন একটা বিনিময় হয়ে যায়, তারপর আর কোনদিকে না তাকিয়ে বিনু বাস-এ উঠে পড়ে। ছোকরাটি পথ পেরিয়ে অন্যদিকে চলে যায়। এই আচরণটাও প্রায় নিয়মিত।

বাস-এর সীটে ব'সে অভিনিবেশ সহকারে বিনু ঘোমটার ভিতর থেকে সমস্তটা লক্ষ্য করে। প্রত্যেকটি আরোহীর মুখ, ও তাদের প্রকৃতি। যদি কেউ তা'র দিকে তাকায় তখনই সে নিজের সঙ্কুচিত সশঙ্ক মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নেয়। তা'র চেহারায় প্রসাধনে কোথাও দৃষ্টি আকর্ষণের মতো কিছু থাকলে সে ভয় পায়। পুরুষমাত্রকে, অর্থাৎ অপরিচিত যে কোন ব্যক্তিকে সে সন্দেহ করে, অবিশ্বাস করে। বিনু কোথায় যায় বলা কঠিন, সন্ধ্যার পর সে বাইরে আসে কেন, কেন সে একা, কেন বা নিয়মিত একটি ছোকরার সঙ্গে তা'র চক্ষের নিমেষে যোগাযোগ ঘটে,—এগুলি বিচার করতে গেলে বিনুর চরিত্রের উপর কটাক্ষপাত হওয়া স্বাভাবিক। তা ছাড়া তা'র মাথায় সিঁদুর,—এজন্য তা'র দায়িত্বও কম নয়। বিস্ময়ের কথা এই, কয়েকবার কয়েকটি ভ্রান্ত পথচারী ভুল ক'রে তা'র পিছু নিয়েছে, কিন্তু নিয়ে ঠকেছে! অর্থাৎ তা'র গাম্ভীর্যটা যেমন কঠিন, তেমনি কঠিন তা'র নির্মোহ নিরাসক্ত ও নিস্পৃহ দৃষ্টি আকর্ষণ করা। হায়রান হয়েছে অনেকেই। মেয়েটা কেবল যে হৃদয়হীন তা নয়, যৌনবোধশক্তিহীন ব'লে অনেকেই সন্দেহ ক'রে গেছে। পুরুষমাত্রকেই সে একসময় অকর্মণ্য ও নির্বোধ বানিয়ে তোলে।

বিনু যখন ফিরে আসে, রাত তখন কম নয়। হয়ত শেষ ট্রামেই তাকে ফিরতে হবে। একদিন হঠাৎ বেলাদি তার পাশে এসে বসলেন। বললেন, ওমা, বিনু যে? এত রাত্তিরে?

সহাস্যে বিনু বললে, ফিরছি!

সিনেমা থেকে বুঝি?

সিনেমা!—বিনু আবার হাসলো,—সিনেমা দেখার সময় পাইনে।

বেলাদি বললেন, বিয়ে করলে কবে?

এই সম্প্রতি।—বিন্নু যেন একটু আড়ষ্ট হয়ে উঠলো।

বিন্নুর হাতে ছিল একটা ঝোলা। বেলাদি সেদিকে চেয়ে বললেন, ওর মধ্যে কি?

বিন্নু জবাব দিল, খাবার জিনিসপত্র······তরী তরকারী······

তোমার স্বামী?

বিন্নু বললে, আমার কপাল!

কেন?

তাঁকে দিয়ে কিছু হবার যো নেই।

সহাস্যে বেলাদি বললেন, খুব আল্‌সে, না খুব কাজে ব্যস্ত!

বিন্নু বললে, না। তিনি বাতে পঙ্গু।

বেলাদি চুপ ক'রে গেলেন। ট্রাম এসে একটা মোড়ে থামলো। নেমে যাবার আগে বেলাদি ব'লে গেলেন, আহা, তোমার কথা শুনে ভারি দুঃখিত হলুম, বিন্নু।

বিন্নু একপ্রকার রহস্যময় হাসি হাসলো। কিন্তু বিন্নু বাঁচলো। কোন প্রশ্ন তা'র প্রিয় নয়, কেননা কোন উত্তর তা'র সত্য নয়। সে খুশী, যদি কেউ তাকে না চেনে, অথবা না দেখে। কোথাও কোনো কৌতূহলী চোখ, বিন্নু অমনি আড়ষ্ট। কেউ তিন সেকেণ্ডের বেশী তা'র দিকে তাকিয়ে রয়েছে, অমনি বিন্নুর উদ্বিগ্ন মন ভীরু শাবকের মতো শঙ্কাতুর হয়ে ওঠে। সে চায় ভীড়, জনতার প্রবাহ, অপরিচয়ের শূন্যতা,—কেননা তা'র মধ্যে আত্মগোপন করা সহজ, সেখানে অসীম স্বস্তি, নিরুদ্বেগ বিশ্রাম। দিনের বেলা তা'র কোনো অশান্তি নেই, কেননা দিবাভাগে সে বেরোয় না। গাড়ীতে ওঠে সে ভয়ে ভয়ে; অনেক জানা অনেক চেনা মুখ। অনেক মুখে সে অস্পষ্ট পরিচয়ের সূত্র খুঁজে পায়। সেজন্য ট্রামের জানালা দিয়ে সে বাইরের অন্ধকারের দিকে মুখ পেতে রাখে। এক সময় ঘোমটায় কোনমতে মুখ লুকিয়ে সে নেমে পড়ে। তারপর পলকের মধ্যে সেই সরু গলির ভিতর অদৃশ্য হয়ে যায়।

আর একদিন বিন্নু হঠাৎ ধরা প'ড়ে গেল। বিন্নু ছিল অন্যমনস্ক, ছিল অসতর্ক। তা'র ঠিক নাকের কাছে এসে দাঁড়ালো একটি ভদ্রলোক। ভয়ে বিন্নু চমকে উঠেছিল আর কি,—প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিল। কিন্তু সে পলকের

জন্য। আত্মীয় বলে চেনামাত্রই বিন্নু মাথার ঘোমটা ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

গিরীন বললে, তোকে দেখে ট্রাম থেকে নামলুম রে। প্রথমটা চিনতে পারিনি, কী বদলে গেছিস্!

বিন্নু হেসে উঠলো,—বদলেছি নাকি?

গিরীন বললে, প্রায় বছর চারেক বাদে তোকে দেখলুম। এখানে দাঁড়িয়ে যে?

বিন্নু বললে, বাস ধরবো।

গিরীন তা'র মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, বিয়ে হয়নি দেখছি। খুব স্বাধীনতা, কেমন?

সলজ্জমুখে বিন্নু বললে, বিয়ে হলেই কি পরাধীন হতুম?

গিরীন বললে, তা বটে, তুই যে মেয়ে—বাগ মানায় কা'র সাধ্যি!

বিন্নু হেসে উঠলো।—পরে বললে, তারপর? তোমাদের খবর কি? বড়মাসীমা? বৌদিরা?

গিরীন বললে, ওই মোটামুটি।—যাক্, যে অবাধ্য ছিলি তুই···এবার দেখছি একটু শান্ত।

বিন্নু বললে, তোমাদের ঠিকানা কি, গিরীনদা?

গিরীন ঠিকানা জানিয়ে বললে, একদিন আসিস আমাদের ওখানে। গল্প করা যাবে। একলা কেন? এদিকে কোথায় এসেছিলি?

বিন্নু মিছে কথা বললে। অনায়াসে অকুণ্ঠায় অনর্গল মিথ্যা বললে, এই কাছাকাছি···মানে ঠনঠনের ওদিকে আমার এক বন্ধু থাকে—তার ওখানে গিয়েছিলুম—

গিরীন বললে, যাবি ত' আমাদের ওখানে?

নিশ্চয়ই,—বিন্নু সহসা কণ্ঠস্বরে একটু আগ্রহ মিশিয়ে বললে, আচ্ছা গিরীনদা, তুমি ত' পুলিশের দারোগা, কত বড়লোক! কিছু টাকা দাওনা আমাকে?

টাকা! টাকা কি হবে রে?

বিন্নু জবাব দেয়, টাকায় যা হয়ে থাকে।

কত?

বেশী না,—গোটা পঁচিশেক।

পঁচিশ? আমি ভাবলুম দু'শো চারশো। দাঁড়া দেখি,—এই ব'লে গিরীন পকেট থেকে মণিব্যাগ বা'র ক'রে পঁচিশ টাকা মিলিয়ে বিনুর হাতে দেয়।

বিনুর হাত কাঁপে না, ঠাণ্ডা হয়ে ওঠে না। কিন্তু টাকা পাবার পর আর সে দাঁড়াতে চাইলো না। সে একটু অস্বাভাবিক রকম ব্যস্ত হয়ে উঠলো। কে যেন দূরের থেকে ভাইবোন দুজনকে লক্ষ্য করছে,—মনে হলো লোকটি যেন রাস্তার ওপারে থমকে দাঁড়ালো। বিনুর গলার আওয়াজ কেঁপে উঠলো।

ওকে চেনো তুমি, গিরীনদা?···ওই যে লোকটা···চেয়ে আছে আমাদের দিকে?

গিরীন জবাব দেয়, কই না? ভয় পাস কেন তুই?

লোকটা ভারি অভদ্র। আচ্ছা, আমি চললুম, ভাই। বিনু তৎক্ষণাৎ পিছন ফিরে হন্‌হন্ ক'রে হাঁটতে থাকে। অভদ্র ব্যক্তিকে এক মিনিটও সে বরদাস্ত করতে পারে না।

কেমন একটা অসামাজিক অস্বাভাবিক দ্রুততা বিনুর পদক্ষেপে।—গিরীন যেন অনুভব করে, এতদিন পরে মাসতুতো ভগ্নিকে দেখে নিজে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেও বিনুর দিক থেকে কোনো আন্তরিকতা দেখা গেল না। বিনুকে দুর্বোধ্য মনে হোলো,—মনে হোলো দুস্তর ব্যবধানের ওপারে এতক্ষণ সে দাঁড়িয়েছিল। বিনু হঠাৎ টাকা চেয়ে নিল, এটা যেন কেমন অভিনব প্রতারণা, কেননা তা'র ভাবভঙ্গী আর চলাফেরা নিশ্চিত সন্দেহজনক। বিনুর আচরণে নিজের মনে তা'র গ্লানি জমে ওঠে,—একটা বিসদৃশ অনুভূতি। বিনুর ঠিকানা কি, কিভাবে তা'রা থাকে, বর্তমানে তাদের অবস্থা কি প্রকার,—এসব কিছুই জানবার সুযোগ গিরীন পেলো না।

মূঢ়ের মতো সে দাঁড়িয়ে রইলো! বিনু তখন অদৃশ্য।

দুতিনটে গলি ঘুরে বিনু আবার বড় রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। একখানা দোতলা বাস্ গর্জন ক'রে এগিয়ে আসে, বিনু তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে। বাস্ ছেড়ে দেয়,—মাত্র কিছু দূর ছোটে,—এমন সময় অস্পষ্ট লক্ষ্য করে, সেই লোকটি, সেই পথে-দাঁড়ানো ছায়ামূর্তিটি বাসে ওঠে, এবং বিনুর সামনে দিয়ে আগের সিট-এ গিয়ে বসে। বিনু কেঁপে ওঠে, চমকে ওঠে, এবং তা'র উপস্থিত বুদ্ধির দুরন্ত তাড়নায় এক সময় নিঃশব্দে উঠে ছায়ান্ধকারে বাস্ থেকে নেমে যায়! বুঝতে পারে লোকটা তা'কে লক্ষ্য করেনি। অতি বুদ্ধিমানকে হঠাৎ প্রতারিত করা বিনুর পক্ষে খুব কঠিন নয়।

বড় রাস্তায় তখন একটা জন প্রবাহ দেখা যায়, কোথায় যেন একটা মস্ত রাজনীতিক সভা ভেঙেছে। বিনু স্বস্তিবোধ করে। অহিংস জনপ্রবাহ ত্যাগ ও সংযমের মন্ত্রে দীক্ষিত,—বিনু আনন্দিত হয়ে ওঠে। সে লক্ষ্য করে মুখে চোখে হিংসা নেই, কেউ অসংযত নয়, কেউ দুরভিসন্ধি পোষণ করে না। বিনু ভীড়ের ভিতর দিয়ে নিশ্চিন্তমনে হেঁটে চলে যায়।

অনেক দোকান পথের দুইধারে। প্রত্যেক দোকানে বিনুর দরকার। কিন্তু কোনো দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালে বিনু সেখানকার আলোটা বাঁচাবার চেষ্টা করে। রাত্রির অন্ধকারে যত আলোই থাক্, তা'র একটি নিজস্ব ছায়াবরণ আছে। বিনুর পক্ষে সেই সুবিধাটুকু কম নয়। সে যথাসম্ভব কাছে এগিয়ে আসে, এবং আলো বাঁচিয়ে ঘোমটা একটু টেনে জিনিসপত্র কেনে। দাড়ি কামাবার সাজ সরঞ্জাম, গায়ে মাখা সাবান আর তেল, খানদুই চামচে, এক টিন বিস্কুট, এক প্যাকেট চা, হয়ত বা কিনলো এক কৌটা মাখন। তার টাকা খরচের পদ্ধতি আর সওদা কেনার ভঙ্গী লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারা যায়, তা'র গৃহস্থালীর শৃঙ্খলা কিছু নেই, স্থায়ী কোনো ব্যবস্থায় তা'র বিশ্বাস নেই, নিজের ব্যবস্থাপনায় নিজেই সে নির্ভরশীল নয়। কোনো জিনিসের দাম সে যাচাই করে না, ভালোমন্দ বিচার তা'র নেই,—জিনিসটি তা'র ঝোলার মধ্যে নিতে পারলেই সে নিশ্চিন্ত। কোনো প্রকারে কাজ সেরে তা'কে চলে যেতে হ'বে।

এক দোকান থেকে আর এক দোকানে। সেখানে একটু অন্ধকার। বিনু নিশ্চিন্ত হয়। কি যেন তা'কে কিনতে হবে। সহসা পিছন ফিরে সে তাকায়,—কোন্ লোকটাকে ঘোমটার আড়ালে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে লক্ষ্য করে। হঠাৎ সে দোকানের সামনে থেকে স'রে যায়। আর কোন সওদার প্রয়োজন নেই। দ্রুত ব্যস্ত হয়ে সে ছোটে। দোকানী অবাক হয়ে থাকে।

পরদিন এ অঞ্চলে আর সে আসে না। অন্য কোথাও, সম্পূর্ণ অপরিচিত পাড়ায়, অজানা জনতার মাঝখানে। পদে পদে সংশয়, পদে পদে সে যেন পথের কাঁটা এড়িয়ে চলে। নিজেকে সে বিশ্বাস করে না, বিশ্বাস করে না কোনো লোককে, ফিরে তাকায় না কোনো দিকে। অতি সন্তর্পণে অতিশয় সংশয়ের সঙ্গে পথ পেরিয়ে সে চ'লে যায়। ফিরতি পথে ট্রামে ওঠে, তখন রাত কম নয়। তা হোক, রাত তা'র প্রিয়, অন্ধকার প্রিয়তর। অন্ধকারে তার চোখ খোলে।

টালীগঞ্জে যেখানে নামবার কথা, সেখানে পৌঁছবার আগেই সে এক জায়গায় নেমে পড়ে। একটু পাশ কাটিয়ে গা বাঁচিয়ে একজায়গায় চুপ করে সে দাঁড়ায়। হ্যাঁ, ভুল হয়নি তা'র সেই লোকটা নিশাচরের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে ওই বিড়ির দোকানের পাশে। বিনু দুদিন ওকে লক্ষ্য করেছে। লোকটার মতলব ভালো নয়। ওকে এড়িয়ে যাওয়া চাই, ওর সামনে দিয়ে বিনুর আর কোনোদিন গলির মধ্যে ঢোকা চলবে না। অনেকে অনেকবার বিনুর পিছু নিয়েছে, অনেকবার বিনু অনেকের চোখে ধুলো দিয়েছে। তা'র সমগ্র বর্তমান জীবনযাত্রাটা অখণ্ড প্রতারণার ওপর দাঁড়িয়ে।

বিনু চক্ষের নিমেষে ঢুকলো এক বস্তির খানা পথ দিয়ে। পাশে কি একটা ছোট কারখানা, ভিতরে তখনও কলরব চলছে। বিনু কিছুদূর গেল, একবার পিছন ফিরে ঘন অন্ধকারে সে তাকালো। না, কেউ কোথাও নেই, কেউ তাকে দেখেনি, কেউ তাকে অনুসরণ করেনি। বিনু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে তা'র পরিচিত চোরা গলি পথ ধ'রে চললো। আজকের মতো তা'র আর কোনো দুর্ভাবনা নেই। সে বাঁচলো, বাঁ হাতে আঁচল তুলে অত ঠাণ্ডাতেও সে কপালের ঘাম মুছলো।

নিজের বাসায় বারান্দায় এসে বিনু একবার দাঁড়ালো। আলো নেই কোথাও, সাড়া নেই কোনোদিকে,—ভিতরটা নিঃসাড়, প্রেতপুরীর মতো।

ঠিক সেই মুহূর্তে প্রেতের মতোই একজন পা টিপে টিপে এগিয়ে এলো— সে সেই ছোকরা যে নিয়মিত সন্ধ্যার পরে আসে।

পলকের জন্য ছেলেটি এসে তা'র পাশে দাঁড়ায়,—কি যেন বিনিময় করে। চাপা কণ্ঠে ছোকরা বললে, আজ টাকা যোগাড় করতে পারিনি।

নম্র অস্পষ্ট কণ্ঠে বিনু বলে, থাক্ টাকা পেয়েছি, তুমি যাও। সাত দিন পরে আবার দিয়ো। সাবধান···

ছোকরা নিঃশব্দে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

বিনু কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। নিকটে দূরে মানুষের কোনো সাড়া নেই। সরু গলির সেই মিটমিটে তেলের আলো এতদূরে এসে পৌঁছয় না। এবার সে নিশ্চিন্ত হয়ে ভিতরে ঢুকতে পারে। আন্দাজে এগিয়ে এসে বিনু বন্ধ দরজার উপর দুইটি আঙুল দিয়ে একটি সাঙ্কেতিক আওয়াজ করে। তখনই দরজা খুলে যায়।

কে ভিতর থেকে দরজা খুলে দিল সেটা জানার প্রয়োজন নেই। কিন্তু বাহিরের মত ভিতরটাও অন্ধকার। বিনু ভিতরে ঢুকে পুনরায় দরজা বন্ধ ক'রে দিলু। দ্বিতীয় ব্যক্তি একজন কাছাকাছি কোথাও আছে, কিন্তু তা'র জন্য বিনুর কোনো উদ্বেগ নেই। বিনু ঠিক জানে সেই অন্ধকার ঘরে কোথায় কি আছে,—অঙ্কের নির্ভুল হিসাবের মতো সমস্তটাই তা'র জানা। সমস্তই নখদর্পণে। বিনু দেশলাই নিয়ে আলো জ্বাললো।

এ বাসাটা অদ্ভুত। এর সঙ্গে তা'র মনের কোনো যোগ নেই ব'লেই এটা বিস্ময়কর। এখানে আছে সে মাসতিনেক, কিন্তু কোনো মোহবন্ধন কোথাও নেই। গৃহস্থালীর চিহ্ন এখানে খুঁজে পাওয়া কঠিন, গৃহসজ্জার উপকরণ সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ,—অথচ এখানে থাকতেই হয়, না থাকলেই তা'র চলবেনা।

মৃদু আলোটায় দেখা গেল, বিনুর অধরের কোণে হাসির ঈষৎ আভাস। বেলাদিরা জানে সে বিবাহিত, তার স্বামী বাতে পঙ্গু, সে নিজের হাতে বাজার-হাট করে। ওদিকে আত্মীয়স্বজন যার, তা'র আবাল্য ইতিহাস জানে, তাদের কাছে অবিবাহিত সে নিশ্চয়ই। এ এক ভয়ানক খেলা, জীবনের ভীষণতর বিপ্লব, নিজের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি। নিজেকে সে কোনো প্রশ্ন করবে না, নিজের কাছে জবাবও সে দেবে না কিন্তু এ ব্যবস্থা তাকে মেনে নিতে হবেই। সে বিবাহিত এবং স্বামীর সঙ্গে বসবাস করে, একথা প্রকাশ করতে সে বাধ্য ; অপরদিকে, সে অবিবাহিত অক্ষুণ্ণ-কৌমার্য—এটা অপ্রকাশিত রাখাও তা'র চলবেনা। এই বিপ্লব তা'র জীবনের উপর দিয়ে চলেছে প্রতিদিন। অন্ধকারে, সুড়ঙ্গে, লোকচক্ষুর অন্তরালে, মাটির নীচে, সমাজ জীবন থেকে পালিয়ে,—এই সর্বনাশা বিপ্লববুদ্ধিকে সে স্বীকার ক'রে নিয়েছে।

কিন্তু চিত্তগ্লানি কি আছে তা'র কোথাও! কেরোসিনের মৃদু আলোয় তা'র প্রসন্ন উদ্ভাসিত মুখখানা লক্ষ্য করলে বিন্দুমাত্র সংশয় থাকে না যে, সে আনন্দিত। সুখের আর তৃপ্তির অবধি নেই তা'র মুখে, নালিশের রেখামাত্র নেই সেই মুখখানিতে। সিঁথির ভিতর থেকে এয়োতির চিহ্নটুকু সামান্য দেখা যায়—কিন্তু কেশরাশির অরণ্যপথে সেটুকু যেন অগ্নিশিখা,—যেন অরণ্যের ভিতরকার হোমাগ্নি আভা,—পবিত্রতা এবং আদর্শবাদে উজ্জ্বলন্ত। আশ্চর্য, ওকে সমগ্রভাবে দেখলে শ্রদ্ধাই জাগে।

চা ৮৩৮৪

আলোটার দিকে চেয়ে এক সময় বিনুর আয়ত দীর্ঘ চোখে তন্দ্রা নেমে আসে। বাইরের দরজাটা বন্ধ, উদ্বেগের কোনো কারণ নেই, নিশ্চিন্ত তন্দ্রাটা যুক্তিহীন নয়।

কিন্তু তবু আচমকা সে জেগে ওঠে। অন্ধকারে এদিক ওদিক তাকায়, কান পেতে কি যেন শুনতে চেষ্টা করে। না, কেউ নয়, কিছু নয়, হেমন্ত বাতাসের ঈষৎ আবেগে জানালাটা একটু ন'ড়ে ওঠে মাত্র। বিনু উঠে যায় রান্নাঘরের দিকে।

কিয়ৎক্ষণ পরে সে ফিরে আসে। হাতে তা'র খাবারের থালা—সকাল বেলাকার রান্নাকরা ঠাণ্ডা ভাত আর তরকারী। পাশের ঘরটির দরজার কাছে এসে পর্দাটা একটু সরায়। ঘরের ভিতরটা সম্পূর্ণ আলোহীন, বাহিরের দিকে জানালা সযত্নে বন্ধ,—কিন্তু ওই অন্ধকারেই পুরুষের অবিশ্রান্ত পদচারণার শব্দটুকু পাওয়া যায়। ভিতরে পুরুষ, নিশ্বাসপ্রশ্বাস পুরুষের—যাকে বিনু ব'লে এসেছে স্বামী, বেলাদিরা যাকে জানে, বাতে পঙ্গু, সকল কাজে অকর্মণ্য।

বিনু পলকের জন্য পর্দাটা সরিয়ে দাঁড়ালো। চুড়ির মৃদু আওয়াজ, এই সঙ্কেতটুকুই যথেষ্ট,—গলার সাড়া দেবার প্রয়োজন নেই। ডেকে নেবার, কাছে যাবার, ভিতরে ঢোকার, অথবা অনুরোধ' জানাবার কোন চেষ্টাই উভয়পক্ষ থেকে দেখা যায় না। উভয় পক্ষেরই যেন কঠিন ব্রত, এবং কঠিনতর তপস্যা। এটা সংযম, এটা কৃচ্ছ্রসাধনা—বিনু জানে! এটা সহজ ক'রে নিতে হয়েছে, মেনে নিতে হয়েছে, স্বামীস্ত্রীর সর্ববাদীসম্মত সম্পর্ক তুলতে হয়েছে,—এও বিনু জানে। একজন আরেকজনকে চোখে দেখবেনা, ভ্রূক্ষেপ করবেনা,—কী আনন্দ এই সংযমে, কী নিষ্ঠা এই তপস্যায়।

বিনু সহাস্য পরিতৃপ্তির সঙ্গে ভাতের থালা আর জলের ঘটী দরজার চৌকাঠের পাশে সযত্নে রেখে দিয়ে বেরিয়ে আসে।

এই পর্যন্ত তা'র প্রত্যহের বিধিবদ্ধ কর্মধারা। ঘড়ির কাঁটার মতো, নিয়মের নিখুঁৎ ব্যবস্থার মতো,—এইটুকু, এর বেশী নয়, কম নয়। এরপর এদিককার বারান্দায় এসে বিনুর শোবার ব্যবস্থা। একটি পুরনো মাদুর, এক টুকরো চট, এবং বালিশের নামে কাপড়ের পুঁটলী। কোনো অভিমান তা'র নেই, এই তা'র সুখশয্যা,—এটি তা'র তীর্থ। এই ছিন্ন শয্যায় শুয়ে বৈকুণ্ঠলোকের স্বপ্ন দেখা, চোখের কোণে অশ্রু নিয়ে স্বামীর মঙ্গল কামনা

করা। প্রত্যহ রাত্রির কী বিচিত্র উদ্বেগ, কী মিশ্রিত অনুভূতি,—বিনু হয়ে না জন্মালে সেটি বুঝতে পারা যায় না। সে যেন এখানে সতর্ক জাগ্রত প্রহরী,—ঘরে রইলো পুরুষ, তা'র দরজা অর্গল বন্ধ, বাইরে রইলো নারী অবারিত অবকাশের মধ্যে। বিচিত্র, সন্দেহ নেই। কিন্তু কী আনন্দ এই একাকিনী শুয়ে থাকায়, এই নিরন্তর মঙ্গল কামনায়,—অসীম তৃপ্তি বিনুর আধঘুমন্ত হাস্যমুখে। ঘরের মন্দিরে দেবাদিদেব প্রতিষ্ঠিত, বাইরে সেবারতা তা'র নিত্য পূজারিণী। স্বামী,—কিন্তু স্বামীর চেয়েও বড়, মানুষের চেয়েও বড়,—বিনু নিজে অতি তুচ্ছ তা'র কাছে।

ভোর বেলায় উঠে বিনুর কাজের আর শেষ নেই। ঘর দোর পরিষ্কার করা, থালা বাসন মাজা, ঘটি আর বালতির আওয়াজ, রান্নাবান্নার আয়োজন করা। তাকে কুট্নো কুটতে হবে, বাট্না বাটতে হবে, স্নানের জল ধ'রে রাখতে হবে। কী লক্ষ্মী মেয়ে সে, পরিশ্রমে তা'র কী আনন্দ! একা সে করবে সব, কোনো সাহায্য নেই কোনোদিক থেকে। দিনের বেলায় দেখা যায় বাড়ীটির আশে-পাশে জঙ্গল, উপরতলায় থাকে বুড়োবুড়ি,—এবং তাদের রুগ্না বিধবা প্রৌঢ়া মেয়ে। নীচের তলার সঙ্গে তাদের সংযোগ কিছু নেই। ভাঙ্গা পাঁচিলের পাশে একটা মাঠকোটার বস্তি—এবাড়ীর ছাদে ওদিক থেকে সহজেই লোক উঠে আসতে পারে। এবাড়ীর খিড়কী দরজা খুললে একটা অগম্য ঝোপ,—তা'র পাশে অন্ধকার এক ডোবা। এপাড়াটা দিনের বেলাতেও নিরিবিলি। এমন নিঃসঙ্গ এবং সমাজচ্যুত ছোট্ট বাসাটি পেয়ে বিনু মহা খুশী।

সকালের দিককার প্রথম চোটের কাজকর্ম সেরে স্নানের পর সে উঠে আসে—দ্বিতীয় ঘরখানায় ঢুকে দরজাটা বন্ধ ক'রে দেয়। এতক্ষণ পরে অন্যপক্ষের পালা। স্বামী নামে যে-ব্যক্তি পরিচিত, সে এবার বাইরে বেরোয়। বিনু ঘরের ভিতর থেকে সাড়াশব্দে বুঝতে পারে, সে ব্যক্তি স্নান করে, কাপড় কাঁচে, দাড়ি কামায়,—তারপর রান্নাঘরে ঢুকে যৎকিঞ্চিত জলযোগ সেরে নেয়। এই নিয়মে উভয়ে চলে, এইটিই বিধি—একে লঙ্ঘন করা সম্ভব নয়। ঘণ্টাখানেক পরে সে-ব্যক্তি আবার ঘরে গিয়ে ঢোকে। বিনু কৌতুক বোধ করে।

ক্বচিৎ কোনোদিন উপরতলা থেকে বাড়ীর গৃহিণী বৃদ্ধা সাড়া নেন। গলা বাড়িয়ে ডাকেন, বৌমা?

সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে এক পিঠ চুল এলিয়ে বিনু হাসিমুখে গিয়ে দাঁড়ায়। উপরদিকে মুখ তুলে উত্তর দেয়, কি বলছেন বড়মা?

দুদিন তোমাদের কোনো সাড়া পাইনি, মা। খবর ভালো ত?

আজ্ঞে হ্যাঁ—

তোমার স্বামী কি উঠতে পারে একটু?

ওই সামান্য—

বাতের ব্যামো কিনা। আহা বাছারে! জর কি রোজই আসে?

বিনু জবাব দেয় প্রায়ই।

গৃহিণী একটু হেসে থেমে প্রশ্ন করেন, তোমাদের বাজার হাট আনা নেওয়া কে করেন মা?

বিনু বলে, আমার একটি মাসতুতো ভাই আসে সন্ধ্যের পর—সেই এটা ওটা এনে দেয়। তার ত' দিনের বেলায় ছুটি নেই······চাকরি করে কিনা—

ও, তা'ত হবেই। আমাদের আবার সন্ধ্যে থেকেই সব সারা হয় কিনা, তাই টের পাইনে।—আচ্ছা বৌমা, তোমাদের জিনিসপত্তর, খাট আলমারী এসব কবে এসে পৌঁছবে বল দেখি?

বিনু ত্বরিত কণ্ঠে উত্তর করে, বাবা রয়েছেন মফঃস্বলে কিনা···তিনি না ফিরলে জিনিসপত্তর পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। এটা আবার আদায় তশিলের সময়······

গৃহিণী বলেন, তা আমার বাড়ী তোমাদের পছন্দ হয়েছে ত? উঠে যাবে না শিগ্‌গির?

আজ্ঞে না····সে কি কথা! ঘরদোর আমাদের খুব পছন্দ···বেশ বাড়ী!

গৃহিণী অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে উপরের জানলা থেকে সরে যান। বিনু ফিরে এসে হাঁফ ফেলে যেন বাঁচে। সিঁথির সিঁদুরটি তা'র থেকে যায়, কিম্বা থাকে না,—সেটা সুবিধার কথা, প্রয়োজনের কথা। সন্ধ্যার পর নিজের ছাঁচটা সে বদলায়, অন্ধকার হয়ে গেলে ভিন্ন পরিচ্ছদে সে প্রকাশ। সমস্তদিন গৃহস্থালী, সমস্ত দিনের বধূ—উৎকর্ণ, সতর্ক, সশঙ্ক, অথচ লক্ষ্মীস্বরূপিণী। কিন্তু সন্ধ্যার হিমেল জ্যোৎস্নায় তাকে চেনা কঠিন,—সে যেন অভিসারিকা। ঘন অন্ধকার ঝোপ আর ডোবার ধার দিয়ে সাপের ভয়কে তুচ্ছ ক'রে সে বেরোয় নগরের লোক-যাত্রার দিকে। আচরণে বধূত্ব নেই,—পদক্ষেপে

নেই জড়তা, ভয়ের চিহ্ন নেই দুই চোখে, উদ্বেগ নেই মনে বিন্দুমাত্র। বিনু পরোয়া করে না কিছু, অকারণে তাকায়না কোনোদিকে,—কেমন যেন নির্দয় স্নেহহীন কাঠিন্যে তা'র মুখখানা গম্ভীর।

কী জ্যোৎস্না সেদিন রাত্রে। প্রথম শীতের মধুর স্নিগ্ধতা মাখানো সেই জ্যোৎস্নায়। এমন নিবিড়, এমন সুস্পষ্ট যে, নিজেকে সেই আলোয় প্রকাশ করতে বিনুর ভয় করে। শহরতলীর এদিকে জ্যোৎস্নারাত্রে পাখী ডেকে যায় আকাশ পথে। অনেক দূরের কোন বাড়ী থেকে ভেসে আসে গানের মৃদু রেশ। বিনু বাসায় ফিরে নীচের বারান্দায় চুপ করে শুয়ে থাকে। কাপড়ের পুঁটলিটি তা'র মাথার তলায়।

শয্যা নেই, সজ্জা নেই,--ঘর দুখানা রিক্ত, নিঃস্ব। অবস্থার এই দারিদ্র্য। বুঝতে পারা কঠিন, কেননা দুর্বোধ্য তাদের জীবন, এবং দিন যাপন। ওরা দুজনে একদিন এখানে এসেছিল শুধু হাতে,—অনভিজ্ঞ, অর্বাচীন, ওদের না ছিল ঘটিবাটি, না কড়াখুন্তি। ওরা রাঁধতো না, মুড়িমুড়কি চিবিয়ে দিন কাটাতো। অবশেষে এ বাড়ীর গৃহিণীর অনুগ্রহে ওরা কুল পায়। কোনো-মতে দিন কাটাতে থাকে। সে আজ প্রায় তিন মাস হলো।

কিন্তু এই জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে অভাবের কোনো ক্ষোভ বিনুর মনে নেই। কোথায় অভাববোধ, কোথায় বা দারিদ্র্য? বাসনার চিহ্ন নেই, অবিকার-চিত্ত, নির্লোভ, মোহরহিত,—এটা অদ্ভুত জীবন বটে। হাসি খুঁজে পাওয়া যায় না, আগ্রহ নেই কিছুতে, অভিলিপ্সার ধার ধারে না,—এমন ছেলে মেয়ে আশ্চর্য।

এটা অস্বাভাবিক, ওরা জানে; এটা অবিশ্বাস্য, ওরা বোঝে। কিন্তু এটা সত্য ওদের জীবনে। ওরা দুয়ে মিলে এক নয়, ওরা একক, পৃথক। ওরা দুজনে গায়েগায়ে লেগে থাকা মাটির কণা নয়, পাশাপাশি ছুঁয়ে থাকা বালুর দানা। কাছে কাছে থাকে, এঘরে ওঘরে—কিন্তু সংযোগ-সেতু নেই, কেননা স্নেহলেশশূন্য। প্রাণলোকে এত বড় বিপ্লব সৃষ্টি করা, চিত্তবৃত্তির সহজ প্রকাশ-পথে এত বড় বিদ্রোহ ঘোষণা করা,—এ ওদের পক্ষেই সম্ভব।

জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে-চেয়ে বিনুর চোখে ঘুম আসে। কী আনন্দের ঘুম তা'র। চন্দ্রহাসের নৌকায় সে যেন সুখের স্বপনলোকে ভেসে যায় তন্দ্রার তরঙ্গে। শিথিল হয়ে আসে তা'র তনুলতা হিমানীর মধুর স্পর্শে। বিনু বড় সুন্দর, বড় উদাসিনী।

সেই রাত্রে বিনু অকাতরে ঘুমিয়েছিল।—

ভোর রাত্রের দিকে সহসা যেন বিদ্যুতের কশাঘাতে তা'র ঘুম ভাঙলো। বাণবিদ্ধার মতো অকস্মাৎ জেগে উঠে দাঁড়ালো। কোথায় একটা শব্দ, কী যেন একটা সতর্ক আওয়াজ। ঘ্রাণশক্তি বিনুর অতি প্রবল। সহসা…একটি পলকে…মুহূর্তের একটি ভগ্নাংশে সে নিশ্বাস নিয়ে জানতে পারলো, এ বাসার বাইরের দিকে যেন একটা নিঃশব্দ অতি-সতর্ক ষড়যন্ত্র। বিনু চক্ষের নিমেষে অগ্রসর হোলো। বাঘিনীর হিংস্র তীক্ষ্ণতা তা'র দুই চোখে।

জ্যোৎস্নাহতা স্বপ্নাতুরা মায়াবিনী সে নয়, সে সংহারিণী, সর্বনাশিনী। বিনু বিদ্যুৎগতিতে গিয়ে বাহিরের বন্ধ দরজার ছোট্ট ছিদ্র দিয়ে পথের দিকে তাকালো। পোষাকপরা যোদ্ধার মতো কতগুলো লোক সশস্ত্র উৎকর্ণ-প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে। বিনু উদ্‌ভ্রান্ত, ব্যাকুল, দিশাহারা!

সহসা সে আন্দাজ করতে পারলো কয়েকটি লোক পাঁচিল বেয়ে উঠে ভিতরে নামবার চেষ্টা করছে, বাকি লোকগুলো ঘেরাও করেছে বিনুদের বাসা। আর সময় নেই, পালাবার পথ নেই, মুহূর্ত বিলম্ব সইবে না—বিনু ছুটে এলো তা'র স্বামীর ঘরে। চাপা কণ্ঠে বললে, পালাও!

ভিতরে কোনো সাড়া নেই। ভয়ত্রস্তা পাগলিনীর মতো অন্ধকারে হাত বুলিয়ে বিনু আর্তকণ্ঠে বললে, পালাও শিগগির… .

এদিক ওদিক হাতড়িয়ে এক সময় বিনু থমকে স্বস্তির হাসি হাসলো। কা'কে পালাতে বলছে সে? যে পালাবার, সে যে অনেক আগে অদৃশ্য হয়ে গেছে,—এ তল্লাটে তা'র চিহ্নমাত্রও নেই!

বাড়ীর চারিদিক ঘেরাও করেছে ওরা সবাই। ওরে সহধর্মিনি, তোর পালাবার যে আর কোনো পথ নেই! সদর দরজা ভাঙছে, পাঁচিল বেয়ে উঠছে ওরা, জানালাগুলো কাটছে,—ভোরের প্রথম আলো ফুটে উঠছে ওদিকে। পিঞ্জরাবদ্ধা বাঘিনী দাঁত দিয়ে দাঁতের পাটি ঘর্ষণ করলো।

বিনু ছুটতে গেল, কিন্তু পথ নেই। খিড়কি খুলে ঝোপ আর ডোবার দিকে যাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু সেখানে সশস্ত্র দশটি পুলিশের লোক। বিনু খিড়কি বন্ধ ক'রে দিল। উপরের কর্তা ও গৃহিণী তখন চীৎকার করছেন।

শেষ পর্যন্ত বিনু দরজা খোলেনি। কিন্তু দরজা ও জানালা ভেঙ্গে এক সময় সশস্ত্র পুলিশের দল বিভীষিকার মতো ভিতরে ঢুকলো। অন্তত দশজনের হাতে রাইফেল্, তাদের সঙ্গে বেয়নেট্ আঁটা; অফিসারদের হাতে পিস্তল।

একজন অফিসার একটি ঘরে ঢুকেই দেখলেন, একটি বউ তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে শোওয়া অবস্থা থেকে উঠে বসলো। ব্যস্তভাবে নতমুখে মৃদুকণ্ঠে বধূবেশিনী বিনু বললে, কে আপনারা? কা'কে চান্?

বড় সাহেব আড়চক্ষে নতমুখা বধূবেশিনী বিনুর প্রতি অভিনিবেশসহকারে তাকালেন। পরে বললেন, তুমি মেয়ে মানুষ, ভদ্র ঘরের মেয়ে, তবু সম্ভ্রম হানির ভয় করো না, কেমন? পুলিশের হাতে পড়েছ, এবার নিজের মান বাঁচাতে পারবে?

বধূ ঘাড় নেড়ে জানালো, সে পারবে! ছোট সাহেব বললেন, স্যর, আমাদের গোয়েন্দারা বলে, ওরা খুনে বটে, ডাকাত বটে, কিন্তু সন্ন্যাসী ওরা, ওদের নৈতিক চরিত্র লোহার চেয়েও কঠিন। খবরের কাগজে লেখে, ওরাই নাকি দেশের গৌরব।

বড় সাহেব বললেন, আচ্ছা, আপনারা একটু বাইরে যান্, আমি ওকে প্রশ্ন করবো।—ভয় নেই, পিস্তল আছে আমার হাতে।—এই ব'লে তিনি উত্তমরূপে পিস্তলটা একবার পরীক্ষা ক'রে নিলেন।

ওরা সবাই বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো! তারপর বড় সাহেব কঠোর-কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, আমাদের এখানে আসবার আগে কি আসামী পালিয়েছে?

বধূ শান্তকণ্ঠে জবাব দেয়, হ'তে পারে।

মেয়ে-বিপ্লবীকে পুলিশ ক্ষমা করেনা, জানো ত? সত্যি বললে শাস্তি কম পাবে। আসামী কী তোমার স্বামী?

না।

তোমার বিয়ে হয়েছে?

না।

তবে মাথায় ঘোমটা দিয়েছ কেন? সিঁদুর আছে কপালে?

বধূ সম্মতি জানিয়ে বললে, আছে।

বড় সাহেব ডাকলেন, মিস্টার চৌধুরী···

ছোট সাহেব আবার এলেন। বললেন, ও-মেয়েটি কারো বউ নয়, বিয়ে ওর আজো হয়নি, স্যর। আমরা সব জানতে পেরেছি—

বড় সাহেব হিংস্র চক্ষে বন্দিনীর দিকে তাকালেন। ছোট সাহেব পুনরায় বললেন, ফাঁসীর আসামীকে বাঁচিয়ে লুকিয়ে রাখার জন্যেই ও-মেয়েটি তা'র

স্ত্রী সেজেছিল। ওরা ঘরভাড়া নিয়েছে স্বামী-স্ত্রীর পরিচয়ে—আমাদের স্পাইরা বলে—

বড় সাহেব বললেন, আচ্ছা, আপনারা বাইরে গিয়ে চোখ রাখুন—

ছোট সাহেব বেরিয়ে গেলেন।

বড় সাহেব গলা নামিয়ে প্রশ্ন করলেন, সত্যি বলো। আসামীর সঙ্গে তুমি একঘরে থেকেছ কোনোদিন?

বধূ জবাব দিল, না।

আসামীকে ভালোবাসতে তুমি?

না।

মনে মনে?

বধূ জবাব দেয় না। বড় সাহেব পুনশ্চ প্রশ্ন করেন, তোমার নাম কি?—সাবধান, পালাবার চেষ্টা করো না।

বন্দিনী এতক্ষণ পরে পুঁটলিটি সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়িয়ে মাথার ঘোমটা খুলে হাসলো। বললে, কেমন ঠকিয়েছি তোমাকে গিরীনদা? আমাকে চিনতে পারোনি ত?

বজ্রাহত বিস্ময়ে পুলিশের বড় সাহেব ব'লে উঠলেন, তুই…বিনু? এখানে?

আঁচল খুলে বিনু বললে, তোমার টাকা ফিরিয়ে নাও, গিরীনদা। আর দরকার নেই। কিন্তু বড় দুঃসময়ে তুমি টাকা দিয়েছিলে, ভাই।

গিরীন অস্ফুট চীৎকার ক'রে উঠলো, কিছুতেই বাঁচাতে পারবো না, তা জানিস?

বিনু হাসলো। সহজ, সরল, সুস্থ হাসি তা'র।

উত্তেজিত উন্মত্ত কণ্ঠে গিরীন বললে, তোকে দ্বীপান্তরে যেতে হবে যে!

বিনু হাসলো। বললে, দ্বীপান্তরের আগে দেহান্তর ঘটুক, গিরীনদা!—এই ব'লে চক্ষের পলকে সে কী একটা কাগজ মুখে পুরে দিল।

গিরীন পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠলো। তা'র কাঁপা হাতের অস্থিরতায় দড়াম্ শব্দে পিস্তলের গুলি ছুটে গেল দেওয়ালের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্র সার্জেণ্ট আর অফিসারের দল ছুটে এসে যখন ভিতরে ঢুকলো, গিরীন তখন উত্তেজনায় জ্ঞানহারা হয়ে পড়েছে, এবং ততক্ষণে বিনুর মৃত তনুলতা মেঝের উপর লুটোচ্ছে। বলা বাহুল্য, বিনুর পুঁটলিতে থাকতো সাংঘাতিক বিষ।

ঝকঝকে ইস্পাতের ফলাটা ভেঙে গেল, কিন্তু একবারও মচকালো না!

গন্ধ

রোগী দেখার জন্য এ বাড়ীতে ডাক্তারবদ্যিরা আসে, কিন্তু যে-ব্যক্তি রোগীর সেবা ও পরিচর্যা করে, তা'কে দেখবার জন্য আসে এপাড়া ওপাড়ার মেয়েরা। এমন কি বাড়ীর সামনের পথ দিয়ে যে-সকল মুখচেনা ভদ্রলোকরা আনাগোনা করেন তাঁরাও উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে চ'লে যান্—যদি কোনও সময়ে হঠাৎ শুশ্রূষাকারিণীর দর্শন মিলে যায়।

পাড়ার মেয়েরা বলে, এমন দেখিনি! অনেক পুণ্যে লোকটা এমন স্ত্রী পেয়েছিল। পাঁচ বছর ধ'রে স্বামীর মাথার পাশে ব'সে রাত জাগছে, একটি দিনও ঘুমোয়নি—এ ঘটনা কি না দেখলে বিশ্বাস করতো কেউ?

কেউ বা ওরই মধ্যে একটু ব্যঙ্গাত্মক হাসি মিলিয়ে বলে, আদর্শ হিন্দু স্ত্রী।

এমনি বিলেত ফেরতা ডাক্তার ভৌমিকও সেদিন কথায় কথায় বলছিলেন, স্বামীর প্রতি অন্ধ ভালোবাসা দেখে এসেছি লণ্ডনের কোনো কোনো পরিবারে, কিন্তু রুগ্ন স্বামীর মাথার পাশে পনেরো রাত্রি ধ'রে কোনো মেয়ে ব'সে থেকেছে—একথা শুনলে তারাও বিশ্বাস করবে না। এ কেবল ইণ্ডিয়াতেই সম্ভব। আপনি কি সত্যই রাত্রে ঘুমোন না, মিসেস রায়?

শিবানীর মুখে চোখে চিন্তাবৈলক্ষণ্যের রেখা মাত্র দেখা গেল না। তিনি বললেন, সময় পেলে ঘুমোতুম বৈ কি।

পনেরো বছরের মেয়েটি আজ প্রায় পাঁচ মাস শয্যাগত; বারো বছরের ছেলেটি আশৈশব মৃগী রোগে ভুগছে। পারিবারিক অবস্থাটা সচ্ছল। বাড়ীতে ঠাকুর চাকর ঝি—সবাই আছে। ওরা থাকে ঘরসংসার নিয়ে, শিবানী থাকেন রোগীদের নিয়ে। বাড়ীর ভিতরের চারিদিকে অদ্ভুত রোগের চক্রান্ত,—বিচিত্র এবং বিভিন্ন ঔষধের সংমিশ্রিত কড়া গন্ধ দিবারাত্র বাড়ীর মধ্যে ভেসে বেড়ায়,—এবং এই সকল দুরারোগ্য ব্যাধির একটা নিত্যনৈমিত্তিক ষড়যন্ত্র প্রায় পাঁচ বছর থেকে শিবানীকে স্থির থাকতে দেয়নি। ওই কটু ও কঠিন গন্ধটাই ওঁকে সক্রিয় ক'রে রাখে।

সেদিন পাড়ার একটি মহিলা প্রশ্ন করছিলেন, আপনার স্বামীর হাতে অতখানি সুতো বাঁধা কেন, বৌদিদি?

আসছি।—ব'লে শিবানী স্বামীর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। টেবিলের ওপর থেকে ওষুধ এক দাগ নিয়ে স্বামীর মুখে ঢেলে দিলেন, পরে কাচের পাত্র থেকে চারটি বেদানার দানা নিয়ে রোগীকে খাওয়ালেন। উচ্ছিষ্টের পাত্রটা ধরলেন মুখের কাছে। কাজ সেরে আবার বেরিয়ে এলেন।

বাইরে এসে সেই মহিলার দিকে ফিরে বললেন, হঁ্যা, ওগুলো সুতো। বাবা তারকনাথের তাগা।

কবে পরালেন ?

ছু'বছর আগে।

মহিলা প্রশ্ন করলেন, আপনাদের বিশ্বাস আছে বুঝি ?

রেখাহীন নির্বিকার মুখে শিবানী বললেন, তারকনাথে গিয়ে আমি ধর্না দিয়েছিলুম। তিনদিন পরে ওষুধ পাই আঁচলে। সেই ওষুধ ওঁর গলায় ঝোলানো।

আপনার মেয়ের গলার কবচখানাও বুঝি তাই ?

না, ওটা শুদ্ধিবাবার কবচ। হাতে সিদ্ধেশ্বরীর মাতুলী।—শিবানী চ'লে গেলেন অন্য ঘরে।

সেদিন বাত্রিশটি টাকা পকেটে পুরে ডাক্তার ভৌমিক বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। রোগীর সামনেই শিবানী বললেন, ডাক্তারবাবু, আপনার হাতে রোজ দিতে আমি লজ্জা পাই। এক কাজ করুন, এই টানায় আমার টাকা আছে, আপনি এর থেকে আপনার ফী গুণে নিয়ে যাবেন রোজ।

মুখের চেহারায় ও কণ্ঠস্বরে কিছুমাত্র উত্তাপ নেই, যেন কলের পুতুল কথা কইলো। যে আজ্ঞে—ব'লে ডাক্তার চ'লে গেলেন। এমন সময় বারান্দার পূর্বদিকের দালানে শোনা গেল মসমসে জুতোর আওয়াজ। বুঝতে পারা গেল কন্যার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন হোমিওপ্যাথী ডাক্তার। ভদ্রলোকের বয়স কম, চোখে চশমা, কোটপ্যান্ট পরা,—মাথায় মস্ত টাক। ওই ধার থেকেই হঠাৎ এলো কড়া ফিনাইলের গন্ধ। বাড়ী এতক্ষণে ফিনাইল দিয়ে ধোয়া হচ্ছে।

স্বামীর ঘরে এলেন শিবানী। বেলা ঠিক সাড়ে ন'টা ঘড়িতে। গরম জলে তোয়ালে ডুবিয়ে নিংড়ে স্বামীর মাথা ও গা মুছিয়ে দিলেন। স্বামী যেন কী বলছিলেন বিজ বিজ ক'রে—কিন্তু শিবানী নিজের মনে কাজ ক'রে গেলেন। রোগীর মুখে পথ্য দিয়ে এক সময়ে তিনি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ডাকলেন, মালী ?

চাকর এসে দাঁড়ালো। শিবানী বললেন, দিদিমণির ঘরে দুধ দাও।

মালী চলে গেল। একটা ছোট শিশির ছিপি খুলে শিবানী একবার স্বামীর নাকের কাছে ধরলেন, তারপর শিশিটি যথাস্থানে আবার রেখে তিনি বেরিয়ে এলেন। গন্ধটা শোঁকানো দরকার।

বারান্দা পেরিয়ে শিবানী কোণের ঘরে এসে ঢুকলেন। সামনে যে-দৃশ্য দেখা গেল, সন্তানের জননী ছাড়া আর যে-কেউ দেখলে শিউরে উঠতো। ছেলেটা অজ্ঞান হয়ে একতাল মাংসপিণ্ডের মতো বেঁকেচুরে পড়ে রয়েছে। বাঁকা পা দুটো ঢুকেছে পেটের মধ্যে, বাঁকা মুখের পাশ দিয়ে চোখ দুটো নাকের পাশে কোথায় হারিয়ে গেছে। ছেলেটা অজ্ঞান হয়ে রয়েছে দেখে শিবানী কয়েক মুহূর্তে থমকে দাঁড়ালেন। তারপর তাকের উপর থেকে সর্ষের তেলের বাটি নিয়ে এসে সেই অচেতন ছেলেটাকে তেল মাখাতে বসে গেলেন। চাকর এক বালতি জল দিয়ে গেল, ঝি এনে দিল গামছা আর সাবান। শিবানী নিত্যনৈমিত্তিক নিয়মে ছেলেটাকে স্নান করাতে বসে গেলেন। মৃগীবিকার সারবে একটু বাদে—শিবানী জানেন। অতএব তাকে স্নান করিয়ে সেই কদাকার বিকারের মধ্যে রেখে তিনি গেলেন কন্যার ঘরে। হোমিওপ্যাথী ডাক্তার ততক্ষণে চলে গেছেন। শিবানী গিয়ে দুধের গেলাসটা ধরলেন মেয়ের মুখে। তিনি হলেন যন্ত্র। তাঁর ক্রিয়া আছে, চালনা আছে, উদ্যমও আছে। তাঁর ক্লান্তি নেই, অবসাদও নেই।

বাইরে কার গলার আওয়াজে তিনি একসময়ে আবার বেরিয়ে এলেন। একটি ছোকরাকে দেখে বললেন, কি রে দেবেন ?

দেবেন বললে, কবিরাজমশাই এই ওষুধগুলো পাঠালেন। এর মধ্যেই নিয়ম আর অনুপানের ফর্দ আছে, পিসিমা। আর শুনুন, আপনার ছোড়দার ওখানে গিয়েছিলুম।

শিবানী তার দিকে তাকালেন। দেবেন বললে, তাঁর স্ত্রীর অবস্থা খুব খারাপ। বোধ হয় বাঁচবেন না।

হ্যাঁ জানি। বলে কবিরাজী ওষুধের মস্ত মোড়কটা তুলে নিয়ে শিবানী ভিতরে চলে গেলেন। তাঁর কণ্ঠে কাঁপন নেই, ব্যথা-বেদনা অথবা সহানুভূতির লেশমাত্র নেই। দেবেন তাঁর পথের দিকে একবার তাকিয়ে চলে গেল।

ঘড়ির দিকে একসময় তাকিয়ে শিবানী গেলেন রান্নাঘরে। সেখান থেকে কাচের প্লেটে ভাত আর সিদ্ধ তরকারি নিয়ে এলেন কোণের ঘরে ছেলেটার কাছে। খাদ্যের চেহারা দেখে শৃঙ্খলাবদ্ধ জন্তুর মতো বিকলাঙ্গ ছেলেটা আনন্দে কিলবিল করে উঠলো। শিবানী তাকে খাওয়াতে বসে গেলেন। পোড়াকাঠের মতো কালো জন্তুটা!

কিন্তু মেয়েটা তেমন নয়। এই সেদিন পর্যন্ত মেয়েটা ছিল সুশ্রী। পনেরো বছর বয়সে সবেমাত্র সর্বাঙ্গে তারুণ্যের নধর সুকুমার ছন্দ এসে পৌঁছেছিল, এমন সময়ে এলো জ্বর। দেখতে দেখতে চোখের কোণে কালি, দেখতে দেখতে মাথার চুলের রাশি বিবর্ণ—মেয়েটাই স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে এসে বিছানা নিল। পাঁচ মাস হোলো শুয়েই আছে। বিছানাটা যদি আর না ছাড়ে তবে বিস্ময়ের কারণ নেই।

পাশের বাড়ীর গিন্নী বলেন, বোঝা সয়, যে বোঝা বয়! কী ধৈর্য, আমরা অবাক হয়ে যাই। মুখে একটি কথা নেই সারাদিন। একালে এমন মেয়ে দেখা যায় না কোথায়ও! পাঁচ বছর হোলো, মা!

আরেক জন বলেন, পাঁচ বছর হোলো ওই চারখানা ঘরের মধ্যে শিবানী ঘুরছে। আমরা কত বলি বাছা বিকেলের দিকে ছাদে উঠেও ত' একটু নিঃশ্বাস ফেলতে পারো? কিন্তু কিছুতেই আমাদের কথা শোনে না।

ও বাড়ীর পিসি বলেন, আজকাল কলকাতায় কত সিনেমা হয়েছে, কত লোক বেড়ায় কত দিকে,—কিন্তু শিবানী এক পা দেয়না বাড়ীর বাইরে। নিজের শরীর বাঁচলে তবেই ত' স্বামী-সন্তানের সেবা করবি, মা?

কে যেন চাপা গলায় বলে, স্বামী যে বাঁচবে না এ সবাই জানে। মাঝ থেকে নিজের শরীরটাই অযত্নে নষ্ট করা বৈ ত' নয়!

সেদিন ডাক্তার ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যাচ্ছিলেন, শিবানী এলেন পিছনে পিছনে! ডাক শুনে ডাক্তার থমকে দাঁড়ালেন। শিবানী বললেন, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

কি বলুন?

আমার স্বামীকে কেমন দেখলেন আজ?

ঠিক বলা কঠিন, মিসেস রায়।

শিবানী প্রশ্ন করলেন, পাঁচ বছরে কি ওঁর কোনো উন্নতি হয় নি?

ডাক্তার ভৌমিক বললেন, আপনারা মাঝখানে আমাকে প্রায় বছর খানেক ডাকেন নি। এই পাঁচ বছরে প্রায় কুড়িবার আপনারা ডাক্তার বদল করেছেন।

শিবানী বললেন, ফল না পেলেই ডাক্তার বদলাতে হয়। কিন্তু আর ক'বছর আমাকে রাত জাগতে হবে, ডাক্তার ভৌমিক?

ডাক্তার একটু অপ্রতিভ হাসি হাসলেন। শিবানীর কণ্ঠস্বরে পাওয়া যায় সমগ্র চিকিৎসক সমাজের প্রতি অনুযোগ। ডাক্তার আড়ষ্ট কণ্ঠে বললেন, ব্যাপারটা কি জানেন, ওঁর শরীরে আছে চাপা পক্ষাঘাত, তার ওপর বাত, ব্রেণের দোষ, হার্টের গোলমাল। তা ছাড়া আমার বিশ্বাস ওঁর চিকিৎসা-বিভ্রাট হয়েছে। মাঝখানে আপনারা হোমিওপ্যাথী করতে গিয়ে অনেকদিন সময় নষ্ট করেছেন।

শিবানী নির্বিকার মুখে প্রশ্ন করলেন, ওঁর বাঁচবার আশা কি একেবারেই নেই।

ডাক্তার একবার তাকালেন তাঁর দিকে! পরে বললেন, আজ আপনাকে একটু বেশী চঞ্চল দেখা যাচ্ছে। এ আলোচনা আজ থাক্ মিসেস রায়। নমস্কার।

ডাক্তার ভৌমিক বাইরে গিয়ে নিজের মোটরে উঠলেন। কিন্তু অত্যন্ত ভুল ক'রে গেলেন তিনি। শিবানী একেবারেই চঞ্চল নন! চাঞ্চল্যটা তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তিনি কেবল জানতে চেয়েছিলেন স্বামীর জীবনের আশা আছে কিনা। যদি মোটামুটি একটা হদিস পাওয়া যেতো যে, বেঁচে উঠতে এতদিন সময় লাগবে, অথবা মৃত্যুর আর মাত্র এতদিন বাকি,—তাহ'লে রাত্রি জাগরণের হিসাবটাও ওই সঙ্গে পাওয়া যেতে পারতো। এটা স্থিতবুদ্ধির কথা, চাঞ্চল্যের কথা নয়। ডাক্তার নির্বোধের মতো ভুল ক'রে গেল। এটা জীবনমৃত্যুর কথা, হৃদয়াবেগের কথা নয়। স্বামী বাঁচবেন, অথবা বাঁচবেন না—এটা জানবার দরকার শিবানীর আছে বৈকি।

এমন সময় বাইরে একখানা গাড়ী এসে দাঁড়ালো। গাড়ী থেকে নেমে এলেন এক ভদ্রলোক এবং বছর চারেকের একটি ছোট ছেলে। ভদ্রলোক নেমে এসে ডাকলেন, শিবানী, কই রে?

শিবানী বেরিয়ে এলেন। ভদ্রলোক বিষণ্ণ মুখে বললেন, তোর বৌদিদি মারা গেছে কাল দুপুরে। শেষকালটা ভারি কষ্ট পেয়েছিল।

শিবানী প্রশ্ন করলো, শ্মশান থেকে ফিরলে কখন্ ছোড়দা?

ছোড়দা বললেন, ফিরেছি তখন প্রায় রাত এগারোটা। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে এই, আমাদের সাহেব টেলিগ্রাম করেছে। আজ আমাকে বোম্বে যেতেই হবে। আমার ওখানে আর ত' কেউ নেই, ছেলেটাকে কোথায় রেখে যাই।

শিবানী বললেন, আমার এখানে রাখবে, কিন্তু এবাড়ী ত' দিনরাত ওষুধের গন্ধ ভরা। যদি তোমার ছেলে সুস্থ না থাকে, ছোড়দা?

ছোড়দা বললেন, যা কপালে আছে তাই হবে। কিন্তু একে আমি নিয়ে যাবো কোথায়? তোর এখানে ছাড়া আর কোনো জায়গায় রাখতে আমি ভরসা পাইনে। রায় মশাই কেমন আছেন?

শিবানী জবাব দিল, একই রকম।

নীলিমা!

বুঝতেই পারো!

ছোড়দা বললেন, হুঁ। তোর ছেলেটারও ত' ওই দশা। কবে যে তুই মুক্তি পাবি!

মুক্তি! শিবানীর মুখখানা কঠিন হয়ে উঠলো, কিন্তু সে চুপ ক'রে রইলো। যাবার সময় ছোড়দা বললেন, আমার ওখানকার চাটি-বাটি সব তুলে দিয়ে গেলুম। এবার যাচ্ছি অনেকদিনের জন্মে। কানু তোর এখানে রইলো, তোর এখানেই থাকবে।

ছোড়দা চ'লে গেলেন। একটি সমবেদনার কথাও শিবানীর মুখে এলো না। কানুর মা মুক্তি পেয়ে গেছে রোগ থেকে,—দুঃখ কিছু নেই।

সমস্ত বাড়ীখানা নিবিড় শান্ত। চুপ ক'রে থাকো, বাতাসের শব্দ কান পেতে শোনো। মানুষ আছে অনেকগুলি, কিন্তু শব্দ নেই। শব্দটাই জীবন, শব্দহীনতাই মৃত্যু। মাঝে মাঝে হয়ত কোনো রোগীর আর্তকণ্ঠের গোঙানি, হয়ত বা ওই মৃগীরোগী ছেলেটার একপ্রকার বিকৃত আওয়াজ,—তারপরে সব চুপ। বাইরে হয়ত কোনো মধ্যাহ্নকালের পাখীর এক টুকরো কলকূজনের আওয়াজ। আর কিছু নেই। এক ঘরে গিয়ে শিবানী ওষুধ খাওয়ায়, অন্য ঘরে গিয়ে মাথা ধোয়ায়, পাশের ঘরে গিয়ে বিছানা বদলে দেয়। এক গন্ধ থেকে আরেক গন্ধে; এ গন্ধ থেকে ও গন্ধে!

সমস্ত ঘরগুলি মূল্যবান আসবাবে সুসজ্জিত, মেঝেগুলি আরসির মতো ঝরঝরে পরিচ্ছন্ন। ধুলো-বালি-ময়লা-নোংরা কোথাও বিন্দুমাত্র নেই।

কিন্তু প্রত্যেকটি ঘরের আসবাবপত্র যেন প্রেতের মতো দাঁড়িয়ে আছে, দেওয়ালের প্রত্যেকটি ছবির যেন কিছু একটা ভাষা আছে, একটা চাপা শব্দহীন চক্রান্ত। একা ঘরে ঢুকতে অনেক সময় যেন ভয় করে।

হঠাৎ ওঠে আওয়াজ,—পিসিমা?

ঘরগুলো যেন চমকে ওঠে, আসবাবপত্রগুলো যেন প্রাণ পেয়ে থরথর করতে থাকে। শিবানীর হাত থেকে চামচখানা খ'সে পড়ে। নিঃসাড় প্রেতপুরীর মাঝখানে যেন নবজীবনের ডাক।

শিবানী এসে দাঁড়িয়ে বলেন, কি রে কানু, ভয় করছে, কোলে উঠবি?

কানু ঘাড় নেড়ে বলে, উহুঁ না,—আমাকে যে তুমি বল কিনে দেবে বলেছিলে?

ভাষাটা স্পষ্ট নয়, কিন্তু এই। শিবানী বললেন, আজই তোর বল আনিয়ে দেবো। আর কি চাই বল্‌।

কিচ্ছু না।—পিসিমা, আমি পান সেজে দেবো তোমার জন্যে!—কানু কাছে এসে আবদার ধ'রে বসে।

শিবানী হাসতে গিয়ে চমকে উঠলেন। এর নাম কি হাসি? এ তাঁর মনে নেই! নিজের মুখের চেহারা পাছে তাঁর চোখে পড়ে, এজন্য আয়নার সামনে তিনি চুল বাঁধেন না। এ হাসি তাঁর মুখে কেমন মানালো, একবার দেখলে কেমন হয়?

ছেলেটা কাছে আসতে জানে, ঔদাসীন্যটাকে কৌতূহলে পরিণত করতে জানে। শিবানীকে গম্ভীর দেখে সে আঁচলে ধ'রে বললে, পিসিমা আমি কাজ করবো!

কী কাজ করবি তুই?

সব কাজ করবো।

শিবানী হাসলেন। বললেন, আচ্ছা দেখে আয় দেখি বারান্দায় চাদর-খানা শুকিয়েছে কিনা?

কানু অমনি ছুটলো। বারান্দা থেকে শুকনো চাদর তুলে আনলো। কী বিজয়গর্ব ওর মুখে চোখে! কী আশ্চর্য সংহত চাঞ্চল্য ওর নধর স্বাস্থ্যশ্রীতে! শিবানী বললেন, এত কাজ করলে তোর যদি অসুখ করে, কানু?

না, অসুখ করবে না, তুমি দেখো।—পিসিমা, আমি আজ থেকে তোমার কাছে শোবো।

আমি কি শুই যে, আমার কাছে তুই শুবি?

তবে আমি থাকবো তোমার কাছে রাত্তিরে?

শিবানী ওর পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, আমি যে রুগীর ঘরে থাকি!

কানু বললে, আমিও থাকবো!—আচ্ছা পিসিমা, ওরা অত ওষুধ খায় কেন?

আমি যে অনেক পাপ করেছি তাই ওরা ওষুধ খায়!

কানু অবাক হয়ে পিসিমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। শিবানী বলেন, আয় কানু, তোকে জামা পরিয়ে দিই।

না, পরবো না!

ওমা, ঠাণ্ডা পড়েছে যে!

না, ঠাণ্ডা পড়েনি!—কানু ছুটো পালিয়ে যায়। রুগ্না জননীর মৃত্যু ঘটেছে সেজন্য ছেলেটার একটুও ভাবান্তর দেখা যায় না। ছেলেটা শূন্যঘরে গিয়ে দাঁড়িয়ে নিজের মনে কথা কয়। একদিন বাইরের ঘরের বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে সে নেচেই অস্থির। এ বাড়ীতে প্রত্যেক ঘরেই যেন তা'র একজন ক'রে বন্ধু লুকিয়ে আছে, কানু নিজের মনেই কানামাছি খেলতে খেলতে সেই বন্ধুদের খুঁজে বেড়ায়। খেলতে খেলতে নিজেই সে মেতে ওঠে; নানা কাজের ফাঁকে শিবানী ওকে লক্ষ্য করেন।

ওঘর থেকে স্বামীর ডাক শুনেই শিবানীর মুখখানা গম্ভীর হয়ে ওঠে। স্বামী অসুস্থ হ'লে স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ বাড়ে। শিবানী তাড়াতাড়ি ওঘরে গিয়ে হাজির হন্। রোগীর মুখে একটু জল, একটু ফল, একটুখানি গায়ে হাত বুলানো, বালিশটা ঠিক ক'রে দেওয়া, গায়ের উপর চাদর টানা, জান্‌লাটা একটু ভেজানো, বেড্‌প্যান্‌টা একটু সরানো। শিবানীর হাত অতি নিপুণ, সেবায় অতি একাগ্রতা, যত্নে একান্ত আন্তরিকতা। তারপরে তিনি বেরিয়ে আসেন, বেসিনের কাছে গিয়ে কটুগন্ধ কারবলিক্ সাবান দিয়ে হাত ধোন্। তারপরে যান্ শ্রীমতী নীলিমার কাছে, সেখান থেকে ঘণ্টির ঘরে। ঘণ্টির তখন মৃগীবিকার দেখা দিয়েছে।

ওমা, কানু তুই কি করছিস এখানে রে?

ঝি এসে হাসিমুখে অভিযোগ জানালো, ওই দেখুন—এক বালতি জল এনেছে, গামছা এনেছে আপনার জন্যে,—আমার কাছে গিয়ে বলে, সৈরুবী, তেলের বাটি দাও! আমি বলি, তেলের বাটি কি হবে, দাদা? বলে,

পিসিমা বুঝি চান্ করবে না? আমি যে পিসিমাকে খাইয়ে দেবো!—শুনুন ছেলের কথা!

আনন্দোচ্ছ্বাস প্রকাশ করবেন না শিবানী,—কেননা তাঁর মুখে হাসি দেখলে ঝি-চাকররা চম্‌কে উঠবে। তিনি বললেন, আচ্ছা না হয় খাইয়েই দিবি, কিন্তু জল ঘেঁটে যদি অসুখ করে?

কানু মুখ ফিরিয়ে বললে, বললুম যে অসুখ করবে না?

তুই কি পণ্ডিত যে, সবজান্তার বড়াই করিস?

কানু ভাবলো, না, পণ্ডিত সে নয়। সুতরাং হতাশ হয়ে সে পিসিমার পাশে এসে দাঁড়ালো। ঝি একেবারে হেসেই অস্থির।

কানু এসেছে, যেন প্রাণ এসেছে বাড়ীতে। তার চলাফেরার মধ্যে মুক্তির সংবাদ আছে। সে যেন অচল জড়তাকে আঘাত করে। সে যেন তুষারস্তূপের মধ্যে উত্তাপ আনে, সেই উত্তাপে বিগলিত প্রাণধারা নেমে আসে। তার সারাদিনের কলকণ্ঠ আর কাকলী যেন প্রত্যেকখানা ঘরের ভিতরকার বহুকালের অসাড়তাকে মুখর ক'রে তোলে। শিবানী চুপ ক'রে নতুন পাখীর কাকলী উৎকর্ণ হয়ে শোনেন। শুনতে শুনতে নিজের মধ্যে তিনি ডুবে যান্।

কানু স্বাধীন। সে নিজে স্নান করবে, ভাতের থালা নিয়ে গিয়ে দাঁড়াবে বামুনঠাকুরের কাছে, নিজে জামা জুতো পরবে, এবং নিজের মাথা নিজেই আঁচড়াবে। পিসিমার কোনো সাহায্য না নিয়েই সে চলবে,—এবং যতটুকু হোক, পিসিমার পায়ে-পায়ে ঘুরে তাঁর কাজে কিছু সাহায্য সে করবেই। ছেলেটা অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান, এবং চেহারাটা সত্যকার সুশ্রী। সন্ধ্যার পর সে যখন যেখানে-সেখানে ঘুমে লুটিয়ে পড়ে, শিবানী এসে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন তা'র সামনে। ভালোবাসতে ইচ্ছে করে তাঁর,—কোলে নিয়ে কিছুক্ষণ কাঁদতে ইচ্ছে করে। ছেলেটা এ বাড়ীতে আসার পর থেকে তাঁর কাজ কিছু বাড়ে নি, বরং কাজ কমেছে, বরং আজকাল তাঁর কপালে একটু বিশ্রামও জোটে।

হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার একদিন বললেন, মিসেস রায়, নীলিমার আমি কোনো উন্নতি করতে পারলুম না। আপনি অন্য ব্যবস্থা করুন।

শিবানী বললেন, আর কতদিন মেয়েটা ভুগবে মনে করেন?

তিনি বললেন, আমাদের ওষুধ হোলো দীর্ঘ-মেয়াদী,—অনেকদিন পর্যন্ত ধৈর্য না রাখলে ফলাফল দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু রোগীর অবস্থা খারাপ হচ্ছে, মিসেস রায়।

পরের দিনে থেকে শিবানী অন্য ডাক্তারের ব্যবস্থা করলেন। ব্যবস্থাটা রাজোচিত এবং ব্যয়বহুল। কিন্তু সেদিকে শিবানীর ভ্রূক্ষেপ নেই। এ তিনি জানেন, এ হবে,—এ হোলো নিয়তি। কিন্তু এর শেষ তিনি দেখতে চান্, দেখতে চান্ অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। মেয়েটা যেন দিন দিন বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে যাচ্ছে। মোমবাতিটা জ্বলছে, নিবেও যাবে এক সময়ে, কিন্তু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ঠিক আন্দাজ করা যায় না,—কাঁটায়-কাঁটায় মোমবাতিটুকু কখন্ শেষ হবে। কিন্তু প্রত্যেকটির চরম লগ্ন নির্ভুলভাবে জানা গেলে ভালো হোতো। বলা বাহুল্য শিবানীর মুক্তি চাই। শুধু দৈহিক মুক্তি নয়, মুক্তি চাই মনে, মুক্তি চাই চিন্তায়, কল্পনায়। সমস্ত প্রকার বিভীষিকার ভিতর দিয়ে যদি সে-মুক্তি আসে, সেও ভালো।

পাড়ার লোকের মধ্যেও জানাজানি হয়ে গেছে যে, শিবানীর স্বামীর আর কোনো আশা নেই। যে-কোনো দিন যে-কোন সময়ে বজ্রাঘাত হতে পারে। পাড়ার লোক থাকে কান পেতে, কতক্ষণে তারা শিবানীর ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে ডুকরে-ডুকরে কান্না শুনতে পাবে। ঝি-চাকর উঠবে চেঁচিয়ে, বাইরের লোক ছুটোছুটি করবে, শুনবে সম্মিলিত চীৎকার।

এমনি সময়ে এলেন বিধবা ননদ, এলেন মামাশ্বশুর, এলেন বড় বড় ছেলেমেয়ে তিন চারজন। বাড়ী ভরে উঠলো এবার কোলাহলে। কানু হকচকিয়ে এসে দাঁড়ালো পিসিমার পাশে। শিবানী বললেন, ওদের দেখে ভয় করছে নাকি রে কানু?

ভয়? না—কানু হাসলো। তারপর ছুটে চলে গেল খেলা করতে।

এর পরে দিন হোলো গোণাগুণতি! কেননা আত্মীয়রা এসেছিলেন মিঃ রায়ের অন্তিমকালে। তাঁরা সেবা করতে আসেন নি, এসেছেন সৎকার করতে। তাঁরা জানতেন, পাঁচ বছর ধরে বিনিদ্র রাত্রি যাপন করে যে-নারী স্বামীকে বাঁচিয়ে তুলতে পারে না,—স্বামীর মৃত্যু সে কি বরদাস্ত করতে পারবে?

হেমাঙ্গিনী—শিবানীর বড় ননদ—শিবানীর পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, কখনো যা দেখি নি তাই দেখলুম তোর সেবায়,—অনেক করলি তুই। কিন্তু বাঁচা-মরা তোর হাত নয় বৌ!

শিবানী চুপ করে রইলো। গা তার ঠাণ্ডা। হেমাঙ্গিনী পুনরায় বললেন, ভাইটির আশা আর নেই, চোখেই দেখছি। কিন্তু তোকে আর জাগতে হবে না—ছেলেমেয়েরা এসেছে, ওরাই সব করবে।

মামাশ্বশুর ওধার থেকে ডাকলেন, হেম?

হেমাঙ্গিনী সাড়া দিলেন, মামা কিছু বলছেন?

হ্যাঁ, বৌমাকে বলো,—উনি একটু বিশ্রাম নিন্।

শিবানী শিউরে উঠে বললেন, বিশ্রাম নিতে গিয়ে যদি ঘুম আসে, দিদি?

বেশ ত ঘুম আসে—ঘুমোবি? হয়েছে কি?

কিন্তু আপনারা কি পারবেন অত কাজ?

ওমা, তা কেন পারবো না? ওরা চারজন, আমি নিজে, মামা রয়েছেন মাথার ওপর,—তারপর ঝি-চাকর-বামুন—সবাই আছে। কিচ্ছু অসুবিধে হবে না, বৌ!

ডাক্তার জবাব দিয়ে গেছে ঘণ্টা দুই আগে। কিন্তু অনেককাল পরে এতগুলি মানুষ চারিরিকে দেখে শিবানী যেন অপরিসীম ক্লান্তিতে অবসন্ন বোধ করছিলেন। ডাক্তার বলে গেছেন, আজকের রাতটা হয়ত কাটবে, কিন্তু আসছে কাল বেলা বারোটা পর্যন্ত কাটবে কিনা বলা খুব কঠিন। মিঃ রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছেন।

আসছে কাল বেলা বারোটা?—সে অনেক দেরী। শিবানী সমস্ত সযত্নে গুছিয়ে রেখে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিতে গেলেন। দরকার হ'লে মুহূর্তের মধ্যে তিনি উঠে আসবেন। রোগীর আর কোন আশা নেই, কিন্তু তাঁরও আর দাঁড়াবার শক্তি নেই। অন্যদিন এমন সময় বিশ্রামের কথা তাঁর কল্পনাতেও আসে না, আজকে কিন্তু বিশ্রাম নেওয়া ছাড়া অন্য কিছু তিনি ভাবতেও পারছেন না।

নীলিমা রইলো একজনের হেপাজতে, ঘণ্টি রইলো আরেক জনের তদ্বিরে। ওদের জন্য কোনো অসুবিধা নেই। স্বামীর বিছানার চারপাশেও রয়েছে সবাই। পলকে-পলকে তাঁর তদারক চলছে। বিগত কুড়ি বছরের কথা আজ তাঁর মনে পড়েছে। একটি দিনের জন্যও স্বামীর সঙ্গে তাঁর ছাড়াছাড়ি হয় নি; কখনো কোনো কারণে স্বামীর সঙ্গে তাঁর বিতর্ক বাধে নি। দুই দেহ শুধু আলাদা, কিন্তু দুইয়ে মিলে এক, অভিন্ন, অবিচ্ছেদ্য! কুড়ি বছরের ইতিহাস সগৌরবে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে।

ক্লান্তিতে শিবানীর দুই পা অবসন্ন, সর্বশরীর টলটল করছে। তিনি বাইরের দিকে এলেন, যেদিকটায় ঔষধপত্রের গন্ধটা কিছু কম। দক্ষিণের ঘরে কানু নিজের বিছানায় এসে শুয়ে থাকে, কিন্তু আজ কানু সেখানে নেই। শিবানী ঘুরতে ফিরতে এলেন বাগানের দিককার কোণের ঘরের দিকে। জানালা দিয়ে সেখানে চাঁদের আলো এসে পড়েছে; সেই আলোর আভায় তিনি দেখলেন, কানু অকাতরে ঘুমিয়ে রয়েছে খাটের ওপর। একা ঘরে অন্ধকারে এসে শুতে ছেলেটার একটুও ভয় করে না।

সন্ধ্যার পরে এদিকটা একটু নিরিবিলি। দূরে কাদের বাড়ীতে যেন রেডিয়ো যন্ত্রটা খোলা আছে। নারীকণ্ঠের মধুর কীর্তন শোনা যাচ্ছিল। কানুর পাশে এসে শিবানী তাঁর আড়ষ্ট দেহটা ছড়িয়ে দিলেন, এবং আঁচলটা চাপা দিলেন কানুর গায়ে। চোখের পাতা তাঁর ঘুমে জড়িয়ে আসছিল। কিন্তু কীর্তনের স্বরপ্রবাহটাকে ছাড়িয়েও তিনি কান খাড়া ক'রে রাখলেন ভিতর বাড়ীর দিকে,—যেদিকে রোগীর ঘর।

বোধ হয় ঘণ্টা দুই পরে হবে। একটি মেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে ঘরে ঢুকলো।—মামীমা, ও মাসীমা,—শিগগির উঠুন, মামা কেমন করছেন! শিগগির আসুন, ও মামীমা—?

শিবানী জেগে উঠলেন, জড়িত কণ্ঠে বললেন, চলো যাচ্ছি। কিন্তু আমি আর কী করবো, সবিতা?

সবিতা ছুটে চ'লে গেল। যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েও শিবানী আবার শুলেন কানুর পাশে। তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

আবার এলো দুটি ছেলেমেয়ে আর হেমাঙ্গিনী নিজে। শিবানীর শয়নের ভঙ্গী আর নিশ্বাসের অসমতাল লক্ষ্য করে ওঁরা ধ'রে নিলেন শিবানী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। হেমাঙ্গিনী কাছে এসে শিবানীর মাথায় হাত রেখে বললেন, বড্ড কষ্ট পাচ্ছিল, তুই আর কাঁদিস নে বৌ তা'র জন্যে। সে জুড়িয়ে গেছে। আচ্ছা, তোর আর উঠে কাজ নেই,—ওরাই শ্মশানে নিয়ে গিয়ে সব কাজ করবে। তোকে আর কিছু দেখতে হবে না!—এই ব'লে ছেলে মেয়েদের নিয়ে তিনি কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেলেন।

শিবানী কিন্তু তখন অঘোর নিদ্রায় নিদ্রিত। কোন কথাই তাঁর কানে ওঠে নি।

ঘুম তাঁর ভাঙ্গলো পরের দিন সকাল ন'টায়—ওরা সবাই তখন শ্মশান থেকে

ফিরেছে। ঘুম ভাঙালো কানু। ঘুম থেকে উঠে টলতে টলতে শিবানী যখন রোগীর ঘরে গেলেন, দেখলেন ঘরে স্বামী নেই! স্বামী মারা গেছেন বুঝতে বাকি রইলো না,—কিন্তু কখন্ মারা গেছেন, এবং মৃত্যুকালে তাঁকে ডাকা হয়েছিল কিনা কিছুই তাঁর মনে নেই! তাঁর মনে নেই গতরাত্রির কোনো কথা!

শিবানী ঘরের দেওয়াল ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছু ভাববার চেষ্টা ক'রেও তাঁর মাথায় কিছু ঢুকলো না। শোক সন্তাপের চেতনা তাঁর আসছে না, আসছে শুধু দুই চোখ ভ'রে গাঢ় নিশ্চিন্ত নিদ্রা। যত শীঘ্র সম্ভব স্নান সেরে কোরা থান কাপড় প'রে তিনি ঘুমিয়ে পড়তে পারলে বাঁচেন!

দিন পনেরো বাদে কানুকে সঙ্গে নিয়ে শিবানী চ'লে গেলেন দেওঘরে। ওরা সবাই রইলো বাড়ীতে। রইলো দুরারোগ্য ব্যাধি নিয়ে নীলিমা, রইলো বিকলাঙ্গ ছেলেটা একপাশে। কানুকে নিয়ে তিনি গিয়ে নামলেন সাঁওতাল পরগণার মাঠে। হেমন্তের আকাশ শিউরে উঠেছে তখন নীলবর্ণ সমারোহে। এ মাঠের হাওয়ায় ঔষধের গন্ধ নেই, বিকারের প্রলাপ নেই। আর্তের নৈরাশ্য নিশ্বাস নেই। অখণ্ড অনন্ত মুক্তি মাঠে-ময়দানে। পাশে আছে তাঁর এক ক্ষুদ্র বালক। হাস্যমুখর, চিত্তচঞ্চল, বলিষ্ঠ আর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল! ও যেন ওই উদার মাঠের অপরিসীম মুক্তির মন্ত্রটি জানে। ও জানে নবজীবনের সংবাদ, নবতারুণ্যের জয়গান। ওকে নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়ান্ মাঠে মাঠে।

শিবানীর থাকবার কথা ছিল এখানে দিন পনেরো। কিন্তু প্রায় দেড়মাস তিনি থেকে গেলেন। তারপরে এক টেলিগ্রাম এলো, নীলিমার অন্তিম ঘনিয়ে এসেছে, শীঘ্র এসো।

নীলিমা? মনে প'ড়ে গেল বটে বাড়ীতে আছে রুগ্না নীলিমা আর বিকলাঙ্গ ঘন্টি। সেইদিনই শিবানী জিনিসপত্র গুছিয়ে কানুকে সঙ্গে নিয়ে দুপুরবেলায় কলকাতার গড়ীতে উঠলেন।

গাড়ী যখন ছাড়বে, গার্ডের বাঁশী যখন বাজলো,—সহসা তাঁর নাকে এলো সেই কঠিন ওষুধের গন্ধ, সেই বাড়ীর ব্যাধি ও বিকারের গন্ধ। তিনি চট্ ক'রে কানুর হাত ধ'রে গাড়ী থেকে নামিয়ে দিলেন, এবং জিনিসপত্র নিজের হাতেই তাড়াতাড়ি টেনে নামালেন। গাড়ী ছেড়ে দিল।

তিনি না গেলে কীই বা ক্ষতি? মৃত্যুর সামনে তিনি আর নাই বা গিয়ে দাঁড়ালেন।

নাটকীয়

শাড়ীর আঁচলটা কাঁধের উপর দিকে ফিরিয়ে বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সুমিত্রা বললেন, মেয়েমানুষের সরলতায় আমি বিশ্বাস করিনে, অপর পক্ষকে মোহগ্রস্ত করবার এটা একটা অস্ত্র—

পাউডারের কৌটো খুলে তুলিয়া নিয়ে তিনি গলায় আর ঘাড়ে একটু আমেজ বুলিয়ে নিলেন। চিরুণীটা একবার টেনে দিলেন সিঁথির দু'পাশে। চিকচিকে বিছাহার ছড়াটা গ্রীবার পাশ দিয়ে গলার দিকে এসে ব্লাউসের ভিতরে নেমে গেছে। তীব্রতী পাথরের দুল দুই কানে। চেহারাটা সুন্দর,—বয়সটা এখনও খুব অল্প দেখায়।

—আমি বিয়ে করিনি কেন বলতে পারো? জীবনটা আমিও কাটিয়ে দিতে পারতুম স্বচ্ছন্দে···স্বামী, সংসার, সন্তান, ঐশ্বর্য্য—যা কিছু আমাদের কাম্য। তবু মাষ্টারি ক'রেই চিরকাল কাটিয়ে দিলুম—

সুমিত্রা আবার আয়নার ভিতরে তাকালেন নিজের দিকে। তারপর পুনরায় বললেন, তিরস্কার তোমাকে আমি করব না, সুধীরা,—উনিশ কুড়ি বছরের মেয়ে তুমি, আমার কাছ থেকে লেখাপড়া শিখে তুমি পাশ করবে, তোমার সব খরচ আমি বহন করব এই ছিল আমার আশা,—কিন্তু এই কি তোমার আচরণ? স্পষ্ট ক'রে উত্তর দাও।

একটি কুরূপা মোটাসোটা মেয়ে ঘরের একান্তে বই হাতে নিয়ে নিঃশব্দে বসেছিল, কিন্তু ব'সে থাকলেও তার দুই গাল বেয়ে চোখের জলও নেমে এসেছিল নিঃশব্দে। উত্তর দিতে গিয়ে তার মুখের কথা থতিয়ে গেল।

সুমিত্রা একবার অপাঙ্গে সেই দিকে তাকালেন। অধর একটু ন'ড়ে উঠলো, কিন্তু সে-বোধ হয় তীক্ষ্ণ একটি হাসির রেখা চেপে যাবার জন্য। চোখের জলের আন্তরিকতায় তাঁর বিশ্বাস নেই। তাঁর এই প্রায় ত্রিশ বছর বয়সের ভিতরে অনেকের অশ্রু দেখতে পাওয়া গেছে। অশ্রুতে তাঁর মন বিগলিত হয় না। মেয়েদের অশ্রুর পিছনে থাকে কার্য্যোদ্ধার ব্যাকুল প্রত্যাশা। তিনি বিশ্বাস করেন না।

বিকৃতমুখে বললেন, দিন দিন তোমার মাথাটার যে-দশা হয়ে উঠলো, দেখতে আমারই লজ্জা করে—চুল আর নেই বললেই হয়, যে কগাছা আছে তাও শোনদড়ি। রূপ সকলের থাকে না,—সুমিত্রা আয়নার ভিতরে চেয়ে বললেন,—যদিও রূপটাই মেয়েদের বড় পুঁজি,—কিন্তু নিজেকে পরিচ্ছন্ন রাখবেনা কেন? তোমাকে নিয়ে ভদ্রসমাজে আমি যেতেই পারিনে, তা জানো, সুধীরা?

এতক্ষণ পরে সেই রূপহীনা মেয়েটি বই থেকে মুখ তুলে তার দুইটি দীর্ঘায়ত চোখ মেলে তাকালো। মৃদু কম্পিত কণ্ঠে বললে, আমি মনে করতুম—

কী মনে করতে তুমি? কথা বেরোয় না কেন?

আপনি সাজগোজ পছন্দ করেন না, তাই মনে করতুম।

এ বাড়ীর আশেপাশে দু'একজন প্রতিবেশী আছেন। তাঁরা না শুনতে পান, সেজন্য চাপা ঝঙ্কার তুলে সুমিত্রা বললেন, সাজগোজ পছন্দ করিনে, আর লুকিয়ে লুকিয়ে পুরুষের সঙ্গে চিঠি চালাচালি বুঝি আমার খুব পছন্দসই? ন্যাকামি আর ক'রোনা, সুধীরা! ছ'মাস এখনো হয়নি, এর মধ্যে বিজনকে নিয়ে তুমি এই কেলেঙ্কারীটা করলে। তুমি জানো, বিজন ইঞ্জিনীয়রের চাকরিটা নিয়ে এই মোরাদাবাদে এসেছিল আমারই সাহায্যে? চাকরির সন্ধান আমিই তাহাকে দিয়েছিলুম?

সুধীরা একবার মুখ তুলে আবার নামিয়ে নিল। কিন্তু ওই একটি মুহূর্তেই সে দেখে নিল, সুমিত্রার হিংস্র চক্ষু দপ দপ ক'রে জ্বলছে। উত্তর প্রত্যুত্তর করতে তার সাহস হলো না।

—আমার সমস্ত বিশ্বাস তোমরা নষ্ট ক'রে দিয়েছ—সুমিত্রা বলতে লাগলেন, এই দূর দেশে তোমাকে কেউ দেখবার নেই, মা বাপ মরা মেয়ে তুমি, টাকা পয়সার জোর নেই, এখনও একটাও পাশ করোনি, একজনের আশ্রয়ে আশ্রিত,—কিন্তু তুমি আমার সব বিশ্বাস নষ্ট করলে। এজন্যই কি বিজনের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলুম? স্বাধীনতা পেয়েছিলে ব'লেই কি উচ্ছৃঙ্খল হ'তে হবে? তোমাদের দু'জনের চিঠিই আমি রেখে দিলুম, কিন্তু এই শেষবার জানিয়ে দিচ্ছি আমার কাছে এসব চলবে না। এই ব'লে তিনি ছোট ছাতাটা হাতে নিয়ে পায়ে জুতোটা পরলেন। আর তাঁর অপেক্ষা করার সময় নেই, ইস্কুলের বেলা হয়ে গেছে।

সুধীরা উঠে এলো, এবং তাঁর পায়ের কাছে হেঁট হয়ে হাত বাড়াতেই সুমিত্রা একটু স'রে গেলেন। বললেন, থাক্, জুতোর ফিতে আজ থেকে আমিই বেঁধে নিতে পারবো। এ দিয়ে আমার মন আর ভোলাতে চেয়ো না, সুধীরা।

জুতোর ফিতেটা বেঁধে নিয়ে তিনি ঘর থেকে মস মস ক'রে বেরিয়ে গেলেন। সুধীরা ভীতদৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে রইলো। তিনি বি-এ, বি-টি, তিনি সুন্দরী—অহঙ্কার তাঁকে অলঙ্কারের মতই মানায়। নিজের জীবনকে তিনি নিজের হাতেই গড়েছেন। পরাশ্রিতা, মুখ-চাওয়া মেয়ে তিনি নন্। তাঁর পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাওয়া পর্য্যন্ত সুধীরা চেয়ে রইলো।

বাইরে এসে তিনি সোনার ছোট হাত ঘড়িতে দেখলেন, দশটা বেজে পঁচিশ। হাতে সময় নেই, যেতেও হবে অনেকটা পথ। গাড়ী এসেছিল একটু আগে, কিন্তু তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন। রাগে তখনও তাঁর শরীর কাঁপছে বটে, কিন্তু মেয়েটাকে তিরস্কার ক'রে প্রাণের মধ্যে যেন একটা অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। সম্মুখে পথের দিকে বহুদূরে ধূলিধূসর মাঠ, সেখানে ছায়াহীন রৌদ্র যেন তাঁরই জীবনের মতো ধুধু করছে।

মাঠের পারে কবেকার কোন্ নবাবী আমলের একটা প্রাসাদের শেষ ভগ্নাবশেষ। সেইদিকে চেয়ে তিনি মনে মনে হিসাব করলেন, সুধীরার আঠারো, আর তাঁর প্রায় একত্রিশ অর্থাৎ তেরো বছর বয়সে তাঁর সন্তান হ'লে সে হোতা সুধীরার মতো। তাঁর যৌবনকাল প্রায় অন্তিমে এসে দাঁড়িয়েছে। এখন কথায় কথায় তাঁর বুকের ভেতরটায় একটি বাৎসল্যের কণ্ঠক টনটন করে, অনেক সময় তাঁর স্নেহের দৃষ্টি কেমন যেন নত হয়ে চলে।

ধীরে ধীরে তিনি পথে চলতে লাগলেন। সুধীরার মুখখানাও যেন তাঁকে অনুসরণ ক'রে চলছে। মেয়েটা অবশ্যই এতক্ষণে কাঁদতে বসেছে। আজ ছ'মাস ধ'রে তাঁর প্রতি এই মেয়েটির সেবার অন্ত নেই। তাঁকে গল্প প'ড়ে শোনানো, মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দেওয়া, তাঁর টেবল্ গুছিয়ে রাখা, কাপড় জামার তদ্বির করা, মনের মতো আহার সামগ্রীর ব্যবস্থা করা, রাত্রে তাঁর পায়ের সেবা ক'রে ঘুম পাড়ানো—মেয়েটা যেন তাঁর গায়ের পোকা। অন্যায় সে অবশ্যই করেছে ; তবে যুবতী মেয়ের কাছে প্রণয়লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে, এও ত' নিত্যনৈমিত্তিক। ছেলেমেয়ের মধ্যে ভালবাসা, এতে ত'

পৃথিবীর সর্ব্বনাশ হয়নি, সমাজও উচ্ছন্নে যায়নি! তবে কি এই অশান্তি কেবল তাঁরই মনে মনে?

দূরে একটা শুক্‌নো বিলের বাঁক পেরিয়ে যে-এক্কা গাড়ীটি দেখা গিয়েছিল, মাঠের পথ অতিক্রম ক'রে সেটি যে তাঁরই কাছাকাছি এসে পড়েছে, এতক্ষণ তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন নি। গাড়ীখানা তাঁর পাশ দিয়ে যাবার সময় থমকে দাঁড়ালো।

—আপনার যে আজ এত বেলা হোলো, মিস্ বোস?

সুমিত্রা মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। মাথার টুপিটা খুলে বিজন পুনরায় বললে, আজ হেঁটে কেন?

সুমিত্রা বললেন, হাঁটতে বেশ লাগছে।

মিছে কথা—বিজন হাসিমুখে বললে, দুই পায়ে ধূলো মেখে কোন হেড-মিষ্ট্রেসেরই এত রোদে হাঁটতে ভালো লাগে না। আসুন, আপনাকে মাথায় ক'রে পৌঁছে দিয়ে আসি।

মুসলমান এক্কাওয়ালা বাঙ্গালা ভাষা বোঝে না, তাই রক্ষে। সুমিত্রা একবার এদিক ওদিক তাকালেন। তার হাসিমুখে বললেন, আজ আমার মন ভোলাবার এত চেষ্টা কেন? ফন্দীটা কিসের শুনি?

হো-হো ক'রে বিজন মাঠ-ঘাট কাঁপিয়ে হেসে উঠলো। বললে, পাণ্ডাকে খুশি না রাখলে ঠাকুর দর্শন হয় না যে।

সুমিত্রার মুখের হাসিটা মিলিয়ে আসতে লাগলো। কিন্তু তার শেষ রেশটুকু অতি কষ্টে রৌদ্রক্লিষ্ট মুখখানার উপরে জাগিয়ে রেখে তিনি বললেন, আপনার গাড়ীতে আমাকে ইস্কুলে পৌঁছে দিন।

আসুন আসুন, আমার সৌভাগ্য।

কিন্তু উঠবো কি ক'রে?

আমার হাত ধ'রে?

সুমিত্রা হেসে বললেন, ফেলে দেবেন্ না ত'?

ইঙ্গিতটা তৎক্ষণাৎ বুঝে নিয়ে বিজন বললে, ধরতে জানলে পড়বেন না, ভয় নেই।

এক্কাগাড়ী চ'ড়ে বিজনের মতো ছেলের সঙ্গে ইস্কুলে গিয়ে পৌঁছনয় একটু চক্ষুলজ্জা আছে বৈ কি! গাড়ীতে চ'ড়ে বসবার পর সুমিত্রার এই কথাটা মনে হলো! কিন্তু গাড়ী ছুটতেই লাগলো, তাঁর সঙ্কোচের

কথা বলাই হলো না। কিছুদূর দিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, কোথায় যাচ্ছিলেন এদিকে ?

একটু বেড়াতে বেরিয়েছিলুম। পশ্চিমের মাঠের রোদটা বেশ লাগে। দিল্লী থেকে একটা সিনেমাপার্টি এসেছে, তারা ছাউনি বাঁধবে কোথায় তাই দেখতে যাচ্ছিলুম।

সুমিত্রা বললেন, এত বানিয়েও বলতে পারেন আপনারা।

বিজন একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললে, কেন ?

ধমক দিয়ে সুমিত্রা বললেন, আপনি যাচ্ছিলেন আমার ওখানে। আপনি জানতেন এই সময় আমি থাকিনে।

বিজন চুপ ক'রে গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে বললে, হয়ত আসবার সময় সুধীরার সঙ্গে দেখা ক'রে আসতুম। কিন্তু আপনি আজকাল বড্ড বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছেন।

বাড়াবাড়ি আপনারা করছেন না ?

বিজন বললে, না, সুধীরাকে আমি একটু ভালোবেসেছি এইমাত্র।

কণ্ঠে একঝলক উত্তাপ ক'রে সুমিত্রা বললেন, এটা যে লজ্জা আর কলঙ্কের কথা তা আপনি স্বীকার করেন ?

না, মিস্ বোস।

ও। ব'লে সুমিত্রা চুপ ক'রে গেলেন। গাড়ী উঁচু-নিচু পথে হেলে-দুলে ছুটে চলছিল। যে পথটা চৌক-এর দিকে গেছে, সেই দিকে গাড়ী বাঁক নিতেই তিনি নিশ্বাস ফেলে ব'লে উঠলেন, থাক, আজ স্কুলে আমি যাবো না।

বিজন মুখ ফিরিয়ে বললে, যাবেন না ? তাহ'লে ?

গাড়ীতেই থাকবো কিছুক্ষণ। অন্য পথে চলুন।

সে কি ? কোথায় যেতে চান্ ?

রাগ ক'রে সুমিত্রা বললেন, চুলোয়।

বিজন এক্কাকে আবার মাঠের পথের দিকে চালিয়ে নিয়ে যেতে নির্দ্দেশ দিলে। পরে হেসে বললে, চুলোয় নিয়ে যেতে পারি সুধীরাকে, আপনাকে নয়।

সুমিত্রা বললেন, আচ্ছা, পুরুষ মানুষেরা কি বুড়ো হয় না ? তিরিশ বছরেও তারা ছেলে মানুষ থাকে ?

হাসিমুখে বিজন বললে, যারা বারোয় পাকে তারা বত্রিসে বুড়ো হয়, আর যারা পঁচিশে পাকে তারা বুড়ো হয় পঞ্চাশে।

আপনি কেন চিঠি লিখেছেন সুধীরাকে ?

চিঠি লিখিনি, লিখেছি প্রেমপত্র।

লজ্জা করে না আপনার ?

আপনার কাছে আবার লজ্জা কিসের ?

সুমিত্রা বলবেন, আপনি জানেন যে, আপনাকে আমি বিশ্বাস করিনে।

বিজন বললে, খুবই স্বাভাবিক। লেখা-পড়া শিখলে বুড়ি কুমারীরা পুরুষকে ঘৃণা করতে শেখে।

সুধীরা আমার আশ্রিত, সেকথাও আপনি মনে রাখবেন।

সেজন্য আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

কৃতজ্ঞ ? অনেক কথা আজকাল বলতে শিখেছেন। কেমন ? বেশ, আমার বাড়ীতে আপনি আর কোনোদিন যাবেন না।—ব'লে সুমিত্রা মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তাঁর সর্ব্বশরীর ভীষণ উত্তেজনায় কাঁপছিল। তিনি কঠোর ভাবে চোখের জল চেপে রইলেন। এমন অপমানজনক কথা তিনি কোনোদিন কারোকে বলেন নি।

পকেট থেকে একটা সিগারেট বার ক'রে বিজন ধরালো। বা'র দুই জোরে টান্ দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললে, কি বললেন ?

সুমিত্রা উত্তর দিলেন না। গাড়ীখানা ছুটতে ছুটতেই চলতে লাগলো। অনেকদূর গিয়ে পকেট থেকে একটি চকোলেট বার করে বিজন মুখে পুরলো। তারপর সিগারেটে আর একটা টান্ দিয়ে বললে, বেশ, মনে রাখবো। এই কথা মনে রাখবো যে আপনি নিষেধ করেছেন আপনার বাড়ী যেতে।

সুমিত্রা বললেন, না, সেকথা আমি বলিনি। আমি বলেছি, সুধীরার সঙ্গে আপনার এই সম্পর্ক আমি স্বীকার করব না।

হেতু ?

এটা অন্যায়, এটা অসম্ভব।

হেতু ?

সুমিত্রা বললেন, কুমারী মেয়ের মন ভুল পথে গেলে তার জীবনে আর কোনো উন্নতি হয় না।

বিজন প্রশ্ন করলে, এই আপনার ধারণা ?

এই আমার বিশ্বাস।

ও। আপনি কি উন্নতি করেছেন শুনি ?

উত্তরটা সুমিত্রার মুখে থতিয়ে গেল। পথের ধারে ধূলিধূসর ফণীমনসা আর বাব্‌লার সারির দিকে চেয়ে নিজের জীবনের চেহারাটা তাঁর নিজের কাছেই খুব স্পষ্ট মনে হোলো না। মাসে মাসে প্রায় দেড়শো টাকা তিনি এই প্রবাস-জীবন থেকে উপার্জ্জন করেন। ব্যাঙ্কে এরই মধ্যে তিনি হাজার পাঁচেক টাকা জমিয়েছেন। অলঙ্কার কিছু আছে। এসব ছাড়া চাকরানী দাই, গৃহসজ্জা, নাম ডাক, রং-বেরঙের কয়েকখানা শাড়ী, কয়েকজোড়া জুতো, দামী একটা গ্রামোফোন,—এবং বি-এ, বি-টি উপাধি। সমস্ত মিলিয়ে দেখলে উন্নতি তাঁর কম নয়। কিন্তু তবু বিজনের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে এই সব নানাবিধ ঐশ্বর্য্যের বিশেষ কোনো অর্থ পাওয়া গেল না, এই প্রিয়দর্শন যুবকের কণ্ঠের প্রচ্ছন্ন পরিহাসের কাছে তাঁর সমস্ত সম্পদ একটি মুহূর্ত্তেই যেন ম্লান হয়ে এলো। উত্তর দিতে তাঁর সাহস হলো না।

অনেকক্ষণ পরে হেসে বিজন বললে, অবশ্য আপনার বাড়ীতে আর বোধ হয় আমাকে যেতেও হবেনা—কারণ—

স্তব্ধ হয়ে সুমিত্রা চলন্ত গাড়ীর একটা খুঁটি ধ'রে ব'সে ছিলেন। সিগারেটের শেষ অংশটা ফেলে দিয়ে বিজন বললে, আসামের এক ওয়াটার ওয়ার্কসে বড় চাকরির জন্যে একটা দরখাস্ত করেছিলুম, তারা ডেকেছে। ছুটি নিয়ে আমি কল্‌কাতায় যাচ্ছি।

চকিত দৃষ্টিতে সুমিত্রা তার দিকে তাকালেন। উদ্বেগ চাপতে পারলেন না, ভীত চক্ষে চাপাস্বরে বললেন, কবে ?

আজ রাত্রেই যাবার ইচ্ছে।—এই যে, আপনার বাড়ীর কাছাকাছি এসে পড়েছি, এবার নামুন।

গাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে চলুন, আমি নামবো না—এই বলে সুমিত্রা দৃঢ় হয়ে চেপে ব'সে রইলেন। সুতরাং গাড়ী আবার চললো অন্য পথে। উপরের বারান্দায় সুধীরা যদি দাঁড়িয়ে থাকে, তবে তাদের নিশ্চয় দেখেছে। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করার সময় সুমিত্রার ছিল না।

আজ রাত্রে আপনি কল্‌কাতায় যাবেন, কই আগে বলেননি কেন ?

বিজন বললে, সুধীরা আপনাকে বলেননি ?

সুধীরা!—সুমিত্রা বললেন, সুধীরা অনুগ্রহ ক'রে আমাকে আপনার সংবাদ দেবে আর তাই আমাকে শুনতে হবে?

পরিষ্কার সহজ গলায় বিজন বললে, তাঁকেও যে নিয়ে যাবো আমার সঙ্গে।

কি বললেন?

শ্রীমতী সুধীরা দেবী আমার সহযাত্রী হবেন।

এ কথা কে বলেছে আপনাকে?

বিজন বললে, আমিই বলেছি, আমারই ব্যবস্থা।

আমি যদি যেতে না দিই?—সুমিত্রা বললেন।

যেতে না দিলে সাবালক এবং সাবালিকা নিজেদের পায়ে হেঁটেই যাবে। প্রয়োজন হ'লে মহামান্য রাজসরকার বাহাদুর সাহায্য করবেন।

সুমিত্রা হাঁক দিলেন, এই গাড়োয়ান, এক্কা ঘুমালেও?

এক্কা থামলো। বিজন বললে, বাড়ী যেতে চান?

হ্যাঁ।

গাড়ী ঘুরে আবার বাসার দিকে চললো। সুমিত্রা কঠোর কণ্ঠে বললেন, আমি আপনার সামনেই সুধীরাকে জিজ্ঞেস করব, সে আমাকে এমন অপযশের মধ্যে ডুবিয়ে যাচ্ছে কেন।

বিজন বললে, সে কাঁদবে কিন্তু আপনার প্রশ্নের জবাব দেবে না।

তিক্তকণ্ঠে সুমিত্রা বললেন, মেয়েমানুষের কান্না! তাদের কান্নার পেছনেও থাকে হীন ষড়যন্ত্র। চোখে তাঁরও জল আসতে চাইলো, কিন্তু তিনি দমন করলেন।

বিজন বললে, ষড়যন্ত্র একা হয় না মিস্ বোস, আমিও তার মধ্যে আছি।

যে জ্বালাটা সুমিত্রা এতক্ষণ চেপে ছিলেন, সেটি এবার ফস করে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। মুখের একটা শব্দ করে বললেন, যেমন তার কদাকার রূপ, তেমনি আপনার কদর্য্য রুচি।

বিজন হো হো শব্দে হেসে উঠলো। গাড়ী এসে সুমিত্রার বাসার কাছে দাঁড়ালো। দুজনে নেমে এলেন। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বিজন বললে, ভেতরে আমি যাবো না, এই গাড়ীতেই আমাকে ফিরে যেতে হবে। আপনি সুধীরাকে ডাকুন এইখানে।

করুণ চক্ষে চেয়ে সুমিত্রা বললেন, যাবার দিনে আমাকে এইভাবে অপমান করে যেতে চান?

অপমান ত' করিনি, আপনার নিষেধ অনুসারেই আপনার বাড়ীতে ঢুকবো না।

কিন্তু এই বাক্‌বিতণ্ডার মধ্যে নিরুপায় মেয়েমানুষ কখন যে আপন অবচেতনাতেই নিজের পথটা খুঁজে নিয়েছে তা বলা কঠিন। এই যৌবন-প্রান্তবর্ত্তিনী নারী সহসা আপনার সমস্ত অহমিকা ভুলে গিয়ে সহসা কাছে এসে স্খলিতকণ্ঠে বললে, গাড়োয়ানের সামনে আমাকে পায়ে ধরাবেন?

বিজন একবার তাঁর মুখের দিকে তাকালো, তারপর এগিয়ে গিয়ে গাড়োয়ানকে একটা টাকা দিয়ে বিদায় করে এসে বললে, চলুন।

বেলা মধ্যাহ্নে উত্তীর্ণ। সুধীরার কোনো সাড়াশব্দই নেই। চাকরাণী চলে গেছে, দাই বোধ করি কোথায় ঘুমিয়ে আছে। এই হিন্দুস্থানী প্ল্যানের বাসার নীচের পথটা অন্ধকার। সেই যাতায়াতের পথটা দিয়ে পার হবার সময় সুমিত্রা সহসা বিজনের হাতখানা ধরলেন।

বললেন, কেন ছেলেমানুষী করছেন? আমি নিয়ে যেতে দেবো না সুধীরাকে।

বিজন বললে, সত্যি বল্‌ব আপনাকে? ওঁকে না নিয়ে গেলেই আমার চলবে না।

আমি যদি সমস্ত বাঙ্গালীদের জড়ো করে আপনার এই অনাচারের কথা বলি?

তাতে কি আপনার নিজের কথাও ঢাকা থাকবে?

কি বলছেন?

বিজন বললে, এত অত্যাচার আপনি এই কয়মাস ধরে আরম্ভ করেছেন যে, এর একমাত্র জবাব সুধীরাকে এখান থেকে জোর করে নিয়ে যাওয়া। মিস্ বোস, আমার প্রতি আপনার যত স্নেহই থাকুক, আপনি বিকৃত আদর্শের দোহাই দিয়ে বহু মেয়ের জীবন নষ্ট করেছেন।

চাপাগলায় সুমিত্রা বললেন, তার মানে?

তার মানে, তথাকথিত স্বাধীনতার নাম করে আপনি মেয়েদের স্বভাবধর্ম্ম বিষাক্ত করতে চান। আপনার কাছে থেকে তারা সংযম শেখে বটে কিন্তু সৎশিক্ষা হারায়।

সুমিত্রার গলা কেঁপে উঠলো। বললে, সব আমি মানলুম, কিন্তু আপনি চলে যাবেন কেন দেশ ছেড়ে?

উত্তেজিত হয়ে বিজন বললে, আপনার নাগপাশ থেকে আমি মুক্তি পেতে চাই, সুধীরাকেও বাঁচাতে চাই।

কম্পিত অধীর কণ্ঠে সুমিত্রা বললেন, ভগবান যাকে কোনো কিছুই দেননি তার কাছে আপনি এমন কী ঐশ্বর্য্য পেলেন যাকে নিয়ে সব ছেড়ে যেতেও আপনি প্রস্তুত?

পুরুষ না হলে সেকথা বলা যায় না, মিস্ বোস।

এ বাড়ীতে কি আপনার জন্যে কিছুই ছিল না? সুধীরা আপনার কে? সুমিত্রার রুদ্ধ কণ্ঠস্বর কণ্ঠনালীর মধ্যে বদ্ধ হয়ে এলো।

বিজন একটু থেমে বললে, উনি যেই হোন, আর যেমনই হোন, আমি ওঁকে বিয়ে করব। বিদেশে যাবার সময় উনি আমার সঙ্গে যাবেন। আপনি যদি না ছেড়ে দেন, জোর করে নিয়ে যাবো। এই আমার শেষ কথা।

কিন্তু এর পরেও যে কথা ছিল তা বিজন ভেবে দেখেনি। ভগবান যাকে কিছু দেননি সে অনেক সময় ঐশ্বর্য্য পায় বটে, কিন্তু সব থেকেও যার কিছু নেই, সে আশ্রয় পাবে কোন আঘাটায়? পুরুষের বিচার কি তাদের পরে এতই অকরুণ?

চোখের জলে চারিদিক অন্ধকার হয়ে এসেছিল। সহসা সেই গলিপথের ধারে নিরুপায় সেই বি-এ, বি-টি হেডমিস্ট্রেস বিজনের পায়ের কাছে বসে পড়ে ভগ্নকণ্ঠে বললেন, তোমরা নিজেদের কথাই ভাবলে, কিন্তু আমি যাবো কোথায়? তুমি যা খুশি তাই করো, বাধা দেবো না। কেবল আমাকে তোমাদের আশ্রয়ে থাকতে দাও।

বিজন স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়ালো, তারপর চারিদিক একবার চেয়ে সস্নেহে তাঁকে তুলে ধরে বললে, আচ্ছা, কথা দিলুম, কোথাও যাবো না।

সেই পুরাতন

যতদুর মনে পড়ছে হরিপদর অবস্থা প্রথম দিকে একটু ভালোই ছিল। লোহার কারখানায় যারা চাকরি করে, দিন-মজুরিই তাদের সম্বল—কিন্তু হরিপদ ওদের মধ্যে টাকাকড়ি কিছু জমিয়ে অনেকটা সুযোগ সুবিধে ক'রে নিয়েছিল বৈকি।

লোহার কারখানায় ইলেকট্রিক যন্ত্রের চক্রান্ত নিয়ে কালিঝুলি মেখে যার দিন কাটে—সে একটু নেশা ভাঙ করে—এটা এমন কিছু অপরাধ নয়। কিন্তু হরিপদ যেদিন হঠাৎ বিয়ে ক'রে বসলো সেদিন সবাই একেবারে অবাক। বিয়ে ক'রে ঘর চালাবার ক্ষমতা হয়ত তার ছিল,—কিন্তু এমন সুশ্রী আর লেখাপড়া জানা পাত্রী সে কোথা থেকে নিয়ে এলো, এই ছিল সকলের কাছেই বিস্ময়। অনেকে তামাসা ক'রে বললে, এমন ষণ্ডামার্কা চেহারা তোর—মেয়েটাকে চুরি ক'রে আনিসনি ত' রে ?

হরিপদ অহঙ্কার প্রকাশ ক'রে বললে, সাতপাক ঘুরে মালাটি বদলে তবে ঘরে এনেছি বাবা—হেঁ হেঁ—

তোকে মেয়ে দিল ? মেয়েটির গলায় দড়ি জুটলো না ?

হরিপদ বললে, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা! আমি ত' একটা পুরুষ বটে,—কারো চেয়ে কম নই, মনে রেখো।

স্ত্রী সুশ্রী আর লেখাপড়া জানা—কারখানার সামান্য মজুরের পক্ষে এমন কবে কা'র ঘটেছে ? প্রায়ই ছুটির দিনে দেখা যায় তেলকালি মাখা হরিপদ হঠাৎ যেন মন্ত্রবলে নব কলেবর ধারণ করেছে। পরনে তার ফিনফিনে ধুতি, গায়ে আদ্ধির পাঞ্জাবী, পায়ে চক্‌চকে নতুন জুতো, মাথায় ফুলেল তেলের গন্ধ—হরিপদ স্ত্রীকে নিয়ে মধ্যে মাঝে কার্নিভ্যালেও যায়, এবং সেখানে চার আনা আট আনা জুয়া খেলেও সগৌরবে স্ত্রীকে নিয়ে বেড়িয়ে ফিরে আসে। বন্ধুরা ঈর্ষ্যান্বিত হয়ে হরিপদর দিকে চেয়ে থাকে। হরিপদর জীবন-নদীতে যেন জোয়ার এসেছে। কেউ কেউ বললে, বেশ, খুব ভালো হরিপদ, তুই সংসারী হলি, তোর বদখেয়ালগুলো কমলো—এ তোর বউয়ের গুণ, বউ তোর সাক্ষাৎ লক্ষ্মী! অনেক ভাগ্যি তোর।

হরিপদ বললে, যেমন তেমন মেয়ে বিয়ে করিনি, বুঝলি—বাপের এক মেয়ে, হাতে মোটা টাকা আছে।

কিছুকাল চ'লে গেল। দেখা যাচ্ছে হরিপদর পোষাক-আসাকে আর তেমন জেল্লা নেই। তার মেজাজটাও কিছু রুক্ষ। অনেকে বুঝে নিল, হরিপদ এতদিনে মোটামুটি টাকা জমিয়েছে, নৈলে পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে এমন কৃপণ হোলো সে কেন? আর তা-ছাড়া লোকটার হাতে টাকা হয়েছে বলেই মেজাজটা এত গরম।

কিন্তু আসল ব্যাপারটা অন্যরূপ। হরিপদর পক্ষে বিয়ে করাটা বরং সইলো, কিন্তু সংসারী হওয়াটা সইচে না। বিয়ের প্রথম দিকটা কাটলো নেশায়—কারণ স্ত্রীলোকের স্নেহের আস্বাদটা তার পক্ষে নতুন। কিন্তু এর পিছনে সাংসারিক দায়িত্ব আর কর্তব্যের চেহারাটা দেখে তার মন বিগড়ে গেল। হরিপদ ভাবলো, ভালো রে ভালো, দিব্যি নেশা ক'রে জুয়া খেলে, হাতুড়ি পিটে আর কল ঘুরিয়ে আমার সুখের জীবন কাটছিল, এ আবার কোন্ নতুন উৎপাত এসে জুটলো? এ আমি বরদাস্ত করতে পারবো না।

তার স্ত্রী সুহাসিনী কোমল প্রকৃতির মেয়ে। হরিপদর চেয়ে যোগ্যপাত্রের হাতে সে পড়তে পারতো, কিন্তু এ-নিয়ে তার কোনো ক্ষোভ নেই, সে আপনাতে আপনি পরিতৃপ্ত। হরিপদ বললে, আমরা বন্ধুবান্ধব মিলে বাগানে যাবো, টাকা দাও। সুহাসিনী তখনই টাকা বা'র ক'রে দেয়। হরিপদ বললে, আজ ভালো রেস্ আছে, টাকা দাও। সুহাসিনী তখনই হাতের একগাছা বালা খুলে দিয়ে বললে, নগদ টাকা ত' নেই, বালা বাঁধা দিয়ে টাকা নাওগে।

সুহাসিনী কোনো দিন স্বামীর উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিবাদ করে নি। জানে প্রতিবাদ মিথ্যে। দুরন্ত পুরুষ প্রবৃত্তির তাড়নায় যখন ছোটে তখন বাধা দিতে গেলে নিজেকে চূর্ণ হ'তে হয়। সুহাসিনী কেবল স্বামীর মঙ্গল কামনা করে। মনে মনে বলে স্বামী যেমনই হোক, তা'র নিজের ভালোবাসা মিথ্যে নয়,—ভগবান যেন তাকে কোনো দিন তেমন সংশয়ের মধ্যে না ফেলেন।

তাদের বিয়ের বছর-দুই পরে একটি ছেলে হোলো এবং সেই ছেলে সম্প্রতি একটু বড়ও হয়েছে। হরিপদ তা'র পুরনো দারিদ্র্যের মধ্যে ফিরে এসেছে। দু'বেলা ভাত অবিশ্যি জোটে, কিন্তু তার আনুষঙ্গিক উপকরণ

জোটে না। পরনে তার সেই ছেঁড়া হাফপ্যান্ট, গায়ে হাতকাটা ময়লা শার্ট। কাজ করে সে অক্লান্ত, মজুরী তথৈবচ। নেশাটা বরাবরই আছে, তা'র সঙ্গে আরো কিছু আপত্তিজনক গতিবিধি। এদিকে সুহাসিনীর স্বাস্থ্য ভেঙেছে, গায়ে একটি অলঙ্কারও নেই, একটি পরিচ্ছন্ন জামার অভাব—ছোট ছেলেটার দুধের পয়সা জোটে না। হরিপদ মাঝে মাঝে আসে, সুহাসিনীর প্রতি জুলুম করে, হাতের কাছে যা পায়—বাইরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে' সেই পয়সায় ঘোড়দৌড়ের বাজী খেলে আসে। প্লেসের ঘোড়া উইন্‌-এ ধরে, এবং সর্বস্বান্ত হয়ে আবার বন্ধুদের নেশার খোঁয়াড়ে গিয়ে ঢোকে। বন্ধুরা বলে, চক্‌চকে বউ পেয়ে ক'দিনের জন্যে নবাবী করতে গেলি, আবার সেই পুরনো জীবনে ফিরতে হোলো ত'? ওরে ভাই, আমরা জন্মেছি পাপ করার জন্যে, ওসব কি আমাদের সয়?

ঠিক বলেছিস।—ব'লে হরিপদ আবার ময়লা তাস ভাঁজতে থাকে।

কিন্তু দেখতে দেখতে হরিপদ আরো নীচের দিকে নেমে গেল। সুহাসিনী তা'র হাতে অহেতুক অপমান আর উৎপীড়ন সইতে লাগলো, কিন্তু একদিনও প্রতিবাদ করলো না। ছেলেটাও বড় হ'তে লাগলো—অনাচার, নিষ্ঠুরতা, অশিক্ষা আর দারিদ্র্যের ভিতরে। এদিকে হরিপদর বর্বরতা রাশ খুলে হৃদয়হীন উন্মাদনায় চারিদিকে দাপাদাপি ক'রে বেড়াতে লাগলো।

এমনি ক'রে পরিণামে যা ঘটলো তা খুবই সাধারণ। আত্মবিস্মৃত হরিপদ একদিন কারখানা থেকে বিতাড়িত হয়ে ফিরে এলো। কিছুক্ষণ মাথায় হাত দিয়ে ব'সে থেকে সহসা সে রক্তচক্ষে উঠে দাঁড়িয়ে স্ত্রীকে বললে, লোকে বলে তুই লক্ষীমন্ত বউ? মিছে কথা। তোর জন্যেই আমার যত সর্বনাশ। বেরো তুই বাড়ি থেকে। দূর হ—

সেদিন ছেলেটার হাত ধ'রে সুহাসিনীকে পথে নামতে হোলো। হৃদয়হীন স্বামীকে সে ধিক্কার দিল না, চোখের জল ফেলেও একথা বললে না, এ অন্যায়, এ পাপ! নিরুপায় নারী কেবল মনে মনে ভাগ্যদেবতাকে প্রণাম জানিয়ে পথের একদিকে চলতে লাগলো।

হরিপদ তার স্ত্রী ও পুত্রের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে, কিছুই অন্যায় করিনি। ওরা না বিদেয় হ'লে আমার কোনো উন্নতি নেই। এবার বাঁচলুম।—এই ব'লে সে অবারিত উচ্ছৃঙ্খলতায় আবার ফিরে গেল।

মাঝে মাঝে একটি অবোধ বালকের ক্ষুধার্ত একখানি মুখ স্মরণ ক'রে সে অস্বস্তি বোধ করতো বটে, কিন্তু তাও একদিন ঝাপ্‌সা হয়ে এলো!

ভালো মিস্ত্রি হিসেবে হরিপদর খ্যাতি ছিল, সুতরাং বরাতক্রমে হঠাৎ তার একটা ভালো কাজ জুটে গেল। মাইনেটা আগের চেয়ে বেশী এবং সেজন্যে হরিপদর উল্লাস আর ধরে না। সংসারের দায়িত্ব আর নেই, স্ত্রী পুত্রকে খাওয়াতে হয় না—অতএব সমস্ত টাকাটা সে অবাধে খরচ করতে পায়। সুহাসিনী অথবা তা'র ছেলের কোনো খোঁজ খবর নেবার প্রয়োজন সে মনেই করে না, মাতা পুত্র এই পৃথিবীর বিরাট লোকযাত্রার ভিতরে কোথায় তলিয়ে গেছে,—কোনো সন্ধান তা'র নেই। সেই অলক্ষণা বৌ আর অভিশপ্ত পুত্রের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে হরিপদ এ যাত্রা বেঁচে গেল বৈ কি!

এরপর অনেক বছর কেটে গেছে।

সুহাসিনী তার ছেলেটিকে মানুষ ক'রে তোলার জন্য আত্মীয়পরিজন ও পরিচিত মহলের ঘাটে ঘাটে ঘুরে বেড়িয়েছে। কেঁদেছে সে অনেক, দুঃখ পেয়েছে তার চেয়েও বেশী—কিন্তু তবু তা'র সিঁথির সিন্দুরটি উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। ঠাকুর দেবতার মন্দিরে মানৎ করেছে, ভিক্ষে ক'রে ছেলের মুখে অন্ন জুটিয়েছে—কিন্তু এ-কথা বলেনি, জীবনটা তার এবারের মতো ব্যর্থ হয়ে গেল। বরং তা'র বিশ্বাস দুঃখটা নাকি তার সার্থক হয়েছে ছেলেটাকে মানুষ ক'রে তোলার কঠোর তপস্যায়। এমন অদ্ভুত মনোভাব কেবল হিন্দুনারীর পক্ষেই বোধ হয় সম্ভব।

কিন্তু এমনি তপস্যায় ক্রমে ক্রমে সুহাসিনীর অকাল বার্ধক্য দেখা দিল! কূলকিনারা নেই কোনো দিকে—তখন সে উপার্জনের পথ ভাবতে লাগলো। অসীম ধৈর্য আর অধ্যবসায়ের গুণে সে সেলাই আর ডিজাইনের কাজ আরম্ভ ক'রে দিল। বাঙলা দেশের বাইরে কাশী শহরের এক সঙ্কীর্ণ গলির ভিতরে একখানি ঘর নিয়ে সুহাসিনী কোনো মতে চলতে লাগলো। ছেলেটার বয়স তখন পনেরো!

মায়ের সে খুবই বাধ্য, লেখাপড়াও কিছু কিছু শিখেছে। কিন্তু পৈতৃক প্রবৃত্তিটা সে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিল। জুয়া খেলতো সে লুকিয়ে, রানিং ফ্লাস খেলতো গোপন সুড়ঙ্গ পথে বন্ধুদের আড্ডায়। বাজি ধরতো সে খুব

ভালো, যেন সে জন্ম থেকেই জয়তিলক প'রে এসেছিল কপালে। এক একদিন দুই পকেট তা'র ভরে যেতো টাকা পয়সায়। আড্ডার পর রাত্রে ঘরে ফিরে দেখতো, টিমটিমে আলো জ্বেলে তা'র মা জানলার ধারে ব'সে একমনে মহাভারত পড়ছে। চাঁদের আলো হয়ত এসে পড়েছে মায়ের কপালে, এবং অদূরবর্তী গঙ্গার হাওয়ায় রুক্ষ চুলগুলি উড়ছে। তার মনে হোতো, মা যেন তা'র ঋষিকন্যা! সে অপরাধীর মতন অন্যত্র চ'লে যেতো। মায়ের কাছে সে অন্যায় উপার্জনের কথা বলতে সাহস করতো না।

সহসা একদিন রাত্রে অন্ধকার গলির পথে ছেলের আর্তনাদ শুনে সুহাসিনী আঁৎকে উঠলো। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখলো, দরজার ধারে তা'র ছেলে প'ড়ে গোঁ গোঁ করছে—সর্বাঙ্গ দিয়ে তা'র রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত ক'রে ছেলে একবার বলে উঠলো—মা, গুণ্ডারা আমার পিঠে ছুরি মেরেছে। আমি—আমি বোধ হয় বাঁচবো না।

সুহাসিনী ছেলেকে তুলে নিয়ে গেল ঘরে। ছুরির আঘাত তা'র পিঠের শিরদাঁড়া ভেদ ক'রে ভিতর অবধি চ'লে গেছে। প্রাণের আশা কম।

হতভাগিনী নারীর চোখে সেদিন জল এলো না। সমবেদনা জানাবার মানুষ নেই, চোখের জল কেন তা'র পড়বে? শীতকালের সেই ভয়াবহ দীর্ঘ রাত তা'র কাটলো, সকাল বেলায় ছুটলো সে হাঁসপাতালে খবর দিতে। উন্মাদিনীর মতন সে ছুটে চলেছে, এমন সময় সহসা তা'র চোখে পড়লো, একজন ব্যাধিগ্রস্ত কদাকার ব্যক্তি তা'র দিকে ব্যাকুল হয়ে চেয়ে রয়েছে। একখানা হাত তা'র কাটা। সুহাসিনী চিনলো, এ তা'র স্বামী—হরিপদ। ক্ষণকালের জন্য সুহাসিনী পাথরের পুতুলের মতন থমকে দাঁড়ালো।

সে আবার পা বাড়াবে এমন সময় হরিপদ এগিয়ে এসে বললে, বৌ, দাঁড়াও। আমি তোমাকে অনেক দিন ধ'রে খুঁজছি।

সুহাসিনী প্রথমটা শিউরে উঠেছিল। কিন্তু আগে কে কাঁদবে ঠিক বুঝা গেল না। সহসা হরিপদই ঝর ঝর ক'রে কেঁদে তা'র পায়ের কাছে ভেঙে পড়লো—বৌ, তুমি আমাকে ক্ষমা করো, তুমি ছাড়া আর আমার কেউ নেই।

হরিপদর কাটা হাতখানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে সুহাসিনী এবার আর নিজেকে সামলাতে পারলো না। হাউ হাউ ক'রে সে কেঁদে উঠলো। বললে, ওগো, শিগ্‌গির চলো, কালু বোধ হয় আর বাঁচবে না।

হরিপদ তাড়াতাড়ি চলতে পারে না, এক পা তা'র খোঁড়া। স্ত্রীর কাঁধের ওপর একখানা মাত্র হাতের ভর দিয়ে দুষ্ট ব্যাধিগ্রস্ত হরিপদ কোনমতে বাসায় এসে পৌছলো। কিন্তু এসে দেখলো, ইতিমধ্যে অশেষ যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত ক'রে তাদের ছেলেটির মৃত্যু ঘটেছে।

দুজনে স্তব্ধ ও নীরব। এক সময় হরিপদ ধরা গলায় ডাকলো, বৌ?

সুহাসিনী তা'র অসাড় মুখ তুললো স্বামীর দিকে।

হরিপদ বললে, কালু মরেছে আমার জন্যে। এ শাস্তি তোমার নয়, আমার। ছেলের রক্তে আমার সব পাপ যেন ধুয়ে যায়!

জড়িত কণ্ঠে সুহাসিনী মৃত সন্তানের দিকে চেয়ে বললে, এ কি আমি সইতে পারবো?

হরিপদ ধীরে ধীরে তাকে কাছে টেনে নিল। বললে, পারবে বৌ, নিশ্চয় পারবে—আমি জানি মরণকে তুমি জয় করবে, তুমি যে মহাশক্তি। চলো, আমরা অনেক দূরে অন্য কোথাও চ'লে যাই।

মৃদুকণ্ঠে সুহাসিনী কেবল বললে, তাই চলো।

ঝড়

গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যা হতে বিলম্বই হয়।

আকাশের একদিকে অস্তগত সূর্য্যের রক্তরশ্মি তখনও একেবারে মিলিয়ে যায়নি। কিন্তু তারই অপর দিকে ঈশানের পর্ব্বতপ্রমাণ কৃষ্ণকায় মেঘ যুদ্ধযাত্রার সেনাপতির মত সমস্ত আকাশের দিকে এগিয়ে আসছিল। আসন্ন ঝড়ের একটি ইঙ্গিত পেয়ে সবাই ইতিমধ্যে একটুখানি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে।

পুরাণদহের মাঠে কয়েকটা শুকনো খেজুরগাছ যেখানে একটা জটলা করেছে, তাদেরই মাথায় কালোমেঘের ছায়া পড়েছিল। পাতাগুলি দুলে' দুলে' ঝড়ের সূচনা জানাচ্ছে। তারপর দেখতে দেখতে ধূলো উড়তে সুরু করল, সাদা বকের সারি অন্ধকার মেঘের নীচে দিয়ে অস্পষ্ট ডানার শব্দ করে উড়ে যেতে লাগল, শীর্ণ-তনু নদীর ওপর নেমে এল ধীর-ছায়া। আভাস দেখে মনে হচ্ছে, ভয়ানক একটা ঝড় উঠতে আর হয়ত সত্যিই দেরী নেই।

পশ্চিমের লালিত্যটুকু নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যেতেই প্রসন্নকুমার তাড়াতাড়ি বাসার দিকে চল্‌তে লাগল। নতুন জায়গা, ঝড়ও উঠছে, বাসায় মলিনাও আছে একা—দেরী করে আজ কাজ নেই।

পথ বেশী দূর নয়। ছোট একতলা বাড়ীর দরজা ঠেলে প্রসন্ন এসে ভেতরে ঢুক্‌লো। প্রসন্নকুমার যুবক, কিন্তু একটি অস্বাভাবিক ঔদাসীন্য তাকে যুবার চেয়ে প্রৌঢ়ের দিকে এগিয়ে দিয়েছে। সে কখন্ বাড়ী থেকে বেরোয় তা তার মনে থাকে না, কখন বাড়ীতে এসে ঢোকে তাও সে ভুলে যায়। তরকারী লবণাক্ত না হলে তাকে ভাবতে হয় তরকারীর মধ্যে অভাবটা কি।

—ও, এই যে মলিনা। একটুখানি থমকে প্রসন্ন আবার বল্‌ল—আচ্ছা, বাইরের দরজাটা খোলাই রেখেছিলে?

—খোলা? কই খোলা ত ছিল না। কই দেখে আসি ত'।

—থাক্, খোলা যদি না থাকবে এলাম কি করে?

মলিনা মুখ না তুলে অন্যদিকে সরে গেল। যে জান্‌লাটা বন্ধ, সেইখানে সরে' গিয়ে দাঁড়াল। প্রসন্ন গায়ের জামাটা ছাড়্‌ল—বোধ-হয় তার গরম

হচ্ছে। সেটা ছেড়ে যত্ন করে' হুকের ওপর টাঙিয়ে দিয়ে বল্‌ল—এ বাসাটা কেমন লাগছে মলিনা, বেশ সুবিধে হচ্ছে ত সব দিকে ?

বোঝা গেল মলিনা ঘাড় নেড়েছে।

আচ্ছা, আমি যখন এসে ঢুকলাম তখন পায়ের শব্দ হয়েছিল ?

মলিনা এক পা পিছিয়ে গেল। মুখ তুলে বল্‌ল, কার ?

—চমকে উঠলে কেন ? আমার কথাই বলছি। তারপর মুখ ফিরিয়ে জান্‌লার বাইরে তাকিয়ে প্রসন্ন বল্‌ল, এইবার ঝড় উঠবে, আর দেরী নেই। আচ্ছা দেখেছ জটাজুট কালো মাথার চুড়ো ? কি বিরাট বিপুল! আমি তাই দেখছিলাম মলিনা—এক হাতে শাঁখ আর এক হাতে ঝড়ের দণ্ড, কোলে বিদ্যুৎমণি। মলিনা, ঘরের ভেতরটা এমন এলোমেলো হল কেমন করে ? এমন অগোছালো ত আমার বেরোবার সময় ছিল না।

ভীত দৃষ্টিতে মলিনা চারিদিকে তাকাতে লাগল।

—অনেক ঘুরলাম তোমাকে নিয়ে, কি বল ? জলপাইগুড়ি, কাশী, আগরা, জয়পুর। এখানে এসে বোধ হয় তোমার সব চেয়ে ভাল লাগছে নয় ?

—কি বলছেন আপনি ?

—কিছুই না, শুধু জানতে ইচ্ছে হচ্ছে তোমার ভাল লাগছে কি না।

মলিনা আর কিছুই বলল না। প্রসন্ন বলল—আচ্ছা বাক্সটা ওখান থেকে সরে গেল কি করে' বল ত ?

আমি সরিয়েছিলাম।

তুমি ? ঠিক মনে আছে ? আমি সরাইনি ?

থর থর করে মলিনা কেঁপে উঠল। অস্ফুট কণ্ঠে শুধু বলল, আমিই ত!

—ও ; ভাবছিলাম আমিই বুঝি কাপড় বা'র করে ওখানেই রেখে গেছি!

বাইরে মেঘের গর্জ্জন শোনা গেল। একটি ব্যাকুল উত্তেজনা আকাশে আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রসন্ন তাড়াতাড়ি জান্‌লা-দরজা সমস্ত খুলে দিল।

মলিনা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হাসতে হাসতে প্রসন্ন বলল—লোকের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে গেলাম। যে-মেয়ের মাথায় সিঁদুর নেই তাকে নিয়ে দেশ ঘোরা—অবশ্য আমরা কিছুই গ্রাহ্য করিনে। তবুও মাঝে মাঝে মুস্কিল বাধে বৈকি। আচ্ছা মলিনা ?

মলিনা মুখ তুল্‌লো।

—তোমার শরীর কি ভাল নেই? আমার মনে হচ্ছে তোমাকে দেখে—

—কি?

মেঘের গর্জ্জনের সঙ্গে বিদ্যুতের আলো দুজনকে চমকে দিয়ে মিলিয়ে গেল।

—না কিছু না,—আচ্ছা, এর আগে কি ঝড় হয়ে গিয়েছিল? তুমি কি তখন ছাতের ওপর ছিলে? ছিলে না?

—না।

—ঘরের মধ্যেই? ও।

কয়েকটি মুহূর্ত্তের অতল নিঃশব্দতা হয়ত দুজনেই একবার অনুভব করে নিল। তারপর ধীরে ধীরে একটা হাত দেওয়ালের ওপর তুলে দিয়ে প্রসন্ন বল্‌ল—আমার এখানকার বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে পরিচয় করে তুমি বোধ হয় খুশী হয়েছ? হওনি? থাক্‌ থাক্‌, এক কথায় জবাব মুখে না আসে ত আমার কথা এড়িয়ে যেও।—কিন্তু আমার হাসি পাচ্ছে তোমাকে দেখে। তুমি যেন ঠিক আদালতের মধ্যে অপরাধীর মতন দাঁড়িয়ে। কেন? কি হল? আমাকে লজ্জা দিও না মলিনা! আমার জন্যে পাশের ঘর ত' বেশ গুছিয়ে রেখেছ, কিন্তু তোমার ঘরের এ কি চেহারা বলত? বিছানাটার ও রকম অবস্থা কে করলে?

মলিনার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

কি আশ্চর্য্য, মাথার চুলের কি ছিরি হয়েছে দেখ দেখি? আঁচ্‌ড়াওনি বুঝি? আমি বেরিয়ে যাবার পর এতক্ষণ—

মলিনার ভয়ার্ত্ত মুখ দিয়ে শুধু একটি শব্দ বেরিয়ে এল। দেওয়ালের দিকে আর একটু তাকে ঘেঁষে দাঁড়াতে হল—হাতের ভর দেবার জন্যে। মনে হলো হিমাচ্ছন্ন তার দেহ, হাত-পাগুলি অবশ, মাথাটা এখুনি হয়ত শিথিল হয়ে ঘাড়ের কাছে নুইয়ে পড়বে। ঘর দো'র যেন তার পায়ের তলায় দুলছে।

—মলিনা?

—কি।

—আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে তুমি এমনি করে পালিয়ে লুকিয়ে বেড়াবে? এমন কতদিন? তোমার বয়স যে অল্প! দেশের কাজে

নামতে চাইছ অথচ এমনি করে ভয়ে পালিয়ে বেড়ানো—আর আমিই-বা তোমার সঙ্গে এমনি করে কতদিন·········ধর তোমার বয়স এখন আঠারো কুড়ি পার হয়ে না গেলে তোমার নিজের ওপর কোনো অধিকারই নেই!

কোনো কথার সঙ্গত উত্তর দেবার শক্তি মলিনার ছিল না। প্রসন্ন হঠাৎ বল্‌ল—বাঃ, তুমি ত' বেশ দেখছি! এদিকে ঘরে একটা আলো জ্বালতেও তোমার মনে ছিল না? ভুলে গেছলে বুঝি?

সপাৎ করে মলিনার পিঠে যেন চাবুক পড়ল। থর থর কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে সে বল্‌ল, এই যে জ্বালি, এতক্ষণ জ্বালবার,—আপনি এলেন কি না!

—অন্ধকারে ছিলে? একলাই থাকতে হয়েছিল এতক্ষণ, না?

বাতিটা হাত থেকে ঠক্ করে মাটিতে পড়ে গেল। সেটিকে কুড়িয়ে নেবার জন্যে মলিনা আর আঙুলগুলি একত্র করতে পারছিল না। হাত তার অবশ অচেতন!

প্রসন্ন তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে জ্বলন্ত বাতিটা তুলে' দু ফোঁটা তেল মাটিতে ঢেলে তার ওপর বসিয়ে দিল।

ঘরে আলো জ্বল্‌ছে। সকল দরজা জান্‌লা খোলা, প্রদীপের পরমায়ু কতটুকু কে জানে। সেই ক্ষীণ দীপশিখার আলো থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য মলিনা একটু দূরে সরে দাঁড়াল। মুখে তার ভয়ের বিশ্রী বিবর্ণতা। একটি অপরিচিত আতঙ্কের ছায়া!

আজকে বোধ হয় আর ঝড় উঠল না! এবার আমি বলি এক কাজ করা যাক্—বুঝলে মলিনা? দুঃখও তুমি অনেক পেলে। আমাকে অবলম্বন করে আত্মরক্ষা করবার জন্য নিন্দাও তোমাকে সইতে হলো। তোমার মত সরল মেয়ের পাওনা সংসারে এর চেয়ে বেশী আর কিছু নেই। বড় যে হতে পেরেছে, নিন্দা আর অপযশও তার তত বড়। চল, তোমার ছোট কাকার ওখানে তোমাকে রেখে আসি। তিনি তোমাকেও বোঝেন, আমাকে জানেন। নৈলে এ অবস্থায় তুমি—ওকি? মলিনা তোমার ছেঁড়া কাপড়? ছেঁড়া কাপড় পরে আছ?

দেখতে দেখতে মলিনার মুখ শাদা হয়ে এল, সে মুখে আর রক্তের চিহ্নমাত্র রইল না। কাপড়খানি গুটিয়ে সে আর এক পা পিছিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। তার চোখ দুটি কাঁপছে, ঠোঁট দুটি স্ফুরিত হচ্ছে, পা টলছে, তার আর দাঁড়াবার শক্তি নেই, বসে পড়ে' কোথাও মুখ ঢাকৃতে পারলে সে বাঁচে।

—মলিনা ?

—উঁ ?

—এ রকম কথা ত ছিল না ! আমি চেয়ে দেখবো তোমার জামা-কাপড় ছেঁড়া, তোমার মাথার চুল এলোমেলো, তোমার গায়ে-মাথায় ধুলো বালি, তোমার জিনিস-পত্র, বিছানা-বালিশ ওলোট-পালোট ? আজ তোমার এ কি রূপ ! প্রসন্ন না হেসেও আবার থাকতে পারল না, তুমি ডাকাতের সঙ্গেও যুদ্ধ করনি, ঝড়ের সঙ্গেও লড়াই করনি, তবে ?

দু'হাতে মুখ ঢেকে মলিনা বলে' উঠলো—আমি জানিনে।

সে যেন আর্ত্তনাদ। প্রসন্নর বুকের ভেতরটা হঠাৎ ধ্বক্ ক'রে উঠল। এই বিদীর্ণ হৃদয়ের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল না। মুহূর্ত্তের জন্য সে একবার বাইরের দিকে তাকালো। সমস্ত আকাশ জুড়ে যেন বিরাট মহাসাগর স্তম্ভিত হয়ে রয়েছে ! নীচে যতদূর দৃষ্টি যায়, পুরাণদহের প্রান্তর-সীমা অতিক্রম করে অনন্ত অন্ধকার। দিক্‌চিহ্নহীন প্রকৃতির পটের ওপর কে যেন কালী বুলিয়ে দিয়েছে।

এগিয়ে এসে বাতিটা হাতে তুলে নিয়ে প্রসন্ন তার কাছে সরে গেল। বল্‌ল—কি ? বল শুনি ? কাঁদচো নাকি মুখ ঢেকে ? এখানেও যে তোমার ভাল লাগছে না তা আজ আমার মনে হচ্ছে। কিন্তু সত্যি, কি চেহারা হয়েছে তোমার বল দেখি ? কাল এমন সময় ত তোমার এ চেহারা ছিল না।

প্রসন্ন আবার বল্‌লে—কাল কেন, আজ সকালেও তোমাকে এমন দেখিনি। বিকেল বেলা যখন আমি বেরোই···আশ্চর্য্য, এ যে তুমি বদ্‌লে গেছ একেবারে ? মলিনা, টাট্‌কা ফুলকে মুঠোয় চেপটাতে দেখেছ ? পায়ের তলায় মাড়াতে ?

ওঃ বুঝেছি, তুমি এ লজ্জার জীবন আর সইতে পারছ না। তাই নয় কি ? মলিনা ?

মলিনা ফুঁপিয়ে উঠে বলল—আর কিছু আমায় জিজ্ঞেস করবেন না। আমি—আমি কিছু বলতে পাচ্ছি না।

আচ্ছা, আচ্ছা, আমি বল্‌ছিলাম তোমার জন্যেই। তোমার উপর ঝড় যদি বয়ে যায়, আমি জানি ধুলো তোমার গায়ে কিছুতেই লাগবে না; সে মেয়ে ত' তুমি নও।—বেশ অন্য জায়গা আগে থাকতেই আমি বন্দোবস্ত করেছি। চল দিল্লীতে গিয়েই থাকিগে। সেখানে ভাল বাঙ্গালীর হোটেল

আছে কি না আজ খবর আসার কথা। আচ্ছা, আমাকে কেউ ডাকতে এসেছিল মলিনা?

ডাকতে? মলিনা অকস্মাৎ শশব্যস্ত হয়ে বলল, কই না, কই জানিনে ত কিছু? কারুকেও ডাকতে শুনিনি?

কেউ আসেনি? একজনও না?

উহুঁ।

মনে করে' দেখ দেখি, আমি বেরিয়ে যাবার পর···দীনেশ······এসেছিল কি না? দীনেশ গো আমাদের। মনে পড়ছে না দীনেশকে? এরই মধ্যে ভুলে গেলে?

মুমূর্ষু পক্ষীর মত মলিনার আর্ত্তকণ্ঠ শোনা গেল, হ্যাঁ এসেছিলেন।

এসেছিলেন? তাই বল, আমার মতো যে তোমারও কথার ভুল হয়। হ্যাঁ, তাকেই আমার দরকার। তুমি কি বল্‌লে তাকে? বসতে বল্‌লে না? আমার না আসা পর্য্যন্ত তাকে ধরে' রাখা তোমার উচিত ছিল যে মলিনা। উঃ সমস্ত মন দিয়ে কেমন করে' যে তার জন্যে অপেক্ষা করে' আছি···আঁ্যা, দীনেশ তাহলে এসেছিল আমি বেরোবার পর? ঘড়ির কাঁটা ধরে' সে চলতে জানে। হায় হায়, তুমি যদি তাকে আর একটু বসিয়ে রাখতে।

বাইরের আকাশ ততক্ষণে ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে গেছে।

কুমারী

এক বোঁটায় দু'টি ফুল; একটি গোলাপ আর একটি অপরাজিতা। গোলাপটির গন্ধের চেয়ে ঝাঁঝ বেশী; অপরাজিতাটি মৃদু এবং সলজ্জ।

চঞ্চলার নাকি বিয়ে হবে, পাত্রের খোঁজ চল্‌ছে। ছোট বনলতারও বাড়ন্ত গড়ন—বছর খানেকের বেশী আর হয়ত তাকে রাখা চলবে না। দুটো মেয়ে পাশাপাশি দাঁড়ালে ভয়ে একেবারে গা শিউরে ওঠে।

তবে দিয়ে-থুয়ে পার করবার মত স্বচ্ছল অবস্থা। বাপ আছে, মা নেই। বুড়ি ঠাকুরমা কিন্তু আজও বেঁচে আছে। ঠুক্-ঠুক্ ক'রে গঙ্গাস্নানে যায়, মন্দিরে ঢোকে, ফিরে এসে রাঁধে বাড়ে, বিকালে 'গোপাল বাড়ী' কীর্ত্তন শুন্‌তে যায়, সন্ধ্যার পর এসে মুড়ি দিয়ে শোয়। রাত্রে নাকি বুড়ির রোজ জ্বর আসে।

বাপের বয়সও অনেক। সরকারী চাক্‌রীতে পেন্‌সন্ পান। একটু হাঁপানির দোষ আছে। কবিরাজের ওষুধ চলে।

চঞ্চলা কালো, মুখখানি সুশ্রী, আনম্র, শান্ত,—চোখদুটি দীর্ঘায়ত, গভীর। চোখের ওপর চোখ রেখে দেখলে তবে সে-চোখ চেনা যায়। বনলতা সুন্দরী, আগুনের আভার মত,—তীব্র এবং তীক্ষ্ণ। চঞ্চলা স্কুল ছেড়েছে, অত বড় মেয়ে, স্কুলে যাওয়া আর ভাল দেখায় না। বনলতা এখনও যায়, সে অত সব গ্রাহ্য করে না। সাম্‌নের বছরে সে ম্যাট্রিক দেবে। লেখাপড়ায় দিদির চেয়ে সে একটু বেশী টন্‌টনে।

বুড়ি হেসে বলে—দেখিস ভাই, খোট্টার দেশ। রাস্তাঘাটে চলিস্, কেউ যেন—বুঝলিনে?

তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে বনলতা বলে, পায়ে আমার জুতো থাকে ঠাকুমা, ভয় নেই! একটা ছেলে সেদিন মুখ টিপে হেসেছিল, ইঁট ছুড়ে তার রগ্ ফাটিয়ে দিয়েছিলাম, ঠাকুমা।

শরতের হাওয়া বইছে। দুপুর বেলা পুরুষের ভিড় একটু কমে' গেলে মেয়েরা গিয়ে গঙ্গাস্নান করে' আসে। মেয়ে দুটোকে স্নান করিয়ে উঠে এসে বুড়ি বল্‌ল—দাঁড়া ভাই তোরা একটুখানি, কেদারের মাথায় দুটো ফুল ফেলে দিয়ে আসি। এই যাবো আর আসবো।

ফুল ফেলতে গিয়ে বুড়ির পুজো আর শেষ হয় না।—

ঘাটের দিকে চেয়ে এক সময় বনলতা বলল, ছাখ্ দিদি, ওই ছাখ্,—এই জন্যেই আমি নাইতে আসিনে…ওকে দেখলে আমার গা জ্বলে' যায়।

চঞ্চলা সেই তার দিকেই এতক্ষণ তাকিয়ে ছিল। মুখ ফিরিয়ে বলল—এত রাগ কেন ওর ওপর? বাবাকে সেদিন কি রকম বাঁচালো বল দেখি? নিজের হাতে ওষুধ দেয়া, সেবা করা…তুইত তখন স্কুলে!

সে অমন লোকে করেই থাকে। ভারি আমার ডাক্তার! এত যদি দয়ালু তবে আড়াল থেকে আমাদের দিকে তাকায় কেন? লজ্জা করে না?

চঞ্চলা সলজ্জভাবে বলল—পাশাপাশি বাড়ীতে থাকলে অমন এক আধবার দেখা শোনা হয়ই।

ক্ষুব্ধ আক্রোশে বনলতা দাঁতের ওপর দাঁত চেপে নিঃশব্দে মুখ ফিরিয়ে রইল।

এতক্ষণে স্নান সেরে কাঁধের ওপর গামছা ফেলে ছোকরাটি ওপরে উঠে এল।

হঠাৎ পাশে চঞ্চলাকে দেখে একটু হেসে বলল—এই যে, চান করতে এসেছিলেন বুঝি?

চঞ্চলা বলল—হ্যাঁ।

বনলতা দুজনের দিকে এক মুহূর্ত্ত তাকিয়ে কয়েক পা সরে' গেল। কাছে দাঁড়িয়ে এমন বেহায়াপনা দেখা তার একেবারে অসহ্য।

ছোকরাটি বলল—বাবা আপনার ভাল আছেন?

ভাল বিশেষ নেই, ওষুধ চলছে।

সেরে উঠবেন, ভাবনা নেই—বলে' ছোকরাটি অদূরে বুড়ীকে বেরিয়ে আসতে দেখেই আবার নিজের পথে চলে' গেল।

বুড়ীকে পিছনে রেখে দুই বোনে পথ চলতে লাগলো। অপরিসীম ক্রোধে ফুলতে ফুলতে মুখ রাঙা করে' এক সময় বনলতা বলল—ষ্টুপিড্! পথে ঘাটে মেয়েদের সঙ্গে হেসে কথা বলতে লজ্জা করে না!

চঞ্চলা বলল—ছি, গালাগাল দেওয়া কিন্তু ভাল দেখায় না বুনি। ভদ্রতা রক্ষা করতে কথা বলাটা অন্যায় নয়।

ওরে আমার ভদ্রতা! দিন দিন এ ভদ্রতা না বেড়ে গেলেই বাঁচি। আঠারো বছরের মেয়ে গেলেন পঁচিশ বছরের ছেলের কাছে ভদ্রতা রক্ষা

করতে—এ কথা শুনলে লোকে কি বলবে শুনি? আমি কিন্তু বাবাকে বলে' দেবো দিদি, তা বলছি।

একটুখানি হেসে চঞ্চলা বলল—তা দিস, এখন চুপ করে' হেঁটে চল।

রাগে প্রায় অন্ধের মত বনলতা বলল—একেবারে মরিয়া—কেমন? এ কিন্তু আমি হ'তে দেবো না, এই বলে রাখলাম। আমি বেঁচে থাকতে এসব চলবে না।

বাড়ী গিয়ে খানিকক্ষণ দুই বোনে ঝগড়া চললো কিন্তু হার হ'লো চঞ্চলার। সে বলল—আচ্ছা বেশ, সব মানলাম; কিন্তু পুরুষ মানুষের ওপর এত রাগ তোর কেন শুনি?

রাগ? রাম বল, রাগ নিজেরই ওপর। আমরাই ওদের সাহস দিই নৈলে ওদের সাধ্যি কি যে,—তুমি যদি ওখানে কথা না বলে' মুখ ফিরিয়ে নিতে কিম্বা ধমকে দিতে তা হলে কেমন হতো বল দেখি?

ছি বুনি।—বলে' চঞ্চলা উঠে চলে' গেল। গেল বটে কিন্তু যাবার আগে বনলতার মুখের অবস্থাটা একবার ভাল করে' দেখে গেলে ভালই হতো!

কিন্তু বনলতা ছাড়বার মেয়ে নয়! সেদিন থেকে সে একেবারে বড় বোনের কড়া সমালোচক হয়ে দাঁড়াল। চঞ্চলার ভাবভঙ্গী গতিবিধি প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি অখণ্ড মনোযোগের সহিত সে নিরীক্ষণ করতে লাগলো। তার চোখ এড়িয়ে কিছুই যে ঘটতে পারে না—এজন্যে তার আত্মপ্রসাদও বড় কম হলো না। চঞ্চলার যে কোনো অপরাধের জন্য সেই যেন সম্পূর্ণ দায়ী, এই মনোভাব নিয়ে তার অশান্তির আর অন্ত নেই।

—ওকি, সাড়ীখানা ঘুরিয়ে না পরলে আর চলে না, আগে ত তোমায় এমন করে' কাপড় পরতে দেখিনি দিদি?

চঞ্চলা বলল—চিরকাল কি আর একরকম চলে?

চলতেই হবে! তা বলে'—বাঃ, এ যে বেড়াতে যাবার সাজগোজ হচ্ছে দেখছি। কোথায় যাওয়া হবে শুনি?

কোথাও না, নিয়েই বা কে যাবে! ছাদে গিয়ে বসি গে।

না না, ছাদে তোমার যাওয়া চলবে না দিদি; বিকেল বেলা ছাদে ওঠা ভাল নয়। মেয়ে মানুষের এত ঘন ঘন হাওয়া বদল না করলেও চলবে। মাগো, কালো পায়ে আবার আলতা মাখানো কেন? মাথার ওকি

ছিরি ? এলো খোঁপা না ফিরিয়ে বিনিয়ে বাঁধলেই ত হতো ! তুমি যাই বল দিদি, রূপ দেখাবার চেষ্টা করলেই সুন্দর হওয়া যায় না !

চঞ্চলা হেসে বলল—আঃ তোর কথার মাত্রাজ্ঞান নেই বুনি।

তা না হোক, তুমি কিন্তু এ রকম করতে পাবে না।—বলে' বনলতা একদিকে হন্ হন্ করে' চলে' গেল।

চঞ্চলার কোনো আঘাতকেই সে আমল দেয় না। বয়সে বড় হলেও চঞ্চলা যে সাধারণ অভিজ্ঞতা, সহজ বুদ্ধি এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টির ক্ষেত্রে তার চেয়ে অনেক ছোট—একথা বনলতা কিছুতেই ভুলতে পারে না। এ জন্যে বড় বোনের ওপর তার করুণারও সীমা নেই।

—যখন তখন অমন চুপ করে' বসে থাক কেন দিদি ? সংসারের কাজ তুমি ত এক রকম ছেড়েই দিয়েছ দেখছি। লেখাপড়াও ছেড়ে দিয়েছ—সুতরাং এ কথা আর জানবে কি করে' যে মাথা খালি থাকলেই খেয়ালে পেয়ে বসে ! আজ স্কুল থেকে এসে যেন দেখি তুমি বই খাতা নিয়ে বসে আছ। গোটাকতক আঁক দিয়ে যাবো কস্‌বে বসে' বসে' ?

আরে না না, কেন বাজে বকিস ?

বাজে ! আমি বাজে বকি—কেমন ? ক্রমে সবই বুঝতে পারছি দিদি। রাগে গর গর করতে করতে বনলতা চলে' যাচ্ছিল ; ফিরে দাঁড়িয়ে আর একবার বলে' গেল—বয়েস আমারও কম হয়নি দিদি, বিয়ে হলে এতদিন ছেলের মা হতাম। এরকম কাণ্ড সবই বুঝতে পারি। বুঝলে ?

লজ্জায় মুখ লুকিয়ে হাসতে হাসতে চঞ্চলা একদিকে পালিয়ে গেল।

পসার এখনও ভাল করে জমে নি। সারাদিনে গুটি চার পাচ রোগী আসে আর একটি কিম্বা বড় জোর দুটি 'ডাক'। বিদেশের লোকের স্বাস্থ্য একটু ভালই তাই ঔষধ পত্র এনে জমিয়ে রাখতে সাহস হয় না। যারা একটু আধটু শিক্ষা দীক্ষা পেয়েছে তারাই ডাক্তার দেখাতে আসে ; বাদবাকী সবারই মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা।

নীচে আর ওপরে দুটি ঘর। নীচেরটিতে দোকান আর ওপরেরটিতে শোবার ব্যবস্থা। একটি মাত্র বাইরের লোক আছে। নাম—মহারাজ। সে একাধারে চাকর, বামুন, দারোয়ান এবং সরকার। খাওয়া-পরা পনেরো টাকা মাস-মাইনে। রাত্রে সে 'দোস্তির' বাড়ীতে শুতে যায়—আবার কাক না ডাকতেই ফিরে আসে। লোকটা বিশ্বাসী।

—তুমি নিজের একটা যা হোক হিল্লে করে' নিয়েছ—কি বল মহারাজ ?

সেবার লাঠি খেলতে গিয়ে মহারাজ স্মুখের দুটো দাঁত ভেঙ্গে আসে। এক মুখ হাসি হেসে সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চেয়ে বলে—মেহেরবান বাবুজি !

মেহেরবান আমি খুব। দয়া একেবারে চারিদিকে ছড়িয়ে বেড়াচ্ছি।—বলে' বিনয় হো হো করে হেসে ওঠে। এই হাসির সঙ্গী তার কেউ নেই। নিজের পরিচ্ছন্ন ঘরখানির মধ্যে নিজেই একটি ছোট্ট পৃথিবী সৃষ্টি করে' নানা খেয়ালের তুলি বুলিয়ে তাকে রঙীন করে' রাখে। ঘরের দক্ষিণ দিকে দুটি খোলা জান্‌লা। যেন দুটি বোন। একখানি রৌদ্রোজ্জ্বল নীল আকাশকে তারা যেন দুজনে ভাগ করে' নিয়েছে। জোরে জোরে হাওয়া বইলে দুটি জান্‌লাই লজ্জায় বন্ধ হয়ে যায়।

খাওয়া দাওয়ার পর দুপুরবেলা ইজি চেয়ারে শুয়ে বিনয় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বাঙলা কবিতা পড়ে। বলে—একটা লাইনও বুঝতে পারছিনে, বুঝলে মহারাজ ? তবু ভাতগুলো হজম করতে হবে ত!—বেটা গেল কোথায় ? সাড়া দেয় না কেন ?

উঠে এদিক ওদিক তাকাতেই নজর গিয়ে পড়লো ও-বাড়ীর সিঁড়ির কাছের জান্‌লায়। জান্‌লার কাছে দাঁড়িয়ে এদিকে চেয়ে চঞ্চলা তখন হাসছে। জিভ কেটে মুখ লাল করে' বিনয় বল্‌ল—লুকিয়ে লুকিয়ে শুনলেন আমার কাব্যচর্চ্চা ?

চঞ্চলা বল্‌ল—বনলতা স্কুলে গেছে, এখনই ত শোনবার সময়। আপনি বুঝি কবিতা লেখেন ?

আমি লিখবো কবিতা ? হা ভগবান, এতদিনে এই দুর্নাম! আমার মধ্যে কোন ধোঁয়ার খোঁজ পেয়েছেন নাকি ? আচ্ছা, ছোট বোনটিকে এত ভয় করেন কেন ?

একটুখানি হেসে চঞ্চলা বল্‌ল—না করে' উপায় কি বলুন ? ও একেবারে বুনো ঘোড়া, মাথা উঁচিয়ে একবার ছুটলে আর কারোকে কেয়ার করে না! ভারি একগুঁয়ে!

বিনয় বল্‌ল—আমার ওপর তিনি বিশেষ সন্তুষ্ট নন্‌—কেন বলুন ত ?

সে এমনিই।—চঞ্চলা হেসে বল্‌ল—জগতটা যেন তার মেজাজের মুখ চেয়ে থাকে!

জান্‌লাটি ছোট কিন্তু সেখান থেকেই বিনয়ের সমস্ত ঘরটা দেখা যায়। ঘর ত নয়, যেন হরি ঘোষের গোয়াল। একটু আগে সে ঘরে যেন যুদ্ধ হয়ে গেছে। মুখ বাড়িয়ে চঞ্চলা বল্‌ল—শোবার ঘর লোকে অমনি অপরিষ্কার রাখে? একেবারে যে ডামাডোল!

বিনয় আবার হো হো করে' হাসলো। বল্‌ল—বুঝেছি, কথা খুঁজে না পেলে লোকে আপনার মতন অনেক বাজে কথা বলে। আমার ঘর সত্যি সত্যিই পরিষ্কার, এ পাড়ার কারো শোবার ঘর এমন নয়—আমি বাজি রেখে বল্‌তে পারি।—

কথা বলার অভ্যাসটা বিনয়ের এই রকমই। তর্ক করে' সে সাপের বিষ পর্য্যন্ত উড়িয়ে দিতে পারে।

—আমি কিন্তু বেশ থাকি তা আপনারা যাই বলুন। সবই পাবেন, কিছুরই অভাব নেই আমার ঘরে। ওই দেখুন 'ষ্টোভ',—মাংস ডিম কপি, ভাল ভাল তরকারী এনে নিজেই 'ফিষ্ট্' করি—নিজেই ওড়াই। মহারাজ বেটা গোঁড়া হিন্দু হয়ে ভারি সুবিধে হয়ে গেছে। এবার দেখুন না ভাল 'ডিনার টেবল' আনাচ্ছি, সঙ্গে দুটো ফুলদানী।—ওই যে ন্যাড়া পাঁচিলটা দেখছেন ওর ওপর টবে করে' ডালিমের চারা বসাবো—লাল লাল ফুল ফুটবে, আর মৌমাছি এসে ঘুর ঘুর করে' যাবে। আর নীচে ওই যে খালি জায়গাটুকু পড়ে' আছে, ওখানে—নাঃ, এখন বললেই সব মাটি হয়ে যাবে; এখানে আছেন যখন তখন সবই একে একে দেখতে পাবেন।—বলে' হেসে তাকাতেই চঞ্চলা বল্‌ল—কেবল একটা জিনিসের অভাব আছে!—বলেই সে জান্‌লার একটা কপাটের পাশে মুখখানিকে লুকিয়ে বসলো।

বিনয়ের সেই নিরুদ্বেগ, সরল এবং শান্ত মুখখানি হঠাৎ যেন একটু গম্ভীর হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে মাথা তুলে বল্‌ল—বুঝেছি আপনার কথা; কি উত্তর দেবো তাই চট্‌ করে' ভেবে নিলাম।

উত্তরটি কি শুনি?—ভুরু কুঁচকে মুখ টিপে চঞ্চলা চেয়ে রইল।

ভাবছিলাম বাঙলা দেশে একটি মাত্র মেয়ে সুখী, আমি যাকে বিয়ে করিনি। আর তা ছাড়া—

চঞ্চলা বল্‌ল—বেশ, বাহাদুর আপনি। এখন আপনার ওই কবিতার বইটা দিন দেখি, কাল আবার এমন সময় ফেরৎ দেবো।

বইটা নিয়ে বারান্দার কাছে এসে বিনয় বল্‌ল—ছুড়ে দিচ্ছ, লুফে নিন্।

আমার হাতে বেশ টিপ আছে। ছোট বেলা খুব ভাল গুলি খেল্‌তে পারতাম। ধরুন্‌।

ছুড়ে দিল বটে কিন্তু সেখানা চঞ্চলার হাত অবধি পৌছল না—জান্‌লার গরাদে লেগে নীচে পড়ে' গেল।

ওই যা—বলে' তাড়াতাড়ি উঠে নেমে আসতেই মাঝপথে বনলতার সঙ্গে দেখা। সে তখন স্কুল থেকে ফির্‌ছে। চঞ্চলাকে দেখে আরক্ত দৃষ্টিতে বল্‌ল— গায়ের ওপর বই ফেলে আমাকে অপমান করা? আমাকে অপমান!

বনলতা আর কিছু বলল না। খাতাপত্র রেখে কবিতার বইটা হাতে নিয়ে খট্‌ খট্‌ করে' বেরিয়ে গেল।

বিনয় তখন নিরুপায় লজ্জায় নীচের ঘরে বসে' আছে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বইখানা ভিতরে ছুড়ে দিয়ে বনলতা বলল—নিন্‌। কবিতার বই দিয়ে আমাকে নরম করা শক্ত। কাউকে কিছু বলবো না; এবারের মতন চুপ করে' গেলাম। কিন্তু দিদির মতন আমি কাউকে কেয়ার করিনে এটা জানিয়ে যাচ্ছি।

বিস্মিত বিনয়কে কিছুই বলতে না দিয়ে বনলতা যেমন এসেছিল তেমনিই আবার চলে' গেল।

ভয়ে বিবর্ণ মুখে চঞ্চলা দোরের কাছে দাঁড়িয়েছিল। ' ঘরে ঢুকে গম্ভীর ভাবে বনলতা কাপড় ছাড়তে লাগলো। চঞ্চল বল্‌ল—কি বল্‌লি? যা তা বলে' এলি ত?

কোন কাজের কৈফিয়ৎ দেওয়া বনলতার পক্ষে যেন নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন। তবু তাচ্ছিল্য কণ্ঠে বল্‌ল—আমার ভদ্রতা জ্ঞান একটু কম তা বলে' কমন্‌-সেন্‌স্‌টা কম নয় দিদি। শুধু বলে' এলাম ওসব চলবে না।

বেশ করেছিস।—বলে' হেসে চঞ্চলা চলে গেল।

জলযোগ ক'রে' একটু ঠাণ্ডা হয়ে দিদিকে ডেকে বনলতা বলল—আমি ইস্কুল যাবার পর সারাদিন তুমি কি কর শুনি? আঁক কসা ত বন্ধ করে দিয়েছ! সেলাইয়ের কাজটা দিলাম, তিনদিনের কাজ, তুমি আটদিনেও শেষ করতে পারলে না। তোমার একটু শাসন হওয়া দরকার দিদি।

তা না হয় কর—বাবার ছড়িটা এনে দিচ্ছি!

ঠাট্টা আমি ভালবাসিনে। দুপুর বেলা আজকাল কি হচ্ছে আমায় বলতেই হবে!

চঞ্চলা বল্‌ল—কি আবার হবে! হয় ঘুমিয়ে পড়ি না হয় মহাভারত পড়ি।

মাথা নীচু করে বিজ্ঞের মত বনলতা বলল—তা মহাভারত পড়া ভাল, অনেক জিনিস জানবার আছে। তবে তোমার বয়েসী মেয়ের আগাগোড়া মহাভারত পড়া তেমন ইয়ে নয়। সে অংশগুলো লুকিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে সেগুলো বাদ দিও, না হয় আমি দাগ দিয়ে দেবো'খন। ওকি, ও জান্‌লাটা আবার কে খুললো?

তাড়াতাড়ি জান্‌লাটা বন্ধ করতে গিয়ে দেখে, বিনয় বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে! সশব্দে মুখের ওপরেই জান্‌লাটা বন্ধ করে দিয়ে সরে এসে বনলতা বল্‌ল—বাবাকে বলে' এ বাড়ীটা ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে, আর নয় ত ডাক্তার অন্য কোথাও যাক্।

যাবার সময় চঞ্চলা বলে' গেল—সেই ভালো বুনি, তোর দুঃখ দেখতে পারিনে।

ঘরে ঢুকে বিনয় একটু চম্‌কে উঠলো। কার পায়ের শব্দ এই মাত্র যেন এ ঘর থেকে মিলিয়ে গেছে। একটি অপরিচিত ঝিলমিলে বাতাস ঘরের চারিদিকে যেন ভুর ভুর করছে। এ যেন ঠিক হাওয়া নয়—কা'র নিশ্বাসের আমেজ। ঘরের সমস্ত জিনিসপত্রগুলি হাসতে হাসতে ঠিক যেন কার আগমনের সাক্ষ্য দিচ্ছে। সে ত' নিজে ঝড়, যতক্ষণ থাকে ঘরটাকে ওলোট পালোট করাই তার কাজ। কিন্তু যে এসেছিল সে ত' ঝড় নয়—সে বসন্ত। আপনাকে সে সর্ব্বস্বান্ত করে' ফুল ফুটিয়ে গেছে।

ইজি চেয়ারে আর বসা হলো না; পায়চারি চলতে লাগলো। ওখানে ওই বইগুলি—বাঃ চেহারা ফিরে গেছে যে! চিঠি না ওখানা?

বই চাপা পত্রখানি তুলে নিয়ে বিনয় এক নিশ্বাসে পড়লো…'ডাকতে এসেছিলাম, পেলাম না। চিঠি পেয়েই একবার আসুন। বাবার হাঁপানিটা একটু বেড়েছে। আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।—চঞ্চলা দেবী।' পুঃ—'চিঠির কথা যেন বনলতা টের না পায়।'

বাক্সের মধ্যে চিঠিটা রেখেই বিনয় ছুটলো।

অন্দর মহলটা বেশ পরিচিত। ওপরে উঠতেই চঞ্চলা হেসে বলল—আসুন, বাবা জেগেই আছেন।

জেগেই ছিলেন। সাড়া পেয়ে মুখ ফিরিয়ে বললেন—এসো বাবা, এখন

একটু ভাল আছি। টানটা কিছু কম পড়েছে। তোকে বললাম না ওঁকে আর এখন বিরক্ত করিসনে, তুই শুনলিনে।

চঞ্চলা বল্‌ল—আমরা বিরক্ত না করলেও অন্য কেউ করতো!

বিনয় বল্‌ল—তা ত নিশ্চয়ই। বিরক্ত করলেই আমাদের পেট চলে। আজ কিন্তু আপনার ওষুধটা বদলে দিয়ে যেতে হবে। হাতটা একবার দেখি?

হাতের নাড়ী পরীক্ষা করে বিনয় বল্‌ল—ভালই আছেন; তবে ভারী দুর্ব্বল! কাগজ-কলমটা একবার দিন ত?

চঞ্চলা তাড়াতাড়ি লেখার সরঞ্জামগুলি এগিয়ে দিল। ছোট একটি 'প্রেস্‌ক্রিপসন' লিখে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বিনয় বল্‌ল—এটা খাইয়ে কেমন থাকেন কাল সকালে যদি একবার খবর দেন ত'—আজ যাচ্ছি।

ওকি, না না, সে হবে না বাবা। ফি-র টাকাটা—

মাপ করবেন—বলে' বেরিয়ে আসতেই একেবারে বনলতার মুখোমুখি। ভিতরে ঢুকে বনলতা বল্‌ল—দাঁড়ান, অত দয়ালু নাই বা হলেন! দাও দিদি টাকাটা—বলে' এগিয়ে এসে চঞ্চলার হাত থেকে টাকাটা নিয়ে আলগোছে সে বিস্মিত, ক্ষুব্ধ বিনয়ের হাতের ওপর ফেলে দিল। বল্‌ল—এ রকম ডাক্তারী কিছুদিন চালালে লোকে আপনাকেই রুগী বলে' ঠাউরে নেবে। তা' বলে' কিছু মনে করবেন না যেন।

বেশ যা হোক—বলে' বিনয় বেরিয়ে নীচে নেমে গেল।

চঞ্চলাও আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল। আজ তার একটু রাগ হয়েছিল। মুখ রাঙা করে বল্‌ল—বাহাদুর মেয়ে তুই বুনি। কিছুই তোর আটকায় না। লোককে অপমান করাটা যেন তোরই একচেটে।

বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে কর্ত্তা খানিকক্ষণ নিঃশব্দে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে রইলেন। রুগ্ন মুখে একবার একটুখানি হাসলেন, পরে নিজের মনেই মৃদু কণ্ঠে বললেন—যদি হয় ত মন্দ হয় না!

আবার তিনি পাশ ফিরে শুলেন।

একটু পরে ঘরে ঢুকে বনলতা বল্‌ল—বাবা জেগে আছেন?

বাবা মুখ ফিরিয়ে—কেন ছোট মা?

আচ্ছা, একি ভাল বাবা? এই যে ডাক্তার আপনাকে হাতে রেখে চিকিৎসা কচ্ছে।

সে কি ?

তাই ত মনে হচ্ছে ! নৈলে রোজ একবার করে' আসবার তাঁর কি দরকার ? এ শুধু টাকা নেবার ফন্দি বৈ ত নয়।

ছি মা, একি বলতে আছে ! ঘরের ছেলের মতন—এলেই বা ! টাকা ত নিতেই চায় না, আমরাই জোর করে'—

এই কথাগুলিতেই বনলতা বেশি ক্ষুব্ধ হয়। ডাক্তারের সঙ্গে এতখানি অকারণ আত্মীয়তা—তার গায়ে যেন বিষ ছড়িয়ে দেয়। বল্‌ল—আচ্ছা বেশ বাবা, টাকা উনি নিচ্ছেন, টাকাই নিন্, তা বলে' ঘরের ছেলের মতন আর হয়ে কাজ নেই।—বলে' সে দুম্ দুম্ করে' ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

রাগে তার সর্ব্বশরীর জ্বালা করছিল, একটা কিছু কাজ নেবার জন্যে পড়বার ঘরের কাছে আসতেই ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে ওবাড়ীর বারান্দায় বিনয়কে দেখা গেল। সন্ধ্যার অন্ধকার হয়ে আসছিল, তবু মনে হল লোকটার সুগঠিত গৌরবর্ণ দেহে অতিরিক্ত শক্তি, চোখ দুটো উদার, চওড়া কপাল, মাথার চুল পিছন দিকে ফেরানো, মুখে ছোট ছেলের মত একটি উদ্দেশ্যহীন হাসি—অনেকগুলি সাধারণ যুবকের মাঝখানে নিজের একটি অখণ্ড বিশেষত্ব নিয়ে দাঁড়াতে পারে। আজ প্রথম বনলতা তাকে ভাল করে' দেখলো। বল্‌ল—বাইরে রূপ থাকলে কি হবে, হাড়ে হাড়ে দুষ্টুমী একেবারে জড়ানো।

চঞ্চলা কখন্ এসে পিছনে দাঁড়িয়েছিল। বল্‌ল—তা হোক গে, দুষ্টুমী যার আছে তার আছে—আমাদের কি ?

হঠাৎ একটু অপ্রস্তুত হয়ে বনলতা মুখ ফিরিয়ে তাকালো। একটু হেসে চঞ্চলা বল্‌ল—কিন্তু কেমন দেখলি তাই বল।

বনলতা একেবারে ফেটে উঠলো। বল্‌ল—আস্পদ্দাটা একবার ভাল করেই দেখছিলাম ! পরের বাড়ীর জান্‌লার দিকে এমনি নজর করে' থাকা ! শেম্‌লেস ক্রিচার !

ও কথাটা তোর পক্ষেও খাটে বুনি।—বলে' চঞ্চলা গিয়ে ঘরে ঢুকলো।

সেইদিনই রাত্রে বারান্দার কাছে গিয়ে খড়ি দিয়ে দেওয়ালের গায়ে বড় বড় অক্ষরে বনলতা লিখলো—'এ বাড়ীর দিকে চেয়ে দেখা কোনো পুরুষের পক্ষে একেবারে নিষেধ।'

এবং পরদিন লেখাটার ফলাফল সম্বন্ধে জানবার জন্য সে অতিশয় ব্যগ্র

হয়ে উঠলো। গোপনে বিকাল বেলা ছাদের সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে লুকিয়ে দেখলো, বারান্দার দিকে চেয়ে কৌতুক-হাস্যে ছোক্‌রা ডাক্তারটির মুখখানা ক্ষণে ক্ষণে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এবং সেইদিকেই চেয়ে কা'কে যেন বল্‌ছে—আপনার ছোট বোনটির মাথায় একটু ছিট্‌ আছে, কি বলেন?

রাগে যেন চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল। ছিট! তবে সে পাগল? মানে, মাথা খারাপ—কেমন?

চঞ্চলা বল্‌ছে—তা বলে আপনি কিছু মনে করবেন না যেন?

না না, সেকি, ছেলেমানুষ এমন করেই থাকে। মনে কি করবো?

পা দুটো যেন বনলতার টল্‌তে লাগলো। গায়ের প্রতি লোমকূপে কে যেন লঙ্কার গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়েছে। সে ছেলে মানুষ! অর্থাৎ দুনিয়ার কিছু সে বোঝে না। ইস্কুলের কোন বান্ধবী একবার তাকে এই আখ্যা দিয়েছিল বলে' সে তার গায়ে নখ ফুটিয়ে রক্ত বার করেছিল।

অপমানের জ্বালায় বনলতার কান্না এল।

এর প্রতিশোধ চাই!

নীচে নেমে বারান্দায় এসে দেখলো, চঞ্চলা সরে গেছে; ওধারে বিনয় দাঁড়িয়ে। বলল—মেয়েদের দিকে চেয়ে হাঁ করে কি দেখা হচ্ছে শুনি? ডাক্তার বলে' কি মাথা কিনেছেন!

তার তীব্র মূর্ত্তির দিকে চেয়ে অকস্মাৎ হো হো করে' হেসে উঠে বিনয় ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

তার পরদিন ইস্কুল যাবার আগে একখানি চৌকো টিনের পাত্‌ দড়ি দিয়ে বেঁধে বনলতা বারান্দায় ঝুলিয়ে দিয়ে গেল। তাতে লেখা—'গাধা'। এবং ফিরে এসে সেটাকে আর দেখতে না পেয়ে রাগে গিস্‌ গিস্‌ করতে করতে বল্‌ল, দিদি?

কেন রে?

আমার 'গাধা' কোথায়?

চঞ্চলা একটু হেসে বল্‌ল—ও বাড়ীতে।

সে আবার কি?—বলে' বনলতা জান্‌লা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলো, তার দড়ি বাঁধা 'গাধা' ডাক্তারের বারান্দায় ঝুলছে। বল্‌ল—কি করে গেল?

চঞ্চলা বল্‌ল—বোধ হয় বাবাকে দেখে যাবার সময় নিয়ে গেছেন!

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বনলতা বল্‌ল—নিজের বাড়িতে 'গাধা' টাঙানো হলো। তার

মানে, আমি যদি ওদিকে তাকাই তা হলে আমি 'গাধা'—কেমন? চোর কোথাকার!

ছুম্ ছুম্ করে' ঘরে ঢুকে সে খাটের বিছানার ওপর মুখ থুবড়ে পড়লো। তার সমস্ত রাগ ঘুরে এল এই বিছানাটারই ওপর! মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে শুয়ে তিন চারটে বালিশ প্রাণপণ শক্তিতে চেপে ধরে দুহাতের দশ আঙুল দিয়ে তাদের উপর নিষ্ঠুর নির্য্যাতন করতে লাগলো। অপমানে রাগে দুঃখে আর প্রতিশোধ-স্পৃহায়—যদি সে একবার চীৎকার করে' কাঁদতে পারতো তাহলে হয়ত ভাল হতো।

পরের দিনটা শনিবার। দুপুর বেলা ইস্কুল থেকে ফিরে এসেই বইখাতা রেখে বনলতা বল্‌ল—ডাক্তারের বাড়ীতে যে আমার কোন চিহ্ন থাকে এ আমি চাইনে। টিনের পাতখানা তুমি ফিরিয়ে আনো দিদি। তা হলেই ওর সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ আমাদের মিটে যাবে। বাবার অসুখ ত অনেক কমে গেছে, দরকার হলে গোপাল কবরেজকে ডাকলেই চলবে। তুমি গিয়ে ওটা আনো, তা হলেই—বাস।

চঞ্চলা হেসে বলল—তা এনে দিচ্ছি!

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার দিদির দিকে চেয়ে বনলতা বল্‌ল—কিন্তু যাবে আর আসবে; এক মিনিটের বেশি দেরী হওয়ার কোনো কারণ নেই। চল, আমিও যাচ্ছি তোমার সঙ্গে, দরজায় গিয়ে দাঁড়াবো।

দুজনে নেমে এল। চঞ্চলা ভিতরে ঢুকে ওপরে উঠে গেল। দোকান আগলে মহারাজ বসেছিল, ওপরে যাবার জন্য সে বনলতাকেও অনুরোধ জানালো। বনলতা বল্‌ল—বাবু তোমার ভারি পাজি মহারাজ, তার বাড়ীতে পা দিতে আমি ঘৃণা বোধ করি।

মহারাজ হেসে আবার কলকে টানতে লাগলো! কি ভাগ্যি সে বাঙলা বোঝে না!

তন্দ্রা এসেছিল; বিনয় জেগে তড়াক্ করে উঠে বসলো। হঠাৎ হেসে বল্‌ল—এতক্ষণ আপনাকেই স্বপ্ন দেখছিলাম! সত্যি বলছি, আপনাকে যেন—

মনে হলো চঞ্চলা ত কালো নয়—শ্যামাঙ্গী। মুখখানির ওপর একটি করুণ শান্ত ছায়া জড়িয়ে আছে! ডাগর দুটি চোখ যেন দুখানি সঙ্গীত; হাত পা গুলি নিটোল। মনে হলো, একটি লতার মত একজনকে আশ্রয় করে'

সে উঠে দাঁড়াতে চায় ; একটি সরল আত্মসমর্পণের ভাব তার মুখে মাখানো।

বিনয় উঠে দাঁড়ালো ; দাঁড়িয়ে কাছে গেল, গিয়ে বল্‌ল—আমি তোমায় ভালবাসি চঞ্চলা।

চঞ্চলা থতমত খেয়ে একটু হেসে সরে' যাবার চেষ্টা করতেই বিনয় তাকে দুই হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে মুখের ওপর মুখ রেখে চুম্বন করতে করতে বল্‌ল—এতে অন্যায় কিছু নেই—বুঝলে ?

হঠাৎ চোখের ওপর যেন নাটকের একটি দৃশ্য অভিনয় হয়ে গেল !

এদিকে এক মিনিটের বেশী হয়ে যেতেই বনলতা চীৎকার করে' উঠলো—দিদি ?

চঞ্চলা উত্তর দিল—যাচ্ছি, সেটা খুঁজে পাচ্ছি না !—এবার ছাড়ো, কেউ আবার—আঃ—বলে' মৃদু হেসে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে টিনের পাতটা হাতে করে' সে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এল।

তুমি যেন কি দিদি ! অত হাঁপাচ্ছ কেন ? আমি কি এত ছুটে আসতে বলেছিলাম ? চুল এলো করে' আলুথালু হয়ে, মুখ রাঙা করে'—আশ্চর্য্য মেয়ে যা হোক !

চুম্বনের সে উত্তাপ তখনও মুখ থেকে মোছেনি ; প্রণয়ের প্রথম স্পর্শ, কুমারীর বুকের অবাধ্য কাঁপুনি—তাও চঞ্চলাকে প্রায় রুদ্ধকণ্ঠ করে' ফেলেছিল।

ওপরে উঠে টিনের 'গাধা'টি নাড়তে নাড়তে বনলতা বল্‌ল—যাক, সব চুকে গেল এতদিনে। বাঁচলাম !—তুমিও আর ওর সঙ্গে কথা বলো না, দেখা হলে মুখ ফিরিয়ে নিও। আর যদি কখনো বাবা আর আমি ওর সম্বন্ধে আলোচনা করি, তুমি সেখান থেকে উঠে যেও। বুঝলে ?

অন্যমনস্ক হয়ে চঞ্চলা বল্‌ল—দেখা যাবে।

তার মানে ?—মুখের দিকে চেয়ে বনলতা বল্‌ল—যাই বল, তোমার জন্যে আমার ভয় করে দিদি। মাঝে মাঝে তোমার এই চুপ করে থাকা দেখলে আমি শিউরে উঠি।

শিউরে ওঠবারই কথা।

দেনা-পাওনা এমন করে' শেষ করবার পরেও দেখা যায়, দু'একদিন অন্তর বিনয় এক আধবার এসে কর্ত্তাকে দেখে যায় ! সে যে এসে শুধু রোগ আর ঔষধপত্রের সম্বন্ধেই আলোচনা করে তাও ত তার মুখ দেখলে মনে হয় না।

চঞ্চলা যেন একটু গম্ভীর হয়ে গেছে ; সে গাম্ভীর্য্য ঠিক ফল্গুধারার মত। কিছুই বুঝতে না পেরে বনলতা একবার গিয়ে গোপনে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল, বাবা ভিতর থেকে বললেন—বিনয় কিছু মনে করতে পারে, যদি আমাদের কথা শুনতেই হয় ত ভেতরে এসো ছোট মা।

বনলতা আহত হয়ে ফিরে গিয়েছিল।

তারপর সে এক রহস্য!

বলে—মুখ টিপে নিজের মনে অমন হেসো না দিদি, গা জলে যায়।

চঞ্চলা হেসে বলে—তুই যে জলে জলেই গেলি!

এরকম মন্তব্য বনলতা গ্রাহ্যই করে না ; কিন্তু মনে মনে অস্থির হয়ে উঠে বলে—যার দিকে চাই সবাই চুপচাপ—এর মানে কি? তা হলে আমাকে লুকিয়েও এ সংসারে অনেক কথা চলে?

আমাকে কেন যখন তখন ধমক্ দিস্ বল্‌ত?

তবে কাকে ধমকাবো শুনি? বাবাকে? ঠাকুরমাকে? না তোমার ওই গুণ্ডা ডাক্তারটাকে? উল্টে ধমক খাবার ভয় নেই আমার?

খিল খিল করে চঞ্চলা হেসে ওঠে।

হেসো না যখন তখন, হাসি আমার দু'চক্ষের বিষ!—বনলতা হন্ হন্ করে চলে' যায়।

সেদিন দুপুরে চঞ্চলা বিনয়ের দরজা থেকে নামতেই বনলতা পিছন থেকে বল্‌ল—দিদি?

মুখ ফিরিয়ে দিদি বল্‌ল—ও, তুই? ছুটি হয়ে গেল? চারটে বাজে বুঝি? বিনয়বাবুকে পেলাম না, তাঁর খোঁজেই গিছলাম।

সে ত বুঝতেই পাচ্ছি। কি দরকারে গিছলে আমি জানতে চাইনে। তুমি যে এসে বাবার ওষুধ নিয়ে যাও তা শুনেছি, তবু তার একটা সময় অসময় আছে! এখন বাবা ঘুমুচ্ছেন, ঠাকুমা গেছেন গোপাল-বাড়ী, আমি ইস্কুলে—ডাক্তারের ওষুধ নেবার এই কি সময়? দিদি, মেয়ে মানুষের লজ্জা গেলে আর কিছুই থাকে না।

চঞ্চলা বল্‌ল—বুনি, এসব অপমানের কথা, মনে রাখিস্।

দরজায় উঠে ঘাড় ফিরিয়ে বনলতা আগুনের মত একটুখানি হাসলো। বল্‌ল—সত্যি? তা হলে অপমান তোমার গায়ে বাজে? আমি জানতাম তোমার একদিক উগ্র হয়ে আর সব দিক ক্ষয়ে গেছে!

এক মুহূর্ত্ত সে চুপ করলো, পরে একেবারে মরিয়া হয়ে নিতান্ত জঘন্য একটি মন্তব্য করে বসলো। বলল—পুরুষ মানুষকে তোমার এতখানি দরকার কবে থেকে হয়েছিল তা'ত আর জানিনে ভাই? বলে বনলতা ভিতরে চলে গেল।

গেল বটে কিন্তু বিনয়ের এ বাড়ীতে আসা বন্ধ করবার মত শক্তি তার শিথিল হয়ে গিয়েছিল। সে প্রায় রোজই আসে—আসে বনলতার মুখেরই ওপর। ঠাকুমার ঘরের কাছে দাঁড়িয়ে হেসে হেসে কথা বলে, নিজের জীবনের নানা কাহিনী বলতে বলতে দুঃসাহসের গল্প করে। কর্ত্তার ঘরে গিয়ে ইংরেজি বাঙলায় নানান্ আলোচনা স্থরু করে' দেয়।

এ আত্মীয়তার গোপন অর্থ ক্রমশঃ বনলতার কাছে আর গোপন থাকে না।

অনেকদিন পরে কর্ত্তা বিছানার ওপর উঠে বসে সংবাদ পত্র পড়ছিলেন। শরীরটা তাঁর আজকাল একটু ভালই আছে।

ঘরে ঢুকে একটি ইজি চেয়ারের ওপর বনলতা সোজা হয়ে বসলো। বাবা তার আগমন টের পাননি ভেবে চেয়ারটা একটু শব্দ করে নড়িয়ে সে আবার চুপ করে রইল।

একটু পরে কাগজের ওপর মুখ রেখেই কর্ত্তা বল্লেন—আজকাল সকালে আর বেড়াতে যাওনা ছোট মা?

যাই মাঝে মাঝে। আচ্ছা বাবা?—

কাগজ থেকে মুখ সরিয়ে তিনি বললেন—কেন?

দিদির নাকি বিয়ে হবে শুনছি? আর পাত্র নাকি আপনার ওই ডাক্তার?

কর্ত্তা হেসে বললেন—সবই ত জানিস মা?

বনলতা বলল—শুধু এইটি জানতাম না যে আপনি রাজি আছেন! কারণ আপনি নিশ্চয় জানেন বড় লোকের ছেলে হলে আর ভাল ডাক্তার হলেই সৎপাত্র হয় না!

কথার এই অতিরিক্ত উগ্রতায় কর্ত্তা একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। বল্লেন—বিনয়ের সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি ভাল নয়?

বনলতা একটুখানি থামলো, পরে অন্যদিকে চেয়ে হঠাৎ বল্ল—পাত্রের স্বভাব-চরিত্র ভাল হবে এ দাবী আমরা সবাই নিশ্চয় করতে পারি!

রুগ্ন হলেও কর্ত্তা একটু কঠিন লোক। বল্লেন—তা পারো, তবে তার একটা অধিকারী-ভেদ আছে। ও জিনিসটা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার

চেয়ে, আমি যদি নিজে নাড়াচাড়া করি তা হলেই মানায়—বুঝলে ছোট মা?

বনলতা বল্‌ল—ভাল লোক কি মন্দ লোক, এ কথা জানবার অধিকারও কি নেই বাবা?

কর্ত্তা আবার হাসলেন,—সেটা খুব ভাল কথা, কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে, এ বিয়ে সার্থক! পাত্রের স্বভাব-চরিত্র কেমন সেটা দেখবার চেয়ে চঞ্চলা এবং বিনয়ের মধ্যে গোড়াকার আসল মিলটি যে আছে এই দেখেই আমি আনন্দিত।

তাতে আপনার ভুলও হতে পারে!—বলে বনলতা উঠে দ্রুতপদে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। আপনার তিক্ততায় নির্বিষ অবরুদ্ধ আস্ফালনে সে একেবারে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে গিয়েছিল। তার আত্মপ্রত্যয়ের প্রতি এই পৃথিবীজোড়া বিরুদ্ধতা ক্ষণে ক্ষণে তার সর্ব্বাঙ্গে যেন শত সহস্র ছুঁচ ফোটাতে লাগলো। পড়বার ঘরের মধ্যে ঢুকছিল কিন্তু চঞ্চলাকে সেখানে বসে থাকতে দেখেই সে অন্যত্র চলে গেল। ঈর্ষা বিদ্বেষ গ্লানি এবং সকলের ওপর চঞ্চলার প্রতি একটা বিজাতীয় হিংসা তার জর্জ্জরিত চোখ-দুটোকে যেন অন্ধ করে দিয়েছিল। চঞ্চলার মুখ পর্য্যন্ত দেখবার ইচ্ছা আর তার নেই। নীচে গেল, কিন্তু পাছে ঠাকুমার সঙ্গে একটা রাগারাগি হয় এজন্য আবার ওপরে উঠে এল। কোথাও যেন শান্তি নেই—বুকের ওপর কে যেন তার অগ্নিদগ্ধ লৌহ দিয়ে খানিকটা পুড়িয়ে দিয়েছে। গোপন করতেও হবে অথচ যাতনারও অন্ত নেই। মাটিতে মাথা ঠুকে ঠুকে আত্মহত্যা করতে পারলে হয়ত খানিকটা স্বস্তি পাওয়া যেত!

রাত্রে দুই বোনে একই ঘরে দুইটি বিছানায় শোয়!

নিঃশব্দে বনলতা বিছানার ওপর পড়েছিল; কয়দিন থেকেই তার চোখে ঘুম নেই, আজও ছিল না। মনে হচ্ছিল বিছানার ওপর কে যেন এক রাশ কাঁকর ছড়িয়ে দিয়ে গেছে—কেবলই ফুট্‌ছে। মাথার মধ্যে কানের মধ্যে যেন অবিশ্রাম ঝিঁঝি ডাকছে। রাত তখন ঘন গভীর। কেউ কোথাও আর জেগে নেই। এত নীরব যে নিজের মনের কথাগুলি তখন স্পষ্ট নিজের কানেই শুনতে পাওয়া যায়। বনলতা চোখ চেয়ে আস্তে আস্তে উঠে বসলো। আলোটা তখনও জলছে। মাথার কাছের জান্‌লা দিয়ে শরতকালের মুখচোরা ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। আকাশে মাত্র গুটি কয়েক মিটমিটে তারা—বাদ্‌বাকি সমস্তটাই আসন্ন বৃষ্টির আভাস জানাচ্ছে। দেয়ালের গায়ে বড় ঘড়িটার টিক্‌

টিক্ শব্দে যেন চারিদিকের নিস্তরঙ্গ নিঃশব্দতাকে অবিশ্রাম বিদ্ধ করে' চলেছে।

আলোটা একটুখানি বাড়িয়ে দিয়ে কি যেন একটা অদ্ভুত খেয়ালের বশে বনলতা ঘরের মধ্যে বার কয়েক পায়চারি করে নিল। ওদিকের বিছানায় চঞ্চলা তখন নিশ্চিন্ত গভীর নিদ্রায় অভিভূত। বোধ করি গরম বোধ হওয়াতে গায়ের কাপড় খুলে দিয়েছে—মাথার খোঁপাও বালিশের ওপর এলিয়ে পড়েছে। বনলতা একবার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। মনে হলো, চঞ্চলা শুধু কালো নয়—কুৎসিৎ! চেহারার মধ্যে এতটুকু শ্রী কোথাও নেই। সর্ব্বাঙ্গে যৌবনের একটি প্রাচুর্য্য আছে বটে কিন্তু এমনতর যৌবন পথে ঘাটে যে কোনো নারীর জীবনেও ত একবার করে' আসে! যৌবনই ত সব নয়—রূপের যে একটি মহৎ আভিজাত্য আছে! চঞ্চলার দৈহিক প্রাচুর্য্যের মধ্যে আত্মতৃপ্তির একটি উদ্দাম পাশবিকতা যেন অতি কষ্টে আত্মগোপন করে' রয়েছে।

ঘৃণায় নাসাকুঞ্চন করে' মুখ ফেরাতেই চোখ পড়লো বড় আয়নাটার ওপর। তাই ত, একি সে! আজকের এই বিশ্বব্যাপী নিবিড় তামসী রাত্রির সে যেন প্রাণ-প্রতিমা! নিজের এতখানি রূপ সে ত কই নিজেও কোনোদিন দেখেনি! কিন্তু মনে হল, জ্বলন্ত অগ্নিশিখা সদৃশ তার রূপের ওপর দিয়ে যেন একটা মদমত্ত ঝঞ্চা বয়ে গেছে। মাথার রুক্ষ বিস্তৃত চুলের রাশি যেন লক্ষ লক্ষ ফণায় কাকে দংশন করবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে ঝুলে পড়েছে। বনলতা কাছে সরে এল। কাছে এসে দেখলো হিংসার মাধুর্য্য চোখদুটিকে আরো যেন অপরূপ করে' তুলেছে, অধরে একটি তীক্ষ্ণ তিক্ত হাসি—এ হাসি এমনি মধুর যে একে বিদায় দিতেও মন ওঠে না! আর রূপ! সে ত' প্রভাত-সূর্য্যকেও লজ্জা দিতে পারে।

বনলতা আরো কাছে সরে গেল। আপনার অপরিমিত যৌবনের প্রতিবিম্বকে সে যেন কিছুতেই আর এড়াতে পারছিল না। আপাদমস্তক নগ্নতার প্রতি চেয়ে থাকার বাধাও কিছু নেই। মনে হলো, সুকোমল পেলব দুখানি বাহুমূলের পাশে দু'টি উন্নত সুগোল বুকের ওপর বড় বড় দু' ফোঁটা রক্ত জমে আছে। তার সমস্ত দেহখানি যেন মানুষের একটি শ্রেষ্ঠ মরণ-শয্যা! অধীর উদ্দাম আবেগে সারা ঘরময় পায়চারি করে' করে' আপনার অবারণ দেহখানিকে বনলতা দুই হাতে পীড়ন করতে লাগলো।

এত রূপ তার, তবে কেন রূপের প্রতিযোগিতায় চঞ্চলার কাছে সে এমন

তুচ্ছ হয়ে গেল? যে অপমান আজ তাকে সইতে হচ্ছে এ ত শুধু তার দেহের প্রতি! যে দেহ বিধাতারও বিস্ময়!

স্ফীতনাসায় বনলতার বিষাক্ত নিশ্বাস পড়ছিল। মেঝের উপর থেকে আস্তে আস্তে পরনের কাপড়খানা সে তুলে' গায়ে জড়াতে লাগলো!

সেদিনের সেই অন্ধকার নিঃশব্দ রাত্রেই; লোক চক্ষুর আড়ালে,—নিতান্ত গোপনে।

দরজা খুলে নিঃশব্দে বনলতা রাস্তায় নেমে এল। পথের ওপর দিয়ে সোঁ সোঁ করে' রাত্রির হাওয়া বয়ে যাচ্ছিল। গলির মোড়ে টিম্ টিম্ করে' তেলের আলোটা জ্বলছে।

ডাক্তারের দরজায় উঠে সে অতি সন্তর্পণে কড়া নাড়লো। ভিতর থেকে তখুনি সাড়া এল—কে?

খুলুন ত একবার?

তাড়াতাড়ি এসে দরজা খুলেই বিনয় ভয়ানক চম্‌কে উঠলো। বল্‌ল—একি, আপনি? কি ভাগ্যি আমার? বাবা আপনার ভাল আছেন ত?

বনলতার গলা বন্ধ হয়ে আসছিল। বলল—হ্যাঁ, আপনি এখনো নীচে রয়েছেন?

আজকাল রাত জেগে একটু পড়াশুনো করতে হচ্ছে, রোজই প্রায় ভোর হয়ে যায়। আপনি এ সময় যে? কি ব্যাপার?

বনলতা মাথা হেঁট করে' রইল। বিনয় কিছুই বুঝতে পারল না, নিতান্ত বেয়াকুবের মত স্তম্ভিত হয়ে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়িয়ে অকস্মাৎ বিস্মিত কণ্ঠে বলল—ওকি, আপনি কাঁদচেন কেন?

অশ্রুসিক্ত মুখখানি তুলে সোজা কথাটাই বনলতা বলে ফেল্‌লো—আমিই ত হেরে গেলাম। তুমি নাকি দিদিকে বিয়ে করবে? সে কি তোমার যোগ্য?

আমার যোগ্য তবে কে?

জানিনে। দিদিকে তোমার বিয়ে করা হবে না। সে তোমার উপযুক্ত নয়।

হতচকিত বিনয়ের মুখের ওপর কথাটা বলেই ফুল্‌তে ফুল্‌তে সে আবার এসে নিজেদের বাড়ীতে ঢুক্‌লো।

কোনো একরাত্রে

ঘরের জান্‌লায় গরাদ নেই ; কোন্‌ অতীতকালে গৃহস্থের অত্যাচারে গরাদগুলি আত্মরক্ষা করতে পারেনি, তারা ধ্বংস হয়েছে। পল্লীগ্রামের এই অন্ধকার রাত্রে যদি কোন বন্য জন্তু গুটি গুটি এসে জান্‌লা দিয়ে ঢোকে তবে তাকে বাধা দেওয়া যাবেনা। দরজাগুলির পাল্লা নেই, সম্ভবতঃ জনহীন পুরী দেখে গ্রামের লোকেই সেগুলি খুলে নিয়ে গেছে। বাতাসের শব্দে মনে হচ্ছে, বিগত দিনের মত নরনারীর শেষ নিশ্বাস এখনো বুঝি মিলিয়ে যায়নি ; আজো তারা জীবনের কিছু প্রত্যাশা নিয়ে অশরীরী হয়ে রয়েছে। নির্জ্জন অন্ধকারে আমি একবার মুখ ফিরিয়ে দেখলাম। দেখলাম না কিছুই, কিন্তু চামচিকার পাখার শব্দটা এখনো শুনতে পাচ্ছি,—শুনতে পাচ্ছি ঘরের কড়িকাঠে পোকা এখনো ঘুরে ঘুরে খাচ্ছে ; ভিতরের দেয়ালে যে ছোট বটগাছটা শিকড় বিস্তার ক'রে মেঝের দিকে নেমে এসেছে, তার একটি শাখা গলা বাড়িয়ে আকাশের দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করছে,—তারই তলায় কোথায় ডাকছে ঝিঁঝিঁ, কোথায় শুনছি নানা পোকার সশব্দ জটলা,—অন্ধকারকে তারা যেন গভীর ভাষায় ভরে তুলছে, যেন নিশীথ রাত্রির আত্মার বাণী।

একান্তে একটি বিছানা পেতেছি, ভাবছি মশারি টাঙ্গানো নিতান্তই দরকার। এখানে বাস করবার আয়োজন নেই, থাকবার কথাও নয় ; আজ বিকাল বেলায়ও এই অকল্পিত নির্ব্বাসনের সুদূর সম্ভাবনাও জানা যায়নি। মোমবাতি একটুখানি ছিল, সেটুকু জ্বলে জ্বলে শেষ হয়ে গেছে। দেশলাইটা বার বার জ্বালতে ভয় হচ্ছে—অন্ধকারের মধ্যে বসে নিজেকে প্রকাশ করতে বুকের মধ্যে টিপ টিপ করে। হাঁ, আমি নার্ভাস। আত্মপ্রকাশ করতে আমার ভয় লাগছে।

ভগ্ন জীর্ণ জনহীন প্রাসাদের একখানি কঙ্কাল—সুমুখে খানিকটা খোলা মাঠ, তারই উপর কয়েকটা নিষ্ফল নারিকেল গাছ ভূতের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদেরই অদূরে একটা বাঁশের বন। এতক্ষণে পথের ধারে একটি আলোকের রেখা দেখা গেল ; সে আলো নিকটতর হয়ে আসছে। একটু আশ্বস্ত হলাম।

আলোটা এসে ঢুকলো অন্দরে, সোজা উঠান পার হয়ে চৌকাঠ ডিঙিয়ে এসে দাঁড়ালো আমার কাছে। এতক্ষণ যেন অভিভূত হয়েছিলাম, এবার বললাম, মশারি এনেছ?

চন্দ্রনাথ একটু হাস্‌লো। বললে, এরা কাছাকাছি থাকে কিন্তু কামড়ায় না। তোমার এত প্রাণের ভয়?

—প্রাণের ভয় নয়, সাপের ভয়!

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পুনরায় বললাম, তোমার জন্যে, এবার বুঝেছি তোমার জন্যে গাড়ী ফেল হয়ে গেল। আমি চলে যেতে পারতাম, পৌঁছতে পারতাম এতক্ষণে নিজের দেশে, শহরে—এ শাস্তি হলো কেবল তোমার জন্যে।

চন্দ্রনাথ বললে, সবই নিয়তির কাণ্ড, বুঝলে হে?

—চুপ, তুমি চুপ কর চন্দ্রনাথ; তুমি যা বলো শুন্‌বো, শুন্‌বো না তোমার নিয়তি, তোমার দর্শন, তোমার প্রলাপ; তুমি চুপ করো চন্দ্রনাথ।

চন্দ্রনাথ বললে, মশারি এনেছি আলোটাও নিয়ে এলাম তোমার জন্যে। তোমার যেন কষ্ট না হয়; কারণ তুমি অতিথি।

—বেশ, আর কিছু দরকার নেই, এবার তুমি যাও। না না, গল্প করতে আমি ভালবাসিনে ও আমার রুচি নয়। এবার তুমি যাও।

—যাবো কোথায়, আমি যে থাকতে এলাম—

—থাকতে এলে? মানে? থাকতে চাও তুমি আমার কাছে?—বলতে বলতে সোজা হয়ে বসলাম,—তোমাকে আমি সহ্য করতে পারিনে চন্দ্রনাথ, তোমার দিকে তাকালে ভয়ে আমার গলা বুজে আসে, হতাশায় আমার চোখ কাঁপে,—তুমি চলে যাও, তুমি থাকলে এই অন্ধকার আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে; তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাও।

ভিজা তবলার উপর হাত চাপড়ালে যেমন তার শব্দ হয় তেমনি আমাদের দুজনের গলার আওয়াজ এই ভগ্ন কক্ষের কোণে-কোণে ঢব্‌ ঢব্‌ করতে লাগলো। চন্দ্রনাথ বল্লে, হ্যাঁ, মতলব আমার একটু ছিল; ইচ্ছে ছিল ট্রেণটা যেন তোমার ফস্‌কে যায়, অনেক দিন তোমার সঙ্গে গল্প করিনি।

—গল্প করবো তোমার সঙ্গে? কেমন গল্প সে?

—কিন্তু আগে ত তুমি বেশ গল্প করতে আমার সঙ্গে?

—আগে করতাম, এখন নয়। আগে মানুষের উপর তোমার শ্রদ্ধা ছিল,

তুমি মূল্য বুঝতে স্নেহ-মমতার—থাক চন্দ্রনাথ, সে তোমার গত জন্ম, তুমি সেদিন মানুষের মধ্যে মানুষ ছিলে। কিন্তু আজ তুমি যাও, তুমি কাছে থাকলে আমার সব আশা, সব স্বপ্ন চুরমার হয়ে যায়।

—স্বপ্ন ?—চন্দ্রনাথ ঠোঁট উল্‌টে আবার হাস্‌ল। আমি চিনি তার হাসি, তার হাসির বাহ্য চেহারাটা নির্ম্মল ও মধুর কিন্তু সে হাসির প্রাণ বিষে ভরা, বিদ্রূপে জর্জ্জরিত অপরিসীম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মেশানো অপরিমিত অবিশ্বাস। বললে, এখনো স্বপ্ন দেখছো নাকি ?

—হ্যাঁ, দেখছি, লজ্জা কিছু নেই। স্বপ্ন দেখছি ; বিংশ শতাব্দীতে এখনো স্বপ্ন দেখি, প্রাচীন বলে তাকে ঠাট্টা করবে, এই ত ? করো। আমার হৃদয়ে আছে সম্বল, তাকে আমি মরতে দেবো না চন্দ্রনাথ।

চন্দ্রনাথ বললে, আমার কথা তাহলে তুমি শুনবে না, কেমন ?

—না—আমি বললাম, শোনবার মতো কথা তোমার কিছু নেই। জানি তুমি যা বলবে ; তোমার মনের চেহারা আমি জানি, এই রাত্রির চেয়েও তুমি ভয়ঙ্কর। তোমার কাছে এলে আমার সব বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায়। নির্ম্মূল হয়ে যায় আমার যা কিছু—

—কিন্তু তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন ?

—ভয় পাই, ঝড় এলে যেমন ভয় পায় গাছপালা, আগুন জ্বলে উঠলে যেমন ভয় পায় বাতাস ; চন্দ্রনাথ, তোমাকে দেখলে মনে হয়, জীবনের কোনো অর্থ নেই ; বন্ধুত্ব, বাৎসল্য, দয়া, প্রেম সব নিরর্থক।

চন্দ্রনাথ আড় হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো। তারপর একটু হেসে বললে, তুমি বড় দুর্ব্বল হে, বড় ভঙ্গুর।

—হ্যাঁ, বড় দুর্ব্বল, বড় ভঙ্গুর। এই ভালো, বেশ আছি। আমি বুঝতে চাইনে তোমার সহজ কথাটা শাদা চোখে। আমি বুঝতে চাইনে তোমার ইউটিলিটির কথা। আমার চোখে থাকুক কাজল, মনে থাকুক রঙ, আমার ভাল লাগে মেঘের মায়া, গাছের ছায়া। তুমি আমাকে বারে বারে মরুভূমির পথ দেখিয়ে দিয়ো না চন্দ্রনাথ।

চন্দ্রনাথ বললে, তোমার মন দেখছি বুদ্ধির আলোয় উজ্জ্বল নয়।

—না হোক—আমি বললাম,—বুদ্ধির সঙ্গে বুদ্ধির উদ্ধত তাল-ঠোকাঠুকি। সেখানে কোথাও প্রাণের ঐশ্বর্য্য নেই, সেখানে কেবল বস্তুর ভার, লগেজের উপরে লগেজ, আঘাতে আর সংঘাতে উৎপীড়িত।

—কিন্তু তোমার ভাল লাগে কি, শুনি ?

—তোমাকে সে সব কথা বলতে প্রবৃত্তি হয় না, চন্দ্রনাথ তুমি তার অধিকারী নও। এমন কথা যে বলে প্রেমের ফুল ফোটে দেহ-লালসার জীব থেকে, যে কোনো মহাত্মার জন্ম বৃত্তান্ত অতি কলঙ্কময়—তার সঙ্গে আমার তর্ক নেই। আমি একথা জান্‌তে চাইনে সূর্য্যকিরণ মানে বিশ্বপ্রকৃতির প্রাণধারণের রস, মেঘ মানে শস্যক্ষেত্রের ইউটিলিট, নদী মানে লোকের তৃষ্ণার জল !

—আর প্রেম ? বিদ্রূপ করে হেসে বললে চন্দ্রনাথ।—শুন্‌বে আমি একটা বেশ জুতসই প্রেমের গল্প বলবো ?

—না, না চন্দ্রনাথ, না। সব সইবে, কিন্তু সইবে না তোমার প্রেমের গল্প। তুমি আমাকে বোঝাতে চেয়ো না, প্রেম মানে বিধাতার জীবসৃষ্টির চক্রান্ত। বোঝাতে চেয়ো না পরস্পরের স্নায়ুতন্ত্রিক উত্তেজনা, ইমোশুন মানে শিরার সঙ্গে শিরার কলহ-কোলাহল।

চন্দ্রনাথ বললে, কিন্তু হৃদয় বলে নাকি একটা পদার্থ আছে তোমাদের।

রাত্রি হয়ত বা শেষ হয়ে এসেছিল। বহু চেষ্টা করলাম চন্দ্রনাথকে বিতাড়িত করবার জন্য। সে গেল না, অপমান করলেও সে মানে না। আলোটা জলতে লাগলো, মশারী টাঙ্গানো হলো না, সেও বসে রইলো চুপ করে। তার মতো চরিত্রবান মানুষ আমি দেখিনি, কিন্তু চরিত্রই তার উন্নতির পক্ষে বাধা, সৌজন্যের জন্যই সংসার থেকে সে বরখাস্ত হয়েছে।

—এই যারা বড় হয়েছে তাদের সত্যিকার ইতিহাস তুমি জানো ? যাদের নাম ছাপালে খবরের কাগজ বিক্রী হয়, যারা হয় বড়-বড় সভার সভাপতি, রাষ্ট্রনেতা বলে যারা নিজেদের নাম জাহির করেছে, সমাজ-সংস্কারক বলে যারা পরিচিত। তাদের কথা বলব তোমাদের কাছে ? —চন্দ্রনাথ বলতে লাগলো, নাম শুন্‌লেই তুমি চিনবে তাদের ? প্রতিদিনের জীবনে কি দৈন্য আর ক্ষুদ্রতা, তুমি শুন্‌লে অবাক হয়ে যাবে।

বললাম, এর দ্বারা তুমি কি বলতে চাও ?

—বলতে কিছুই চাইনে ; দেখি, তাই বলে যাই। ইচ্ছে যায় তোমাদের সমালোচনা করতে। বড় হলেই বড় হওয়া যায় না। বড় মানুষ তুমি দেখেছ ? জানো বড় মানুষ কাকে বলে ?

—যাক চন্দ্রনাথ, উত্তেজনায় তুমি হয়ত সীমা ছাড়িয়ে যাবে, তুমি সীমা ছাড়ালেই আমি যাবো ভেসে। এখন বলো তোমার প্রেমের গল্প।

—কাহিনীই আছে কিন্তু প্রেম নয়—চন্দ্রনাথ বললে, সেই কিস্তি আর সেই কিস্তিমাৎ, সেই চিরপুরাতন, কেবল চালের তফাৎ, কেবল তফাৎ ঘটনার—

—তবুত সবাই শুন্‌তে চায় চন্দ্রনাথ!

—শুন্‌তে চায়, তার কারণ, মানুষ যে কখনো পুরোনো হয় না মানুষের কাছে, আনন্দ বেদনার নানা চেহারা, নানান ষ্টাইল, সে ত তুমি জানো!

এমনিই চন্দ্রনাথ জীবনে দেখেছে অনেক, তাই তাকে ভয় করে। তার অনেক অভিজ্ঞতা, অনেক ইতিহাস, অনেক সহ্য করেছে সে, সাধারণ মানুষ তাই তাকে সহ্য করতে পারে না, ভয় পায়। মানুষের কোনো ত্রুটি তার চোখ এড়ায় না, মনে হয় সে যেন সমস্তই জানে, সমস্তই বোঝে।

তুমি কি পেয়েছ এতকাল?—চন্দ্রনাথ বলতে লাগলো, অনেক ত ভালোবেসেছ, অনেক দোলায় দুলেছ, কী পেয়েছ বলো ত?

বললাম, পাবার জন্যই বা এত লালায়িত কেন? না পেলেও ত চলে যায় মানুষের।

—চলে না। ব'লে চন্দ্রনাথ কিয়ৎক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর এক সময় বললে, চলে না হে, চলে না; কিন্তু দোষ কার জানো?—তোমার! মরুভূমির উপর দিয়ে ত মেঘ চলে যায় কিন্তু দোষ মেঘের নয়, তোমার। তুমি কেবল ফাঁকি দিলে, কেবল আত্মপ্রবঞ্চনা, কেবল রইলে জ্ঞানের অভিমান নিয়ে, বুদ্ধির দম্ভ নিয়ে। তোমার উপর বর্ষণ হবে কেমন করে? কী আছে তোমার সম্বল?

নীরবে বসে রইলাম। হঠাৎ পুনরায় উত্তেজিত হয়ে চন্দ্রনাথ বললে, তোমারি কি কম গলদ? কেবল ভঙ্গি, কেবল কসরৎ, এক ছটাকও পুঁজি তোমার নেই। ওপরে তোমার যত পালিশ ভেতরে তত দৈন্য: কাঁচের মতো তুমি সৌখীন, পার্শী মেয়ের মতো তোমার সাজসজ্জার চটক, কেবল বিজ্ঞাপন, শুধু আড়ম্বর—সত্যকার জীবনের সঙ্গে তোমাদের কোন পরিচয় নেই। পুঁথিগত বিদ্যে তোমাদের, তোমরা জীবনের ব্যাখ্যা করো চায়ের দোকানে বসে। মিথ্যা নিয়ে পরের মুখের বুকনি নিয়ে তোমাদের ফলাও কাজ কারবার।

এবার সে চুপ করলো, আমিও বাঁচলাম। মানুষ নেশার মুখেও এর চেয়ে যুক্তিযুক্ত কথা বলে। চন্দ্রনাথের মাথার একটা স্ক্রু আলগা রেখে বিধাতা তার সঙ্গে একটু বিদ্রূপ করেছেন।

ভোর হয়ে এল বোধ হয়, বাঁশের বন একটু-একটু স্বচ্ছ হয়ে আসছে। বললাম, প্রথম ট্রেণেই আমি যাবো কিন্তু, সাড়ে ছ'টায় গাড়ী নয় ?

চন্দ্রনাথ বললে, হ্যাঁ, একটু ঘুমোও, আমি ঠিক সময় জাগিয়ে দেবো। মশারীটা এবার ফেলে দিই, কেমন ? বলে সে বেমক্কার মতো চোখ বুজে পাশ ফিরে ঘুমুলো।

কল্পান্ত

ছোড়দিদির বাড়ীটা ছিল বেলেঘাটার শেষপ্রান্তে। এমন একটা ঠিকানা, যেটা খুঁজে বা'র করতে অমলকে বিশেষ বেগ পেতে হোলো। অমলের বন্ধু নৃপেন নাগপুর থেকে চিঠি লিখে জানিয়েছে, তোরা যদি জাপানীদের ভয়ে নিতান্তই কলকাতা ছেড়ে পালাস, তবে আমার ছোড়দি বেচারীকেও যেখানে হোক নিয়ে যাস, ও বেচারীর কেউ নেই।

অমল ভয় পায়নি, কিন্তু বাঙ্গলার গভর্ণমেণ্ট ভয় পেয়েছিল। সিঙ্গাপুরের পতনের পরেই গভর্ণমেণ্ট কাঁপতে কাঁপতে জানালো, যারা কোন সরকারী কাজ করে না, তারা পালিয়ে যাক্। সুতরাং লক্ষ লক্ষ লোকের মতন অমলও তার বাড়ীর লোকদের এখানে ওখানে সরাতে লাগলো। কেউ কাশী, কেউ পাটনা, কেউ বর্ধমান, কেউ বা রাণাঘাট।

নৃপেনের চিঠিতে ছোড়দিদির ঠিকানাটা ঠিকই ছিল, তবে সহরতলীর গলি-ঘুঁজি পেরিয়ে নাম নম্বরহীন বাড়ীটা খুঁজে পেতে বেলা অনেক বেড়ে গেল। তখন শীতের শেষ।

বন্ধুর সহোদরাকে অমলও ছোটবেলা থেকে ছোড়দিদি ব'লে ডাকে। তবে এটা ছোড়দিদির শ্বশুরবাড়ী। এ বাড়ীতে সটান ঢোকবার আগে অমল বাইরে থেকে ডাকলো, কেউ আছেন নাকি?

ডাকাডাকি করতে করতে বছর পনেরো বয়সের একটি ফুটফুটে মেয়ে দরজার কাছাকাছি এসে বললে, কে?

আমি অমল, ছোড়দিদি আছেন?

তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে গেল। মেয়েটি হাসিমুখ বাড়িয়ে বললে, একি, অমল মামা, কী ভাগ্যি আমাদের? আসুন?

অমল ভিতরে ঢুকে বললে, কেমন আছিস তোরা টুনু? এখনও পালাসনি?

কোথায় পালাবো বলুন? এপাড়ায় ত সবাই চলে গেছে। আমরা এখনও আছি, সন্ধ্যের পরে কী ভয় করে?

ভয় কা'কে রে?

কেন, চোরের ভয়?

অমল বললে, পাগলি চোরের প্রাণভয় আরো বেশী,—তারাও পালিয়ে গেছে সকলের সঙ্গে।

টুনু হাসতে লাগলো।

এমন সময় মাথায় ঘোমটা টেনে ছোড়দিদি এলেন। তিনি বিধবা, বয়স আন্দাজ বছর পঁয়ত্রিশ হবে। তিনি শান্ত নম্র কণ্ঠে বললেন, এসো ভাই—দিদিকে মনে পড়লো?

অমল নৃপেনের চিঠিখানা বা'র ক'রে বললে, আমাদের সঙ্গে সে আপনাকে যেতে বলেছে। নৃপেন খুব ব্যস্ত হয়েছে আপনাদের জন্য।

ছোড়দিদি প্রশ্ন করলেন, সবাই বুঝি পালাচ্ছ? তোমার ভাই বোনেরাও?

অমল বললে, হ্যাঁ, এক একদলে এক একদিকে পালিয়েছে, তবে কাকা আর কাকীমা এখনও যাননি।

তোমার বাবা?

অমর বললে, বাবা ত এখানে থাকেন না। মা মারা যাবার পর থেকেই তিনি কাশী গিয়ে হোমিওপ্যাথী ডাক্তারী করেন। আপনার এখানে আর কাউকে দেখছিনে যে? আপনার ভাসুর কই?

ছোড়দিদি নত নম্র মুখে বললেন, তিনি সপরিবারে চ'লে গেছেন নলহাটি। বড় তরফের ওঁরাও আজ আটদিন হোলো পালিয়ে গেছেন।

অমল বললে, আপনার দিদিশাশুড়ী আর রাঙ্গাদিদিরা?

তাঁরা ছেলেমেয়েদের সবাইকে নিয়ে গেছেন মালদা।

সহসা অমল একটু চাপা অভিমানে ফুলে উঠলো। বললে, নৃপেন আমাকে সবদিক ভেবেই লিখেছে। আচ্ছা ছোড়দিদি, সত্যি বলুন ত?

সস্নেহ শান্ত হেসে ছোড়দিদি বললেন, কি ভাই?

অমল বললে, এটা আপনার শ্বশুরের ভিটে, এখানে দাঁড়িয়ে কারো নিন্দে করতে চাইনে! কিন্তু এখন বুঝতে পাচ্ছি, আপনাকে ফেলে সবাই পালিয়েছে! আপনি বিধবা, সহায় সম্বল নেই, আপনি লোকের বোঝা।

ছি ভাই অমল, এসব কথা বলতে নেই!

কেন বলবোনা ছোড়দি?—অমল বললে, আপনি হিন্দুঘরের বিধবা, পরের দয়ায় মেয়েটাকে খাইয়ে পরিয়ে আপনার দিন কাটে, আপনার জন্য পাঁচসের আলোচাল দিতে ওঁদের গায়ে লাগে, চিরদিন ওঁদের অনাচার আপনি মুখবুজে সইলেন—

অমল। যাক্ ভাই ওসব কথা।

অমল বললে, ছোড়দি আমাকে ক্ষমা করুন। এখানে দাঁড়িয়ে কিছু বলা আমার অধিকারের বাইরে, আপনি হয়ত পছন্দ করবেন না। কিন্তু যারা পালিয়ে গেল তাদের প্রাণের চেয়ে আপনার আর টুনুর প্রাণের দাম কি কম?

ক্ষোভে ও সমবেদনায় অমলের চোখ দুটো বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এলো। ছোড়দিদি কিয়ৎক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইলেন। সহসা এক সময়ে সহাস্য মিষ্টকণ্ঠে বললেন, তুমি একটা কথা ভেবে দেখনি ভাই, আমরা চলে গেলে এবাড়ী যে একেবারে খালি! এত বড় পুরোনো বাড়ী…দক্ষিণ দিকে পাঁচিল নেই…সন্ধ্যেয় আলো পড়বে না—আমার গেলে চলবে কেন ভাই?

অমল বললে, কিন্তু একা এখানে থাকলে আপনার চলবে কেমন ক'রে ছোড়দি? তা ছাড়া টুনু এখন একটু বড় হয়েছে।

ছোড়দিদি বললেন, সেই জন্যই আরো কোথাও যেতে সাহস নেই ভাই। এত বড় মেয়ে নিয়ে কোথায় ঘুরে বেড়াতে যাবো বলো? বরং ভাত কাপড় না জোটে, নিজেদের পড়ো ঘরখানার মধ্যে ত' পড়ে থাকতে পারবো? তাতে মান বাঁচবে—কেউ দেখতেও আসছে না।

এমন সময় টুনু এক পেয়ালা চা হাতে নিয়ে এলো। হেসে বললে, ভাই-বোনে দেখা হলে আর রক্ষে নেই। বক্তৃতা চলছে ত? এবার—আপনি কবে পালাচ্ছেন বলুন ত অমল মামা?

আমি কোথাও যাব না টুনু।

যাবেন না, তা'হলে আমাদের এখানে মাঝে মাঝে আসবেন ত?

অমল হেসে বললে, জাপানীরা যদি না আসে তবে এক আধবার আসবো বৈকি।

ছোড়দিদি আর টুনু দুজনেই হেসে উঠলো। মা'য়ের পাশে ব'সে বললে, অমল মামা, এবার কিন্তু একটা মজা দেখলুম। সবাই পালাচ্ছে বটে—মেয়েরা কিন্তু একটুও ভয় পায়নি। তারা সবাই হেসে আর আমোদে কুটিকুটি। পুরুষমানুষরাই ভয় পেয়ে দৌড় দিচ্ছে, আর মেয়েদের ঘাড়ে নিয়ে ছুটছে, তাই না?

অমল হাসিমুখে টুনুর দিকে তাকাল। টুনু পুনরায় বললে, মেয়েরা বেশ মজা পেয়ে গেছে এবার। এই দেখুন না, ওবাড়ীর লোকেরা তিরিশ টাকা

দিয়ে এক একখানা গরুর গাড়ী ভাড়া করে আনলো—এখান থেকে হাওড়া ইষ্টিশান। মেজগিন্নী সঙ্গে নিল টিয়াপাখী, মেনিবেড়াল, এক প্যাকেট তাস, একটা লুডুর সেট···তারপর কত যে শাড়ী আর জামা—

অমল বললে, তোমার ভয় করে না, টুনু ?

আমার ? একটু না। ভয় করলেই ভয় বাড়ে।

যদি জাপানীরা বোমা ফেলে, কিংবা আক্রমণ করে ?

করুক।

তখন কি করবে তুমি ?

টুনু বললে, ইংরেজরা কি করবে তাই আগে শুনি ?

ছোড়দিদি ও অমল দু'জনেই খুব হেসে উঠলো।

অমল এই অবসরে চারিদিকে একবার তাকালো। এককালে অবস্থা এদের বেশ ভালোই ছিল কিন্তু ভাঙতে ভাঙতে এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, জীবনযাত্রাটা এখন দুরূহ হয়ে উঠেছে। দারিদ্র্য আর অনটন এবাড়ীর সর্বত্র সুস্পষ্ট। উপার্জনের কেউ নেই, অদূরভবিষ্যতে যে সুদীর্ঘ দুঃসময় আসছে—সে অবস্থাটাকে প্রতিরোধ ক'রে শক্ত হয়ে হাল ধরার মতো মানুষও নেই। এই দুটি নারীর দিন কেমন ক'রে কাটবে বলা কঠিন।

কি কথা ব'লে অমল তখনকার মতো বিদায় নেবে ভাবছে এমন সময় খিড়কি দরজা পেরিয়ে একটা বৃদ্ধা ন্যুব্জদেহে কাঁপতে কাঁপতে এই দিকে এলেন। তাঁকে দেখে ছোড়দিদি একটু ঘোমটা টেনে উঠে দাঁড়িয়ে মৃদুকণ্ঠে বললেন, তুমি একটু বসো ভাই, ঠাকুরঘরের পূজোটা সেরে আসি। টুনু, মামার কাছে একটু বোস মা।

বৃদ্ধা এসে বললেন, এ ছেলেটি কে, ভাই ?

টুনু বললে, আমার মেজমামার বন্ধু,—অমলমামা।

ও, তা বেশ। একটু কিছু খেতে দেনা দিদি! ওই যে সেই মুগের নাড়ু আছে ঘরে···ওই যে সেদিন দিয়ে গেল ওবাড়ীর ন'বৌ—

আচ্ছা দেবো, তুমি কাপড় ছাড়োগে' রাঙাদিদি—

বুড়ী ধীরে ধীরে চলে গেল। এই প্রাচীন ভগ্ন অট্টালিকার কোন অন্ধ গহ্বরের দিকে গিয়ে বুড়ি ঢুকলো,—আর তা'র সন্ধান পাওয়া গেল না।

টুনু বললে, অমলমামা, আপনাকে কিন্তু কিছুই খেতে দিতে পারবো না।

টুনুর সলজ্জ নতমুখের দিকে তাকিয়ে একটু বিপন্নভাবে অমল বললে,

খাবার কথা ভাবছো কেন? এইত চা খেলুম, আবার কি! এবার আমি উঠবো, টুনু—

কিয়ৎক্ষণ পরে ছোড়দিদি শান্ত পদক্ষেপে এসে দাঁড়ালেন। অমল বললে, তাহ'লে আমি নৃপেনকে কি লিখবো, ছোড়দি?

ছোড়দিদি বললেন, তুমি লিখে দিয়ো আমরা বেশ ভালো আছি!

আপনারা তাহ'লে কোথাও যাচ্ছেন না?

হাসিমুখে ছোড়দিদি বললেন, ভগবান কি করবেন তা ত' আর জানিনে ভাই। তাঁর মনে কি আছে তাও বুঝিনে, তবে আপাততঃ এখান থেকে কোথাও যাবার উপায় আমাদের নেই।

অমল বললে, অবিশ্যি প্রাণভয়ে এখানে ওখানে পালিয়ে বেড়ানোর চেয়ে এক জায়গায় শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাই ভালো।

ছোড়দিদি হেসে বললেন, পালাবার মতন টাকাও আমাদের নেই। তা ছাড়া অত বড় মেয়ে সঙ্গে নিয়ে কোথায় যাবো ভাই? দিনকাল একেই ত' ভালো নয়,—চারদিকে মিলিটারি। কিছু একটা ঘটলে শ্বশুরবাড়ী, বাপের বাড়ী—সকলেরই বদনাম। তুমি নৃপেনকে লিখে দিয়ো অমল, আমরা কোথায়ও যাবো না।

আচ্ছা, আমি তবে এখন উঠি ছোড়দি—এই ব'লে অমল উঠে দাঁড়ালো। হেসে পুনরায় বললে, টুনু, জাপানীরা যদি আসে তাহ'লে কান ম'লেই তাড়িয়ো, কেমন?

টুনু বললে, হ্যাঁ অমলমামা, ভাঙ্গা বন্দুকের বদলে ভাঙ্গা বঁটিখানা রইলো ঘরে। ওরা তা'তেই ভয়ে পালাবে।

অমল হাসিমুখে বেরিয়ে সদর দরজা অবধি গেল, তারপর সহসা কি মনে ক'রে ফিরে এলো। বললে, ছোড়দি, আসল কথাটাই ভুলে গেছি।

কি ভাই?

নাগপুর থেকে নৃপেন পঁচিশটে টাকা পাঠিয়েছে আপনাকে দেবার জন্যে— এই নিন। এই ব'লে অমল পকেট থেকে টাকা বা'র করলো।

ছোড়দিদি বললেন, আমার এখানে না পাঠিয়ে তোমার কাছে পাঠালো কেন? সত্যি নৃপেন পাঠিয়েছে ত?

নিজের মুখের ভাব যথাসাধ্য গোপন ক'রে অমল হেসে উঠলো। বললে,

সে কি আর জানে আপনি এখানে এখনো আছেন? হয়ত পালিয়ে গেছেন কোথাও, সে মনে করেছে!

ভ্রূকুঞ্চন ক'রে ছোড়দি কি যেন ভাবলেন পরে বললেন, হ্যাঁ, এটা বিশ্বাসযোগ্য! 'আচ্ছা,—খুব উপকার করলে তুমি, ভাই।

টাকা দিয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে অমল সেদিনকার মতো তাড়াতাড়ি বেরিয়ে চ'লে গেল। পাছে হঠাৎ পিছন থেকে ডেকে ছোড়দিদি কি মনে ক'রে পঁচিশটে টাকা ফেরৎ দেন—এজন্য অমল হন্ হন্ ক'রে গলির বাঁকে এক দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ফেব্রুয়ারী মাস থেকে দেশের ইতিহাসটা বদলাতে লাগলো! মাঝখানে কিছুদিনের জন্য বিদেশ থেকে ঘুরে এসে অমল দেখলো, কলকাতা থেকে বেশীর ভাগ লোক একেবারেই পালিয়েছে। পথে সন্ধ্যার আলো জ্বলে না, রাত্রের দিকে রাজপথের মাঝখান দিয়ে চলতে গেলে গা ছম ছম করে। দিনের বেলা উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার যতদূর দেখা যায়—পথ ঘাট জনবিরল। হাজার হাজার বাড়ীঘর শূন্য, দোকানপাট নিশ্চিহ্ন! দিবালোকে তখন দেশীয় লোকের পালায়, আর রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ইউরোপীয়রা পালায় স্পেশাল্ ট্রেণযোগে। মৃত্যুভয়ভীত, আতঙ্কিত সন্ত্রস্ত জনসাধারণ।

অমল আর ছোড়দিদিদের ওখানে গেল না। বোমা যখন পড়েনি, এবং জাপানীরাও ঢাল-তলোয়ার নিয়ে এসে পৌঁছয়নি তখন যেমন ক'রেই হোক তাদের দিন কেটে যাচ্ছে বৈকি। অনেক দিন পরে নৃপেনের কাছ থেকে অমল একখানা চিঠি পেলো, নৃপেন নাগপুর থেকে বিশেষ মিলিটারী কাজে বোম্বাই চ'লে গেছে। যুদ্ধ থামার আগে হয়ত সে আর কলকাতায় ফিরতে পারবে না!

তখন বর্ষাকাল, ভারতবর্ষব্যাপী রাষ্ট্রবিপ্লব চলছে। দেশের সর্বত্র হত্যাকাণ্ড, অরাজকতা ও সম্পত্তিনাশ ঘটছে। অমল ভাবলো, ছোড়দিদিরা মেয়েছেলে, সুতরাং দুশ্চিন্তার কারণ নেই। তা'র নিজের বাড়ীতে প্রায় সকলেই ফিরে এসেছে। জাপানীরা বর্মা দখল ক'রে বিশ্রাম নিচ্ছে, এক আধবার বোমা ফেলে যাচ্ছে ভারতের এখানে ওখানে,—এর বেশী কিছু না। কলকাতা এখনও নিরাপদ,—সুতরাং ছোড়দিদির খবর নেবার আছেই বা কি।

শীতকাল দেখা দিল, রাষ্ট্রবিপ্লবের ধারালো অবস্থা অনেকটা যেন নিস্তেজ হয়ে এলো। ইতিমধ্যে ভারতের সামরিক শক্তি অনেকখানি বেড়ে গেছে এবং জনসাধারণ অনেকখানি সাহস সঞ্চয় করেছে। তবে জাপান-বেতারে অবিশ্রান্ত ঘোষণা করা হচ্ছে, তা'রা শীঘ্রই প্রবল শক্তিতে ভারত আক্রমণ করবে। এদেশে তখন প্রচুর পরিমাণে ইংরাজ বিদ্বেষ জমে উঠেছে। অমল ভাবছিল, কি হয়, কি হয়!

এমন সময় হঠাৎ একদিন রাত্রে কলকাতায় জাপানী বোমাবর্ষণ সুরু হয়। এতদিন পরে যেন পালে বাঘ পড়লো! বিপদ যতদিন আসন্ন ছিল ততদিনই আতঙ্ক, যেদিন সেই বিপদ সত্য সত্যই এলো, সেদিন অমল মনে মনে বললে, ও এই তুমি? এর বেশী কিছু নয়?

আবার সেই লক্ষ লক্ষ লোকের পলায়ন। উন্মত্ত, মূঢ় অন্ধ ও দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য জনসাধারণ ছুটেছে···ছুটেছে···যেদিকে দু'চোখ যায়। রোগে অপঘাতে, দুর্ঘটনায় যত পলায়মান নরনারীর মৃত্যু ঘটলো,—বোমাবর্ষণে তা'র শতাংশের এক অংশও মারা যায়নি। কলকাতাটা সাতদিনের মধ্যে শ্মশান হয়ে গেল। অমল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো সব।

বেলেঘাটার ওদিকে বোমা পড়েনি, তবুও অমল ছোড়দিদির একটা খবর নেবে ভাবছিল, এমন সময় বোম্বাই থেকে নৃপেনের তার এলো, তোমরা আর ছোড়দিদিরা কেমন আছ শীঘ্র জানাও।

অমল তাড়াতাড়ি চ'লে গেল বেলেঘাটার ওদিকে।

তখন মধ্যাহ্ন, সুতরাং পথঘাট চেনার কোনো অসুবিধা নেই, এবং তা'র পরিচিত পথ—ভুলে যাবার কথাও নয়। কিন্তু অনেকক্ষণ একই গলির মধ্যে ঘোরাফেরা ক'রে নম্বর মিলিয়ে অমল একই বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালো। সন্দেহ নাই, এইটিই ছোড়দিদিদের বাড়ী, সেই সুবিস্তৃত পুরনো পাঁচিল, দোতলার ভাঙা অংশটা তেমনই রয়েছে, পুরনো দরজাটাও সেই একইভাবে দাঁড়িয়ে—, তবু সমস্ত বাড়ীটার চেহারা ফিরে গেছে! বাড়ীর ধারে আগে এই টিউব-ওয়েলটি ছিল না, আজকাল এটা নতুন হয়েছে। সেই বাড়ী কিন্তু সেই আগেকার বাড়ী নয়। ভিতরে কা'দের যেন একটা কলরব চলছে,—একটা মস্ত সমারোহ।

হয়ত কোথাও কেউ অমলের সন্দেহজনক গতিভঙ্গী লক্ষ্য ক'রে থাকবে, —তাকে নির্বোধের মতন অমনি দাঁড়ায়ে থাকতে দেখে সহসা একটি খাকি পোষাকপরা লোক এগিয়ে এসে বললে, এই—ক্যা দেখতা?

অকস্মাৎ অমল হকচকিয়ে গেল। বললে, আমার লোক এখানে থাকতো।

ক্যা? তুমারা আদমি?—লোকটা কাছে এগিয়ে এলো।

অমর বললে,-হ্যাঁ, এ কোঠি হামারি বহিনকা!

হিয়া কোই নেই,—এ মিলিটারী ব্যারাক হ্যায়···যাও।

অমল মূঢ়ের মতো কিয়ৎক্ষণ তাকিয়ে ধীরে ধীরে চ'লে গেল। সেইদিনই সে বোম্বাইতে টেলিগ্রাফ পাঠিয়ে জানালে', ছোড়দিদিরা কোথায় চ'লে গেছে, তা সে জানে না। তাদের বাড়ীঘর মিলিটারীর লোকেরা দখল করেছে।

কয়েকদিন অবধি অমল অনেক চেষ্টা করেছে, অনেক জায়গায় খবর নিয়েছে, কিন্তু ছোড়দিদির কোন সন্ধান না পেয়ে মাস তিনেক পরে একদিন সত্যই সে হাল ছেড়ে দিল। ছোড়দিদি হলেন তা'র বন্ধুর দিদি, এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের কুলবধূ। তাঁর সম্বন্ধে অতিশয় উদ্বেগ এবং কৌতূহল খানিকটা বেমানান বৈ কি। অমল সেদিকে আর ভ্রূক্ষেপ না ক'রে নিজের কাজে মন দিল।

দেশের দিকে যতদূর দেখা যায়, সমস্তটাই আতঙ্ক পাণ্ডুর নৈরাশ্যময় এবং —জনজীবনের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। অথচ ভিতরে ভিতরে কী বিপুল পরিবর্তন—কোথাও স্থিতিশীলতা নেই। অমলের বন্ধুরা কে কোথায় হারিয়ে গেল—ভাগ্যচক্রে তারা সবাই ঘূর্ণ্যমান। যারা নীচে ছিল তারা উপরে উঠে এলো, যারা উপরের মানুষ, তারা গেল তলিয়ে। অমল চেয়ে দেখলো, তা'র পারিপার্শ্বিক জীবনে যারা প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপনাকে আঁকড়ে ছিল, তাদের অন্তরলোকে কী বিরাট বিপ্লব! স্বেচ্ছাতন্ত্রী, অধীর, অস্থায়ী, ক্ষণমর্জী নরনারীর দল। নগরের পরিধির মধ্যে সবাই রয়েছে একত্র, কিন্তু কী বিচ্ছিন্ন, কী আত্মকেন্দ্রিক। মরুভূমিতে কত অপরিমেয় বালুকণা, একত্র, কিন্তু কণায় কণায় কোনো যোগ নেই। প্রকাণ্ড চাকা, নিত্যপরিবর্তনের দুরন্ত গতিতে ঘুরছে—মানুষ ছিটকে পড়ছে তা'র থেকে। অমল এদের থেকে পৃথক—অমলের সঙ্গে এদের কোন যোগ নেই। অমল একা।

বহুদিন পরে ধর্মতলার মোড়ে ছোড়দিদির মেজ ভাসুরের সঙ্গে অমলের হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। তিনি চিনতে পারেন নি অমলকে। অমল তাঁর পায়ের ধুলা নিয়ে বললে, কেমন আছেন প্রকাশবাবু? আমি অমল নৃপেনের বন্ধু।

ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। কিন্তু কী রুক্ষ, মৃত্যু যেন ঘনিয়ে রয়েছে মুখে চোখে। তিনি হতচকিত হয়ে কিয়ৎক্ষণ পথের দিকে তাকালেন তারপর বললেন, কেমন আছি? ঠিক বলা কঠিন ভাই।

অমল বললে, টুনুরা কোথায় জানেন?

টুনু? প্রকাশবাবু যেন অনেক দূরের দিকে তাকিয়ে কী যেন স্মরণ করবার চেষ্টা করলেন, অতঃপর মৃদুকণ্ঠে বললেন, ওঃ টুনু, মানে ছোট বৌমার মেয়ে···হ্যাঁ, মেয়েটি ভারি লক্ষ্মী ছিল!

কোথায় তা'রা?

ঘাড় নেড়ে প্রকাশবাবু বললেন, তাত' বলতে পারিনে, ভাই! মাস ছয়েক আগে কে যেন বললে, তা'রা যেন কোথায়—!

উৎসুক অমল প্রশ্ন করলো, কোথায়? কলকাতায় নেই? দেশে?

প্রকাশবাবু একটা ল্যাম্প-পোষ্টে হেলান দিয়ে কেমন একটা ক্লান্তির সঙ্গে আত্মবিস্মৃত-নির্লিপ্ত হাসি হাসলেন। বললেন, দেশে! কিছু নেই গ্রামে। একখানা করকেটের ঘর ছিল দাঁড়িয়ে, বানের সময় তাও ভেসে গেছে। সেখানে দাঁড়াবার ঠাঁই নেই।

অমল বললে, নৃপেন আমাকে প্রায়ই চিঠি লিখছে ছোড়দিদিদের খবর জানাবার জন্যে। অথচ আমি এক বছর হয়ে গেল ওদের খবর জানিনে। কি করি বলুন ত?

প্রকাশবাবু হঠাৎ এবার সজাগ হয়ে বললেন, এবার আমি যাই অমল। নৃপেনকে লিখে দিয়ো, চারিদিকে আগুন জ্বলছে দাউ দাউ ক'রে—এ আগুন না নিবলে জানা যাবে না, কে বেঁচে আছে, আর কে নাই।

প্রকাশবাবু মন্থরগতিতে হাঁটতে লাগলেন ধর্মতলার পথ দিয়ে। অমল পিছন দিক থেকে চেয়ে রইলো। তিনি যেন সেই সম্ভ্রান্ত রায় পরিবারের ভগ্নাবশেষ! অমলের চাপা নিশ্বাস পড়লো।

বোমাবর্ষণের আতঙ্কে লক্ষ লক্ষ লোক পালিয়েছিল, কিন্তু বোমাবর্ষণের পর থেকে লোক বাড়তে লাগলো। অসংখ্য অগণ্য কাজ জুটছে এখানে। কোটি কোটি কাগজের টুকরো ছাপা হচ্ছে,—তা'র নাম টাকা। বসন্তের ঝরাপাতার মতো রাশি রাশি কাগজ যুদ্ধের ঝড়ের তাড়নায় চারিদিকে উড়ছে। সহস্র সহস্র যন্ত্রশালা সর্বত্র দাঁড়িয়ে উঠলো, তার সঙ্গে অগণ্য যুদ্ধের দপ্তর। অমল দেখলো মৃত্যুর ভয় স'রে গেছে, তা'র জায়গা নিয়েছে

লোভের লেলিহান জিহ্বা। সঙ্গে সঙ্গে এলো চোরাবাজার এবং খাদ্যসম্ভার নিয়ে জুয়াখেলা। আবার অভিনব যুগের আরম্ভ।

ইতিহাসের পাতা ওল্‌টালো। দুর্ভিক্ষ দেখা দিল করাল চেহারায়। দুর্দিনের সেই বীভৎস বিকারের মাঝখানে অমল একবার মরিয়া হয়ে চেষ্টা করলো, যদি ছোড়দিদিদের কোনো খোঁজ পায়। বাব বার সে বেলেঘাটার ওদিকে ছুটে গেল, অনেক বাড়ীর কড়া নাড়লো, অনেক প্রশ্ন করলো অনেক প্রতিবেশীকে—কিন্তু কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।

গ্রীষ্মকাল ধু ধু করছে। দেশে দুর্ভিক্ষের মৃত্যু আরম্ভ হয়েছে। গভর্ণমেণ্টের তখনও কিছু চক্ষু লজ্জা ছিল, তাই পথের মৃতদেহগুলি ভোরের আগেই তা'রা সরিয়ে দেয়। ক্রমে ক্রমে শ্মশানে জায়গা হয় না, শবদেহ পথে প'ড়ে থাকে। গাদিতে নিয়ে যাবার লোক নেই, গাড়ী নেই, পেট্রল নেই। অমল একদিন শ্মশানে গিয়ে দেখে এলো, শবদাহের কাঠ পাওয়া যায় না। ক্রমে বর্ষা নামলো; কলকাতার পথে ঘাটে প্রতিদিন শত শত মৃতদেহ প'চে ওঠে। অমল একটা ভয়ানক আতঙ্কে পথে-পথে কা'কে যেন খুঁজে বেড়ায়। অল্প-বয়সী মুমূর্ষু বিধবা দেখলেই অমল হেঁট হয়ে লক্ষ্য করে সে তা'র পরিচিত কিনা। সে নিশ্চয় জানে, ছোড়দিদির কোনো সহায় সম্বল নেই, শ্বশুরবাড়ী থেকে কোনো সাহায্য সে পাবে না, কেউ তাকে দয়া করবে না,—তাকে মুখ বুজে উপবাস করতে হবে। অমল অক্লান্তভাবে খুঁজে বেড়াতে লাগলো।

একদিন হতাশ হয়ে সে চেষ্টা ছেড়ে দিল। নৃপেনকে সবিস্তারে চিঠি লিখে জানালো, ছোড়দিকে কোথাও সে খুঁজে পায়নি। তা'র সাধ্যের অতীত।

এমনি ক'রে প্রায় দেড় বছর কেটে গেলো।

ইউরোপের যুদ্ধের চূড়ান্ত অবস্থা দেখা দিয়েছে। অনেকে বিশ্বাস ক'রে জার্মাণীর আর বোধ হয় রক্ষা নেই। তবে হিটলার হয়ত তা'র পাশুপত অস্ত্র এখনও লুকিয়ে রেখেছে; চরম অবস্থায় নিক্ষেপ করতে পারে। ওদিকে জাপানকে আক্রমণ করার ষড়যন্ত্র চলছে। ভারতের প্রান্ত থেকে জাপানীদের তাড়ানো হয়েছে।

এমনি সময়টায় একদিন লোয়ার সার্কুলার রোডের এক বিদেশী পল্লীর ধারে চলতে চলতে সহসা অমল থমকে দাঁড়ালো। অদূরে ফুটপাথের ধারে একখানা দামী মোটর থেকে জনৈক শিখ মিলিটারী অফিসার নামলেন, তাঁর

সঙ্গে একজন মহিলা। তিন বছর আগে শেষবার অমল ছোড়দিদিকে দেখেছিল,—এ মহিলার সঙ্গে সেই ছোড়দিদির সামঞ্জস্য বড়ই কম। অমল ভুল করেছে, শীতের সন্ধ্যার কুয়াশায় সে ঠিক চিনতে পারেনি। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে লক্ষ লক্ষ যুবকের মতো তারও চোখের জ্যোতি ক'মে গেছে,—উনি সেই ছোড়দি নন্। এ হোলো প্রেতিনী, একে মানুষ বলা চলবে না।

অমল তাড়াতাড়ি নতমুখে চ'লে গেল। সেই পথের মোড়ে একটি পানের দোকানের কাছে এসে সে দাঁড়ালো। অলক্ষ্যে ঘষা কাঁচের আয়নার ভিতরে সে নিজের চেহারার দিকে তাকালো। মনে মনে বললে, ওরে মূঢ়, প্রাচীন নীতিবুদ্ধির পুতুল চিনতে পারলি নে? না, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হোলো না? কোনটা?

অমল ফিরে দাঁড়ালো। পুরনো বিশ্বাস একযুগে ভেঙে নতুন বিশ্বাস দাঁড়িয়ে ওঠে। এ যুদ্ধে ভেঙে গেল সব,—অভ্যাস, আদর্শ, নীতি, চিন্তাধারা। এ যুদ্ধ একটি প্রকাণ্ড নাটক,—এক এক অঙ্কে এক এক যুগ সৃষ্টি হয়েছে, তা জানিস? মূঢ়, তুই কি সেই তিন বছন আগেকার ছোড়দিকেই ধরে রাখতে চাস? মূর্খ, নিজের অভ্যস্ত চিন্তাধারাকে বর্তমানের গতিশীলতার সঙ্গে বদলে দিতে পারিসনে? একথা কি মনে থাকে না, অবস্থার পরিবর্তনশীলতাকে মেয়েরাই সহজে প্রথমে স্বীকার ক'রে নেয়? ছোড়দিও ত' সেই মেয়েদেরই একজন রে।

অমল আবার ফিরে এলো। পা দু'খানা ঠিক পড়ছে না, কেমন যেন সভয় জড়তায় আর সঙ্কোচে, অথচ অধীর উত্তেজনায় অগ্রপশ্চাৎ বোধহীন। কয়েক পা এসে দেখলে মোটরখানা তখনও দাঁড়িয়ে, কিন্তু আরোহীরা ভিতরে গেছে।

অমল গিয়ে ভিতরে ঢোকবার চেষ্টা করতেই গার্ড বাধা দিল। বাড়ীটা যতদূর মনে হচ্ছে সামরিক কর্মচারীদের বাসস্থান। অমল বললে, মায়িজী ভিতর গিয়া, উনকো মাংতা—

তুম্ কোন্ হ্যায়?

উন্‌কো ভাই—

গার্ড একটি স্লিপ ও পেন্‌সিল দিল। অমল লিখে পাঠালো। কি যেন লিখলো কি যেন ভাষায়—অস্থির হাতে, আঁকাবাঁকা অক্ষরে। তারপর সে দাঁড়িয়ে রইলো।

দাঁড়িয়ে রইলো অনেকক্ষণ। কেমন একটা অপমানজনক হীনতাবোধ ঘুলিয়ে উঠছে তার শরীরে—যার কোন ব্যাখ্যা নেই। গলার ভিতর থেকে কিছু একটা উঠে আসছে,—সেটা যেন কুণ্ডলীকৃত মৃত্যু—উঠে আসছে হৃদপিণ্ডের কোনো একটা জায়গা থেকে। অমল অনেকক্ষণ দাঁড়ালো।

এমন সময় মিলিটারী গার্ড এসে জানালো, যাইয়ে উপরমে—

সামনেই কার্পেট মোড়া কাঠের সিঁড়ি। এদিকে ওদিকে অজস্র আসবাব, আর সাজসজ্জা। সিঁড়ির দেওয়ালে দামী দামী বিলাতী ছবি ঝোলানো। অমল উঠে গিয়ে ড্রয়িং হলে এসে দাঁড়ালো।

সেই মহিলাটি এবার বেরিয়ে এলেন সেই স্লিপটি হাতে নিয়ে। অমলকে দেখে বিস্ফারিত চক্ষে বললেন, ওঃ তুমি! নামটি দেখে ঠিক—মানে, ঠিক আমার মনে পড়েনি!

ঢাকা দেওয়া আলোটার নীচে এসে মহিলা দাঁড়িয়েছিলেন। সেই আলোয় হেঁট হয়ে পায়ের ধুলো নেবার সময় অমল লক্ষ্য ক'রে দেখলো, তাঁর পায়ে মুসলমানী সবুজ মখমলের স্লিপার এবং পায়ের নখগুলিতে রক্তরঙীন পালিশ।

তিনি বললেন, আমি এখনই বেরুবো খুব তাড়াতাড়ি—একটু বসতে পারো তুমি!—এই ব'লে তিনি হাতঘড়িতে সময় লক্ষ্য ক'রে পুনরায় বললেন, বাই-বাই, তোমাদের সব খবর কি? মা কেমন আছেন?

অমল বললে, আপনি ত' জানেন, আমার মা মারা গেছেন!

ওঃ সরি! তারপর? এদিকে কোথায়?

এবার ফস ক'রে অমল বললে, আপনি এখানে কেমন ক'রে এলেন ছোড়দি?

ছোড়দিদি হেসে বললেন, এ যুদ্ধে সবই সম্ভব!

অল্প আলোতেও অমল লক্ষ্য ক'রে দেখলো, ছোড়দিদির ঠোঁটে ও গালে রং মাখানো, চোখে হাল্কা সুর্মা, ঘন চুলের রাশি থেকে চূর্ণ গুচ্ছ দুলছে! তাঁর এক হাতে ঘড়ি, অন্য হাতে সোনার সরু বালাটি ঝিকমিক করছে। অলঙ্কারে আর আভরণে তাঁর চেহারাটিতে একটি ধনবতী রাজপুতানীর ভাব এসেছে। শুধু চোখের কোণে দেখা যায় অগ্নিকোণ। যেন মাঝে মাঝে বিপ্লবের বিদ্যুদ্দাম ঝিকমিক করে উঠছে।

অমল নিজের মনের অবস্থা কতকটা সামলে নিয়ে বললে, সেই দেখা

আপনার সঙ্গে…তারপর এই তিন বছর পেরিয়ে গেল…বোমা পড়া, দুর্ভিক্ষ, ভারত আক্রমণ, মহামারী…কত যে বদলে গেছে সব, ছোড়দি—

ছোড়দিদি চঞ্চলভাবে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলেন, মাথায় ঘোমটা তাঁর নেই, এলো খোঁপায় গাঁথা রয়েছে গোটা দুই আইভরির কাঁটা, দুই কানে তাঁর উজ্জ্বল দু'টি পাথর। দু'পা এগিয়ে তিন পা পিছিয়ে নিজের পিছন দিকটা একবার লক্ষ্য করে অন্যমনস্কভাবে অমলের কথা শুনছিলেন।

অমল বলতে লাগলো, কত যে খুঁজেছি আপনাকে…পথে ঘাটে, সেই বেলেঘাটার বাড়ীতে, আপনার ভাসুরদের ওখানে—

উৎসাহ সহকারে আরো কিছু হয়ত অমল বলবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু ঘরের ভিতর কতকগুলি লোকের কোলাহলের মাঝখান থেকে হঠাৎ পুরুষ কণ্ঠের ডাক এলো, মিসেস রয়—?

থাক—বলে ছোড়দিদি অমলকে বাধা দিয়ে থামালেন। তারপর পর্দার ফাঁকে ঘরের ভিতরে তাকিয়ে সহাস্যে নিজের অধর দংশন করে বললেন, ইয়া…just coming…little formalities—

তারপর মুখ ফিরিয়ে গলা নামিয়ে বললেন, হ্যাঁ‥ কি যেন নামটা তোমার …ভুলে যাই! হ্যাঁ আর একদিন তুমি আসতে পারো,—আর অবিশ্যি এইত দেখা হয়ে গেল। তা'ছাড়া সাহেবরা থাকে এখানে,—ওসব পুরনো আলোচনা এখানে না করাই ভালো—

এমন সময়ে সেই শিখ অফিসারটি বেরিয়ে এলেন। বললেন, ইয়েস? উচ্ছ্বসিত উৎসাহে ছোড়দিদি সেই ভদ্রলোকের হাতখানা ধরলেন, বললেন, ইনিই মেজর সিং…my great friend indeed। হ্যাঁ, তুমি বোধ হয় একটা চাকরি চাইতে এসেছিলে, না?

অমল কি যেন বলবার চেষ্টা করতে গিয়ে তার গলায় আটকে গেল। ছোড়দিদি তার মুখের দিকে তাকিয়ে পুনরায় বললেন, হ্যাঁ, মানে—কিছু বলতে হবেনা, বুঝে নিয়েছি—তুমি খুব needy! কতকগুলো চাকরি আমি করে দিয়েছি কতকগুলো ছেলেমেয়ের…অবিশ্যি দু'টো চারটে এখনও হাতে আছে—

অমল বললে, না, আমি চাকরি চাইনে ছোড়দি!

চাওনা? ছোড়দিদি বললেন, I see, সেই ভালো,—দু'শো একশো টাকার চাকরি আজকাল লজ্জার কথা,—আচ্ছা, চিয়ারো।

অমল কিছু বলবার আগেই মেজর সিং সহাস্য আতিশয্যে ছোড়দির একখানি নগ্নবাহু জড়িয়ে ধরে ভেতরে নিয়ে গেলেন। পর্দার ওপারে মস্ত টেবলের ভোজনের আসরে তখন মোটা ও মিহি গলার অনেকগুলি হাসি গলগলিয়ে উপ্‌চিয়ে পড়ছে।

অমল পাথর নয় যে চলৎশক্তিহীন। সে মানুষ, তাই এক সময়ে নড়ে উঠে সিঁড়িটা খুঁজে নেমে আসছিল। সহসা নীচের তলায় শোনা গেল কল্লোলোচ্ছ্বসিত হাসির আওয়াজ। অমল ঠাহর করে দেখলো টুনু উপরদিকে উঠে আসছে,—তার সঙ্গে একটি য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান যুবক। অমল বড় সিঁড়িটার একপাশে সঙ্কুচিত হয়ে দাঁড়ালো।

টুনুর পরনে মিহি জর্জেটের শাড়ী, গায়ে ঝলমলে সার্টিনের জামা,—কিন্তু পিঠের দিকে সেই জামার আব্রুটা নেই,—মাঝখানটা নগ্ন। টুনুর চুলগুলি তাম্রবর্ণে পরিণত, মুখখানা টয়লেট করা,—সমস্ত সিঁড়িটায় রূপের গৌরব ছড়িয়ে সে উঠে আসছিল,—আর সেই তরুণটি ছুটে আসছে তাকে ধরে ফেলবার জন্য। যৌবনের জয়োৎসব ভরা দু'টি মুখ।

সহসা টুনু দাঁড়ালো। নিয়ন্ত্রিত আলোর আভায় অমলকে দেখে বললে, হ্যাল-লো?

অমল স্মিতমুখে বললে, চিনতে পারছ টুনু?

টুনু বললে, ও ইয়েস···তুমি অমলদা—

ছি আমি দাদা নই টুনু, আমি তোমার মামা।

ঘন তীব্র হাসি হেসে টুনু বললে. না না, কেউ নয় তুমি···তবু কী মিষ্টি তুমি···sweet eternally!—এই বলে সে তাড়াতাড়ি তার নীরব হাতখানা বাড়িয়ে অমলের একখানা থরথরে হাত টেনে নিয়ে ঝাঁকুনী দিল।

অমল বললে, আর আমার কোনো দুশ্চিন্তা নেই টুনু, তোমাদের দেখে খুসী হয়ে গেলুম।

টুনু বললে, মায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে?

সাহেব ছোকরাটি হাসিমুখে বললে, I think she is very busy—eh?

এক রাশি হাসিতে টুনু সিঁড়িটা ভরিয়ে দিল। বললে, মায়ের একটুও সময় নেই আজকাল। Come on John.

সোরগোল তুলে আবার টুনু ও য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান তরুণটি দ্রুতগতিতে

উপরে উঠে গেল। একটা খসখসে বাসি মিহি সুগন্ধ বাতাসটাকে ভরিয়ে দিল।

ওরা ভালো আছে, সুখে ও আনন্দে আছে,—আর কোনদিন ওদের সংবাদ নিতে হবে না,—এমনি একটা অদ্ভুত স্বস্তিবোধ নিয়ে অমল সিঁড়ি বেয়ে নেমে চলে গেল। অভিমান, ক্ষোভ, চিত্তবিকার—কিছু নেই তার। সে যেন ভাঙনকে সহজে স্বীকার ক'রে নিতে পারে, তা'র বুকের কোণ থেকে যেন কোনো প্রকার আর্ত প্রতিবাদ না ওঠে।

কিন্তু পথে নেমে এসে অমল কেমন যেন নিরুপায়ের মতো এলোমেলো হাঁটতে লাগলো। তা'র কোন্ পথ—সে ভুলে গেছে! ওদিকে, না এদিকে? ঘোর অন্ধকার রাত চারিদিকে,—আড়ষ্ট শ্রীহীন, ভয়ভীত, শীতার্ত, অন্ধকার। কিন্তু এই অন্ধকার থেকে মুক্তি কবে হবে? এর মধ্যে সত্য কোথা? আলো কই?

তা'র হৃদপিণ্ড থেকে আবার সেই কুণ্ডলীকৃত মৃত্যু যেন উঠে এলো তা'র গলার কাছে—এবার অমল আর সামলাতে পারলো না। কালপ্রহরীর মতো সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোহার একটা টেলিগ্রাফ পোষ্ট। সেইটাকে দুই হাতে ধ'রে তা'র তুহিনশীতল গায়ে মাথা রেখে সহসা অমলের চোখে ঝরঝরিয়ে জল এলো। তারপর একসময়ে সে যেন বর্তমান যুগান্তরের সর্বনাশা বীভৎসতার মাঝখান থেকে মুখ তুলে কম্পিতকণ্ঠে বলতে চাইল, অনেক গেল, আমাদের অনেক গেল এ যুদ্ধে···কত যে ধ্বংস, কত মহতের যে সর্বনাশ···তোমাকে আমরা বোঝাতে পারবোনা।

আঘাত

একটি বারান্দা, দুটি ঘর, একটুখানি বাগান আর কয়েকটি ফুলের গাছ।

দরজাটি পার হয়ে সরু একটি লাল সুরকির পথ এঁকে বেঁকে উঠে এসেছে বারান্দার কোলে। দুটি ঘরের দরজায় চিক্ টাঙানো। ভিতরের দেয়ালে একজিবিশন্ থেকে কেনা কয়েকখানি ভারতীয় চিত্র। মেঝেতে গুটিকয়েক মেহগণি কাটের আসবাব,—খান তিনেক চেয়ার, একটি ড্রেসিং টেব্‌ল, দুটি টিপয়, একটি বেড-ষ্টোর, আর দুদিকে দুটি বইয়ের র‍্যাক্! আধুনিক সংস্করণের অনেকগুলি বই আছে বটে!

পাশে একটি বিছানা, পাশাপাশি দুটি বালিশ সাজানো! মাঝামাঝি একটি পাশের বালিশ বিছানাটিকে আধাআধি ভাগ করে' রয়েছে। কড়ি-কাঠে একটি ইলেক্‌ট্রিক ফ্যান ঘুরছে, 'রেগুলেটরে' গতি একটুখানি কমানো।

জানালার ধারে একখানি হ্যাঁজ চেয়ারে বসে একটি মেয়ে নিবিষ্ট মনে কি একখানা মাসিক পত্র পড়ছে।

বর্ষার শেষ। মেঘলা আকাশ। একটা জলো ঘোলাটে আবহাওয়া চারিদিক ঘিরে রয়েছে। মনে হচ্ছে কয়েক দিন থেকে শরৎ কালটা প্রবেশ-পত্রের অপেক্ষায় বাইরে অপেক্ষা করছে! আজ সকালে ঘরের মধ্যে শিউলীর গন্ধ ঢুকেছিল!

বেলা চারটে!

বাইরে যে পায়ের শব্দ স্পষ্ট হয়ে আসছিল, মেয়েটির হুঁস ছিল না। বাইরের দরজাটা ঠেলে সনৎ এসে ঘরে ঢুকল। কাঁধে একটি বছর দুয়েকের ছোট ছেলে।

মহারাণী?

মেয়েটি একটু হেসে সোজা হয়ে উঠে বসল। বল্‌ল—কিবা নিবেদন, কহ বীরবর!

বীরবর বল্‌ল—সন্তান তব ধূলি-ধূসরিত।—আরে গাধা, কান কামড়াচ্ছিস কেন? নাম্ তবে। কি দুষ্টু রে বাবা, পিতার সম্মান রক্ষা করে' চলে না!

মেয়েটি উঠে এসে তাকে কোলে তুলে নিল। তারপর চুম্বন করে' বল্‌ল—ত্যাজ্যপুত্র হবার ভয় রাখো না?

নেক্‌টাইটা খুলে' সনৎ আন্‌লায় তুলে রাখ্‌ল। ট্রাউজারের ভিতর থেকে শার্টটা টেনে উঠিয়ে তার ওপর টাঙিয়ে দিল। তারপর কাপড় বদ্‌লে সে যখন কাছে এসে হঠাৎ হেসে দাঁড়াল, ছেলেটি তখন আবার তার কোলে আস্‌বার জন্য হাত বাড়িয়েছে।

কোলে তুলে নিয়ে সনৎ তাকে জিজ্ঞেস করল—তোমার মা'র নাম কি বলত' টুটু ?

টুটু তার মা'র দিকে তাকিয়ে বল্‌ল—মোয়ালানি !

না, না, আর-একটা।

টুটু বল্‌ল—তমচা।

সনৎ বল্‌ল—তমচা নয়, তমসা ! গাধা কোথাকার, জিবের এখনও আড় ভাঙে নি ! আচ্ছা, তা হোক,—টুটু তোমার মাকে বলত' আমার এ বেলার প্রাপ্যটি দিয়ে দিতে !

মাসিক পত্রখানা থেকে মুখ তুলে এবার হেসে ফেলে তমসা বল্‌ল—নিজে ডাকাতি করে' এতদিন পরে বুঝি লজ্জা হচ্ছে ? যাও, ও-সব এখন হবে না ! —ঠোঁট দুটি তার কেঁপে আবার স্থির হয়ে গেল।

একটুখানি অপ্রস্তুত হয়ে সনৎ হেসে বল্‌ল—না, তা নয়, চুমু খাওয়া ছাড়া কি আর আমার অন্য কাজ নেই ? তা বলছিনে,—ওটা কি পড়া হচ্ছে ? গল্প ? কা'র ?

তমসা ততক্ষণে দস্তুরমত কাঁদো কাঁদো হয়ে উঠেছে বল্‌ল—বাজে লেখা ! দেখ না, 'মেয়েটাকে' কি নাস্তানাবুদ করছে।

কি রকম ?

বেশ ছিল…স্বামী আর স্ত্রী ! ঘর দোর, সাজানো গোছানো, জিনিসপত্র …সুখের সংসার !

তারপর ?

এল এক উড়নচুড়ে দেওর অতিথি নারায়ণ হয়ে…হতভাগা ! জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড করতে সুরু করে' দিল, ভেঙ্গে চুরে একেবারে তচ্‌নচ্‌ ! বউটা ত একেই একটু কৃপণ, স্বামীটাও আবার বোকা, ভাইকে ভালবাসে !…ছি ছি, শেষের দিকে একেবারে যাচ্ছে-তাই !

কি শুনি ?

বলতে লজ্জা করে। শোনো তবে বলি চুপি চুপি।

কানে কানে তমসা কি বলিতেই সনৎ হঠাৎ হো হো করে' হেসে উঠল।

রাগ করে' উত্তেজিত হয়ে আরক্ত মুখে তমসা বল্‌ল—এমনি জঘন্য লোক। এ গল্প যে লিখেছে, আমি তাকে দেখতে পেলে কান মলে দিই!

সনৎ বল্‌ল—আমার কিন্তু খুব ভালো লেগেছে।

অ্যাঁ?—তমসা অবাক হয়ে বল্‌ল—এই দুর্নীতি তোমার ভাল লাগে?

সনৎ বল্‌ল—নীতি আমি মানিইনে!

মানো না? আর ধর্ম্ম?

সনৎ একটু হেসে বল্‌ল—আমরা বিংশ শতাব্দীর সন্তান।

তমসা হিন্দুর মেয়ে। যে-বাড়ীতে সে মানুষ হয়েছে, সেখানে আচার বিচার পাল পার্ব্বণ, ঠাকুর দেবতার পূজা. ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সেবা—এ সমস্ত নিত্য নৈমিত্তিক। একদিকে যেমন সাত্ত্বিকতার আবহাওয়া, অন্যদিকে তেমনি সৎশিক্ষার স্নিগ্ধ আলোয় সে বড় হয়ে উঠেছিল।

বিবাহ হয়েছে তার উপযুক্ত স্বামীর সঙ্গে। রাজপুত্রের মত রূপ, উচ্চ আধুনিক শিক্ষায় সুপণ্ডিত, অপরিমিত ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী। বিনয়ী, ভদ্র, বুদ্ধিমান, আত্মপ্রতিষ্ঠ এবং স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত।

ভালবাসা? সমস্ত জীবন তমসার পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, আনন্দে, প্রেমে, তৃপ্তিতে, স্বস্তিতে ও গর্ব্বে। ভালবাসায় স্বামী তাকে আবৃত করেছিল, আচ্ছন্ন করে' রেখেছিল।

কাগজখানা ফেলে রেখে সে উঠে দাঁড়াল, পরে কাছে এসে বাঁ হাতটা সনতের কোমরে জড়িয়ে মুখের ওপর মুখ তুলে বল্‌ল—মাঝে মাঝে তুমি এমন কথা বলো যে ভয়ে আমার বুক কেঁপে ওঠে। এমন কথা কি বলে কখনো?

হা-হা-হা করে' সনৎ হেসে উঠল। বল্‌ল—পাগল আর কি! যেটা আমার নেই, সেটা আছে বলে' চালিয়ে দিয়ে লাভ কি?—বলে' দুটি আঙুল দিয়ে সে তমসার চিবুকটি নেড়ে দিল।

বিকাল বেলা এক ঘণ্টার ছুটি নিয়ে 'আয়া'টা চলে গিয়েছিল, এবার সে ফিরে এসে টুটুকে কোলে নিয়ে বেরিয়ে গেল। রান্নাঘরে ঠাকুর এসে রাতের রান্না চড়িয়েছে। ঝি এবার চায়ের জল বসালো!

সুইচ্‌ টিপ্‌তেই সমস্ত ঘর আলোয় হেসে উঠলো। ফ্যান্‌-এর বেগটা আর একটু বাড়িয়ে দিয়ে তমসা খাটের ওপর আধ-ভাঙা অবস্থায় উঠে বস্‌লো।

হাসচো যে?

সনৎ বল্‌ল—ভাবছি, আমি যখন থাকিনে, তোমার সময় তখন কেমন ক'রে কাটে!

তমসা হেসে বল্‌ল—দয়ার শরীর! কিন্তু তোমার হাসি দেখে মনে হয় এ কথা তুমি ভাবছিলে না। তুমি আড় চোখে তাকাচ্ছিলে আমারই দিকে!

আল্‌তা-পরা দুখানি ফর্সা পায়ের ওপর শাড়ীটা তমসা নামিয়ে দিল। মাথার চুলের রাশ আলগা খোঁপায় বাঁধা ছিল, নাড়াচাড়া পেতেই খোঁপার খিল্‌ খুলে চুল এলিয়ে পড়ল।

প্রেমের একটি মন্থরতা, একটি গাম্ভীর্য্য এসেছে তাদের জীবনে, দীঘির জল যেখানে গভীর, সেখানে সে অস্থির চঞ্চল নয়, হাওয়া লেগে শুধু একটু একটু কাঁপে; মাতালের উন্মত্ততায় ওলোট-পালোট করে না, সন্ন্যাসীর তপস্যার মত শান্ত!

তমসা বল্‌ল—আমাব ঠাকুর-ঘর কেমন করে সাজাচ্ছি, দেখেছ?—বা রে, শুনতে না শুনতেই যে গম্ভীর হয়ে উঠলে!

সনৎ বল্‌ল—তুমি আবার এই ছেলেমানুষীকে প্রশ্রয় দিচ্ছ তমসা!

তমসা চুপ ক'রে রইল। খানিকক্ষণ পরে বল্‌ল—বারে বারে তুমি এটাকে তাচ্ছিল্য কর কেন বল ত! ব্রাহ্মণের ঘর থেকে ঠাকুরের সেবা উঠিয়ে দিলে কি থাকে, শুনি?

সম্পূর্ণ অর্থহীন! নিজেদের মনের উন্নতি যেখানে হল না, বাইরে শিবের মন্দির বসিয়ে সেখানে লাভ কি?—সনৎ একটা সিগারেট ধরালো।

ঝি এসে সুমুখের টিপয়ের ওপর দু' পেয়ালা চা ও রেকাবীতে কিছু জলখাবার রেখে বেরিয়ে গেল।

তমসা বল্‌ল—মনে করো না, এ আমার গোঁড়ামি। এ হচ্ছে গৃহস্থালীরই একটা অঙ্গ। নৈলে ধর, সবই ত হল···স্বামী, সন্তান, ঐশ্বর্য্য, প্রেম, ভদ্রতা, সামাজিকতা—সব! তারপর কি বল দেখি? কি নিয়ে থাকা চলে? আনন্দ, শান্তি, তৃপ্তি না হয় সবই পেলাম একে একে, কিন্তু ঠাকুর-দেবতার সঙ্গে শুভদৃষ্টি না হলে এরা সবই যে প্রাণহীন! চুপ করলে যে?

সনৎ শুধু বল্‌ল—পাগলামি করো না, ধরো চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল!

চায়ের পেয়ালা হাতে তুলে নিয়ে তমসা বল্‌ল—তুমি দেখছি নিতান্তই নাস্তিক। মনে করো না যে—

কি শুনি?

হিঁদুয়ানী ত্যাগ করে' বাহাদুরী নিচ্ছ?

তাই নাকি?—এই গরম খাস্তার কচুরিটা খেয়ে ফেল দেখি—আরে, থাক্ থাক্, আমার মুখে আর দিতে হবে না!

দাঁত দিয়ে একটু ভেঙে নাও!

প্রসাদ করে' না দিলে খাওয়া হবে না বুঝি?—তমসা আগেকার কথার জের টেনে বল্‌ল—বাড়ীতে ঠাকুর দেবতার পাট থাকলে সমস্তই সেখানে গিয়ে মেলে। রাশি রাশি ফুল থাকতেও মালা গাঁথা যায় না, সুতো যদি না থাকে।

সনৎ বল্‌ল—আবার?

তমসা হেসে বল্‌ল—এ বিশ্বাস আমার কিছুতেই যাবে না। ধর্ম্ম-বিশ্বাসই হচ্ছে মানুষের পরম আশ্রয়।

তমসা কোনো কথাই শুনলো না, বিশ্বাসটা তার রইলই। বাড়ীর পাশে যাদের বাড়ী, তাদের মেয়ের সঙ্গে ছিল তার বন্ধুত্ব। টুটুর পাতানো মাসি। ছাদের পাঁচিলে উঠে একদিন তমসা ডাক পাড়লো—সরলা? শোন্ ত ভাই একবার!

সরলা এল। বল্‌ল—অসময়ে যে! তমসা বল্‌ল—ভালবাসার কি আর সময়-অসময় আছে?—শোন বলি, তোদের পুরুৎ ঠাকুর আসবেন কখন্?

এসে ত চলে' গেছেন। তোর ঠাকুর বসবে কবে? নেমন্তন্ন?

হ্যাঁ লো হ্যাঁ, পরের বাড়ী বিষ পর্য্যন্ত পেলে তুই ছাড়িসনে!—যাই হোক, কাল পুরুত ঠাকুর এলেই কিন্তু আমায় বলিস ভাই।

দুই বন্ধুতে পরামর্শ হল।

সকল খবর রাখবার মত সময় সনতের হতো না। তাকে স্ত্রৈণ বলা যেতে পারে, কিন্তু কুনো বলা চলে না! স্ত্রীই থাকতো তার চোখে সকল সময় জেগে, কিন্তু স্ত্রীকে পার হয়ে যে নিত্য দিনের সংসার, যেটায় দম্ দিলে যন্ত্রের মত চলে—সেটার সম্বন্ধে তার চেতনাও নেই, অভিজ্ঞতাও নেই। যা করে তমসা।

এ বাড়ীটা কেনার পর থেকে সিঁড়ির মাথায় যে ঘরটা এতকাল পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল, সেইটিই হল ঠাকুর ঘর। বাড়ীতে শিবের প্রতিষ্ঠা তমসা করবেই।

ঠাকুরের জন্য সোনার সিংহাসনের ফরমাস গেল স্যাকরা-বাড়ী, শয্যা প্রস্তুত হলো, পুষ্পপাত্র প্রমুখ তামার বাসন-কোসন এলো, ধূপধুনো কেনা হল, শাঁখ-ঘণ্টা জমা হল,—তমসা পেলো মনের মত একটি কাজ।

দিনের যে সময়টা সনৎ নিয়মিত বাড়ীতে থাকে না, সেই অবসরেই হয় এই সকল ব্যবস্থা। স্বামীকে একটু চমক দেবার ইচ্ছায় তমসা অতি কষ্টে এমন ব্যাপারটা মুখ টিপে চেপে রইল।

সরলাদের পুরোহিত একদিন এলেন। রাঙা পাড় তসরের শাড়ী পরে' গলায় আঁচল দিয়ে তমসা তাঁর পায়ের কাছে প্রণাম করল।

ভট্‌চায্যি মশায় বল্‌লেন—শিবটি এনেছি মা, কৈ তোমার ঠাকুর-ঘর ?

তাড়াতাড়ি উঠে তমসা ঠাকুর-ঘরের কাছে এসে দাঁড়াল! বানেশ্বর শিবটি সিংহাসনের ওপর বসিয়ে ভট্‌চায্যি মশায় প্রথম পূজা সেদিন নিজের হাতেই সারলেন।

দিন যায়। তমসা পূজা করে। ঠাকুরের ভোগ দেয়।

সেদিন কি একটা ছুটির বার। তমসা তার স্বামীকে বল্‌ল—এসো, দেখবে এসো।

সনৎ বল্‌ল—কি ?

তমসা তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বল্‌ল—প্রিয়তমার পাগলামি !

ঠাকুর ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সনৎ পরম বিস্ময়ে হেসে উঠল—অদ্ভুত মেয়ে ত তুমি, আমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে এত কাণ্ড করেছ ?

আত্মপ্রসাদে তমসার বুক ভরে' উঠল।

সনৎ শুধু হাসতেই লাগল। দেবতা বলে' তার কোনো শ্রদ্ধাও নেই, ধারণাও নেই,—কোনো গ্রাহ্যই সে করল না। নিতান্তই ছেলেমানুষি চপলতা মনে ক'রে সে হাস্‌তে হাস্‌তেই শুধু বল্‌ল—ঘর সাজানোটা খুব আর্টিষ্টিক্ হয়েছে !

তমসাও হেসে উত্তর দিল—থ্যাঙ্ক্ ইউ !—আচ্ছা তুমি দাঁড়াও এখানে একটুখানি, যাবার সময় দরজাটা বন্ধ করে যেও। আমি সরলাকে খবর দিয়ে আসি, আজ সন্ধ্যেবেলা ভট্‌চায্যি মশাই আরতি করবেন।

তমসা তাড়াতাড়ি ছুটলো ছাদে।

পায়ে যে চটিজুতো ছিল তা সনতের মনেই ছিল না। হাসিমুখে সে ঠাকুর-ঘরে ঢুকে গেল। শিবলিঙ্গটির আকার-প্রকার দেখবার লোভ সে আর

সম্বরণ করতে পারল না। কাছে গিয়ে বসে সিংহাসন থেকে সেটি তুলে নিয়ে সে বাইরে এল। তমসা যে রাগ করতে পারে, এ কথা তার মাথাতেই ঢুকলো না।

ইতিমধ্যে ঝি-চাকরের কি একটা কলহ তীব্র আকার ধারণ করেছিল। সনৎ এল তাড়াতাড়ি তাদের থামাতে। তারা কিছুক্ষণের মধ্যেই থাম্‌ল কিন্তু সনৎ গেল শিবের কথা ভুলে!

গোলমাল থামিয়ে সে ইজি চেয়ারের ওপর এসে বসলো একখানা বই হাতে নিয়ে।

কিয়ৎক্ষণ পরে তমসাকে ঘরে ঢুকতে দেখে শিবের কথা তার মনে পড়ল। পকেট থেকে পাথরের নুড়িটি বার করে' সে বল্‌ল—সংস্কারটাই তোমাদের কাছে বড়, আইডিয়াটা নয়! নৈলে এর মধ্যে কী আছে বল ত?

দেয়ালের ধারে হতভম্বের মত তমসা বসে পড়ে বল্‌ল—কি ওটা তোমার হাতে?

সনৎ বলল—শিব গো, তোমার সেই নুড়িটা।

দেখতে দেখতে তমসার মুখখানা কঠিন, তীব্র, রুক্ষ হয়ে এল। চোখদুটো উঠলো ফুলে, মুখখানা হয়ে উঠলো রক্তের মত। উত্তেজনায় সে একেবারে চীৎকার করে' উঠলো—তোমার কি ভয় নেই? কি করলে তুমি? ওর যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে!

সনৎ সামান্য একটু অপ্রস্তুত হয়ে—ছেলেরা যেমন করে' গুলি খেলে তেমনি করে'—বাঁ হাতের মাঝের আঙুলের ওপর নুড়িটা রেখে ডান হাত দিয়ে একবার টেনে ছেড়ে দিতেই সেটা জোরে গিয়ে লাগল দেয়ালের গায়।

অর্দ্ধমূর্চ্ছিত অবস্থায় তমসা শিউরে উঠে ভয়ার্ত্ত হরিণীর মত ঘর ছেড়ে চলে' গেল।

দেবতার এত বড় অপমান।

মাস খানেক কেটে গেছে।

নদীতে আর স্রোত নেই। ক্ষীণ ধারাটি বয় মৃদু গতিতে। একটা ক্লান্তি এসেছে।

বহুদূর পার হবার আগে শ্রান্ত পথিক যেমন সেই দিকে তাকিয়ে থাকে তমসাও তেমনি করে' ভাবে। সমস্ত জীবনটাকে পার হয়ে যাবার পরিশ্রম যে অনেকখানি! তমসা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে ওঠে।

আপিস থেকে ফিরে সনৎ ঘরে ঢুকে নিজেই আলো জ্বালে!

—একি, তুমি অন্ধকারে বসেছিলে এতক্ষণ?

তমসা প্রথমে উত্তর দিল না। পরে বল্‌ল—একটু একটু করে' কেমন অন্ধকার জম্‌ছিল দেখছিলাম।

কাছে এসে সনৎ বল্‌ল—কি হলো তোমার, বলতো? এসো, আমার কাছে বসবে এসো। দিন রাত আজকাল তোমার সাড়াশব্দ শোনাই যায় না। কেন বলতো?

তুলে ধরে সনৎ তাকে কাছে এনে বসালো। বল্‌ল—শুধু ত রোগা হওনি, শ্রীহীন হয়ে গেছ। চুলগুলো হয়েছে ঠিক খড়ের আটি, গায়ের চাম্‌ড়া খস্ খস্ কচ্চে, চোখ বসে যাচ্ছে—তোমায় সেই অদ্ভুত লাবণ্য গেল কোথায়? কাল ত আবার ডাক্তারের কাছে গেছলাম, তিনি বললেন, রোগের কোনো চিহ্নই নেই। এ-সব তবে কি, তমসা? বলি, শুন্‌চ?

উঁ!—তমসা মুখ ফিরিয়ে তাকালো। চোখদুটি তার গভীর কিন্তু অর্থহীন। একটা শূন্য দৃষ্টি স্বামীর মুখের ওপর বুলিয়ে, সে আলোর দিকে তাকালো। কথা বলবার যে একটা প্রাণবেগ, সেটা যেন তার ফুরিয়ে গেছে।

সনৎ বল্‌ল—কি ভাবচো তমসা?

ভাবচি? কৈ না! তারপরই সে তাড়াতাড়ি বল্‌ল—আলোটা নিবিয়ে দিলেই ত হয়, মিথ্যে জ্বলছে।

অন্ধকারে থাকবো? আগে ত কই তুমি আমাকে অন্ধকারে থাকতে দিতে না?

দিতাম না? ও।

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তমসা সরে বসলো। খাবার দেওয়া হয়েছিল; ঝি এসে খবর দিতেই সনৎ উঠে বাইরে গেল।

নিজের হাত ও পায়ের আঙুলগুলোর দিতে তাকিয়ে তাকিয়ে তমসা কি যেন দেখছিল। হাড়ের কাঠির মত আঙুলগুলো যেমন শক্ত, বিশ্রী, তেমনি শুকিয়ে গেছে। মনে হচ্ছিল, তার বিবশ আড়ষ্ট দেহটা দিন দিন একটু একটু করে' যেন পাথরের মত ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।

রাতে আলো নিবিয়ে নিঃশব্দে স্বামী-স্ত্রী বিছানার ওপর পড়ে থাকে। টুটু থাকে আয়ার কাছে, পাশের ঘরে। সনতের চোখে ঘুম আসে না, কোনো প্রশ্ন করতে গিয়ে তার যেন জিব আটকে যায়। ভারি জমাট অন্ধকার তার বুকের ওপর চেপে বসে।

অনেক রাতে গায়ের ওপর হাত রেখে সে বলে—আমি কি কোনো অপরাধ করেছি তমসা? কৈ, কিছু ত মনে পড়ছে না?

উদাস কণ্ঠে তমসা বল্‌ল—আমারো না!

তবে—তবে তুমি এমন হয়ে গেলে কেন? তবে এমন করে' আমার কাছ থেকে আল্‌গা হয়ে তুমি মিলিয়ে যাচ্ছ কেন?

তাইত! এ কথা কই তমসার মনে হয় নি ত!

চঞ্চল হয়ে উঠে সনৎ তার মুখের ওপর চুম্বন করতে লাগল। তমসা কোনো সাড়া দিল না, বাধা দিল না, নিঃশব্দে স্থির হয়ে পড়ে' রইল। সনতের মনে হলো, ওষ্ঠ তার শীতল, আবেগ-হীন, চুম্বন বিস্বাদ। তমসার সমস্ত দেহটাই অনাসক্ত, উদাসীন। আনন্দের কোন কম্পন তা'র মধ্যে নেই।

তমসা?

উঁ?

রোজ এম্‌নি করে' সমস্ত রাত তুমি জেগে থাকো?

হুঁ। ঘুম আসে না যে!

আবার খানিকক্ষণ চুপ-চাপ। নিজের মধ্যে ডুব দিয়ে কোথায় যেন তমসা তলিয়ে যায়! ছায়াচিত্রের গতিতে নানা রকম অদ্ভুত চিন্তা তার মাথায় আসে। সে ভাবে, তার এই সাজানো সংসার যেন লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে! স্বামীর উপার্জ্জন আর নেই, পাওনাদাররা বিরক্ত হয়ে উঠেছে। ঘর গেল, আসবাব গেল, স্ত্রী গেল,—ঝড়ে যেন চারিদিক ওলোট-পালোট হয়ে চলেছে।

ভাবতে ভাবতে সে হঠাৎ উঠে বসে। ঘর অন্ধকার, ঘড়িটা টিক্ টিক্ করছে! শব্দটা অত্যন্ত পীড়াদায়ক মনে হয়—মাথার মধ্যে অবিশ্রান্ত ঘা মেরে যেন ক্ষত-বিক্ষত করছে।

সনৎ ঘুমিয়েছে! আবার সে তার পাশে গিয়ে শোয়! এইটুকু পরিশ্রমেই সে হাঁপাতে থাকে।

……উঃ, এ কি—টুটু যে রোগের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করছে! ডাক্তার এলেন, হ্যাঁ—কি বললেন, ডাক্তার বাবু? ও কি, মুখ ফিরিয়ে চলে' যাচ্ছেন কেন?

তমসা বড় বড় চোখে অন্ধকারের দিকে তাকাল।

……মাথার ওপর অশ্রুজলের আকাশটা টল্‌ টল্‌ করছে। টুটুকে কাঁধে নিয়ে সে চলেছে রিক্ত, রুক্ষ, তৃষ্ণার্ত্ত, মরুভূমি পার হয়ে। টুটু মরে গেছে, কেউ তাকে বাঁচাতে পারেনি। কাঁধ পেরিয়ে পিঠের দিকে টুটুর মাথাটা ঝুলছে! চোখে তার চির-নিদ্রা, চির-অন্ধকার!……শ্মশানে এল, নির্জ্জন নদীর কূলে শ্মশান।…… চিতার আগুন জ্বললো, কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়া উঠলো ওপর দিকে, তারপর নদী-তরঙ্গ এসে টুটুকে লেহন করে' নিয়ে গেল!

তমসা কাঁপছে! চীৎকার করবে? আওয়াজ কই? প্রাণপণে সে একবার নড়বার চেষ্টা করল, পারল না। বিছানায় সাপ ঢুকেছে কি, এমন করে' কামড়াচ্ছে কেন?

ঘড়িটা টিক্‌ টিক্‌ ক'রে রাত্রির অন্ধকারকে বিদ্ধ করছে। দুলছে, নিদ্রিত গোলাকার এই পৃথিবীটা তার চোখের উপর দুলছে!

……এ কি, আগুন লাগলো কেমন করে? দেখতে দেখতে লাল হয়ে উঠ্‌ল চারিদিক। বাড়ী পুড়লো, ঘর পুড়লো, ইট-কাঠে আগুন লেগে পটাপট্‌ শব্দ হতে লাগল। যাঃ, সব যে গেল! স্বামী গেল টুটুকে বাঁচাতে,—কৈ, আর ত বেরোল না! ওগো শুন্‌চ, উত্তর দাও—তোমার পায়ে পড়ি, তুমি বেরিয়ে এসো!

সনৎ আচম্‌কা উঠে বসল। তমসার গায়ে হাত দিয়ে দেখল, সে থর-থর ক'রে কাঁপছে,—এক গা ঘাম! হাত-পাগুলো বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

তমসা, এখনো ঘুমোওনি তুমি?

কম্পিত কণ্ঠে তমসা বল্‌ল—ঘুমোইনি? সকাল হল যে!

জান্‌লা দিয়ে সনৎ বাইরে তাকাল। পরে বল্‌ল—সকাল নয়, শেষ রাতের চাঁদের আলো, কাকগুলো ডাক্‌ছে, আবার এখুনি থেমে যাবে!

ও, থেমে যাবে এখুনি? আচ্ছা—অসমাপ্ত কথা তার মুখের মধ্যেই রয়ে গেল।

সকাল বেলা সনৎ খবরের কাগজ পড়ছে, আর জান্‌লার গরাদে মাথা কাৎ করে বাসি-মুখে তমসা বসে রয়েছে। একটু আগে টুটু এসে মায়ের কাছে কি একটা আব্দার ধরেছিল, তমসা তাকে ধমক দিয়ে আয়ার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। টুটুকে আজ কাল তার কেমন যেন ভাল লাগে না।

কাগজের ওপর থেকে এক সময় মুখ তুলে স্নিগ্ধ কণ্ঠে সনৎ বলতে গেল—কাল থেকে প্রায় উপবাস চলছে, মুখ হাত-পা ধুয়ে এবার কিছু—

বারুদের মত তমসা হঠাৎ ফেটে উঠল—আমার খুশি, না খেয়ে থাকবো, তোমার কথা বলবার কি দরবার? খবরদার বলে দিচ্ছি কোন কথা কইবে না আমার সম্বন্ধে!

রুক্ষ কর্কশ হিংস্র মুখের চেহারা! দেখলে সত্যই ভয় করে। থতমত খেয়ে সনৎ বল্‌ল—তবে শুধু মুখ ধোওগে?

না, বেশ করবো—খুব করবো—আমি এখানে বসে থাকবো। চুপ করে' বসে থাকবো। এইটুকু অধিকার আমার নেই, কেন বল ত? আমায় কি কিনে এনেছ?

একটুখানি হাসবার চেষ্টা করে সনৎ বল্‌ল—তুমি নিজেই রাগ করছ, আমি ত তা বলিনি তমসা!

থাক্, আর সাফাই গাইতে হবে না, আর ভাল মানুষীতে কাজ নেই! ঢের হয়েছে, অনেক হয়েছে—এবার ছুটি দাও।

হু-হু ক'রে সে কেঁদে ফেললো।

এমনি করে' সে আজকাল কথায় কথায় বিপর্য্যয় কাণ্ড বাঁধিয়ে বসে।

আফিস যাওয়া সনৎ বন্ধ করল।

ঝি-চাকর বামুন-আয়া পর্য্যন্ত তটস্থ হয়ে রইল। সুশৃঙ্খল সু-সজ্জিত সংসারটির মধ্যে প্রতিক্ষণেই ছন্দপতন হতে লাগল।

বেলায় ভাত বেড়ে দিয়েছে, অনেক কষ্টে ভুলিয়ে-ভালিয়ে সনৎ তাকে এনে খেতে বসালে। খেতে বসেও কেলেঙ্কারী! ভাত-তরকারী ছড়িয়ে জল ফেলে একাকার করল। সনৎ বল্‌ল—সবইত ফেলে দিলে! দুটি খাও। আর নয় ত আমি খাইয়ে দেবো?

খাইয়ে দেবে? কেন, আমি কি খুকী? আমি কি কিছু জানিনে? এম্‌নি করে আমায় অপমান করা?

থালাটা তুলে সে ছুড়ে ফেলে দিল; পা দিয়ে ঠেলে দিল জলের পাত্রটা।

হাত ধুয়ে জামাটা গায়ে দিয়ে সনৎ ডাক্তার আনতে ছুটলো। ডাক্তারের বাড়ী গিয়ে সে দেখা পেল না, সেখান থেকে ছুটলো কবিরাজের বাড়ী। বৃদ্ধ কবিরাজকে নিয়ে সে যখন ফিরে এল, দেখল, ভিতরে হৈ-চৈ কাণ্ড বেধে গেছে।

ঘরের জিনিসপত্র তচ্‌নচ্‌ করা, বিছানা, বাক্স, দেরাজ, সমস্ত গৃহ-আসবাব একেবারে লণ্ডভণ্ড।

ঝি এসে কাঁদতে কাঁদতে তার একটা হাত দেখিয়ে বল্‌ল—ধরতে গেছলাম দাদাবাবু...আয়না ছুড়ে মারল...একেবারে রক্তারক্তি। কাঁচে কেটে গিয়ে বুড়ো মানুষ...

সনৎ একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। বল্‌ল—টুটু কই?

ঝি বল্‌ল—লোহার সাঁড়াশি নিয়ে ছেলেকে মারতে গেছল, আয়া নিয়ে পালিয়েছে!

বৃদ্ধ কবিরাজ মশাইয়ের কপাল কুঞ্চিত হয়ে উঠল। দরজার কাছে এসে দেখলেন, আলুথালু অবস্থায় উপুড় হয়ে তমসা পড়ে রয়েছে।

ধীরে ধীরে বললেন—কি হল মা তোমার?

তমসা এবার উঠে বসলো। দুটি চোখে তখন তার অশ্রুর ধারা নেমে এসেছে। ব্যাকুল হয়ে সে বলে উঠল—বড় কষ্ট পাচ্চি, অসহ্য হয়ে উঠেছে।

কবিরাজ 'মধ্যম-নারায়ণ' তেলের ব্যবস্থা ক'রে গেলেন।

তেলের শিশি হাতে করে' এনে সনৎ যখন তার মাথায় মাখাতে বসলো, তমসা এক সুযোগে শিশিটা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে আছাড় মেরে চুরমার করে' দিল।

কিন্তু সে রাত আর কাটলো না! সময় নিকট হয়ে এসেছিল।

আলোটা জ্বালাই ছিল। নিশুতি রাত। সবাই গভীর নিদ্রায় অভিভূত। তৃতীয় প্রহরের চাঁদ নিমগাছের মাথায় জ্যোৎস্না মাখিয়ে আকাশে জেগে বসেছিল।

ছাঁৎ করে এক সময় সনতের ঘুম ভেঙে গেল। অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে একটু আগে তার তন্দ্রা এসেছিল। উঠে বসে সে দেখল, পায়া ভাঙা আলমারির মাথায় ওপর একটা টুল, তার ওপর অসম্বৃত অবস্থায় তমসা দাঁড়িয়ে, হাতে একটা কাঁসার গেলাস। গেলাস দিয়ে ঘড়িটাকে শাসিয়ে চোখ লাল করে সে চীৎকার করে উঠল—অনাচারি! নাস্তিক! তোমার

ভালবাসা ? তোমার ভালবাসায় ধর্ম্ম আছে ?—বলতে বলতে বড় ঘড়িটার কাঁচের ওপর সে প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত করল।

ঘড়িটা তৎক্ষণাৎ চুরমার হয়ে দেয়াল থেকে মেঝের উপর সশব্দে ভেঙ্গে পড়ল। কিন্তু নিজে সে আর টাল সামলাতে পারলনা। টুল শুদ্ধ উল্টে হুড়মুড় করে আছাড় খেয়ে প'ড়ে গেল।

জিনিস-পত্র সরিয়ে তার ভিতর থেকে সনৎ যখন তাকে টেনে তুল্‌লো, তমসার সর্ব্বাঙ্গ তখন রক্তারক্তি। কপালের রক্ত চোখ বেয়ে ঠোঁটের ওপর নেমে এসেছে। তমসা খিল্ খিল্ করে হাসছিল।

ছায়াবাজি

ছোট শহরটির সীমান্তে,—কি একটা অখ্যাতনামা ইষ্টিশানের কাছাকাছি। জল-হাওয়া বোধ হয় একটু ভালই। পূজা-পর্ব্বে তাই চাকুরে বাবুদের ভিড় লাগে। সেবার বড়দিনের ছুটিটাও বাদ গেল না।

ছুটি মাত্র দিন দশেকের। এই কটা দিনকে উত্তমরূপে কাজে লাগিয়ে নেওয়া চাই। দেশে ফিরেই ত আবার সেই ঘানি-টানা! জল্পনাতেই দুদিন গেল। তৃতীয় দিনে তবু যাহোক্ একটি মিলন-কেন্দ্র ঠিক হল।

আড্ডা দিতে দয়া ক'রে অনেকেই আসেন। কুড়ি বছরের কাঁচা কেরাণী থেকে আমাদের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি যোগীনবাবু পর্য্যন্ত। আড্ডাটি যে উঁচুদরের তাতে আর কোন সন্দেহ নেই এবং দুটি জিনিস ছাড়া যে কোন বিষয় নিয়েই সেখানে আলোচনা চলতে পারে—রুচি-বিরুদ্ধ কোনো কথা ও নীতি-বিরোধী কোনো কাজ!

বেশ তাই তাই। মাত্র আটটা দিন বৈ ত' নয়! শীতটা সে দিন সত্যিসত্যিই একটু বেশী মাত্রায় পড়ে গিয়েছিল। উত্তুরে হাওয়া কি—যেন একরাশ ছুঁচ। এর ওপর ঝম্‌ঝমে বৃষ্টি যোগ দিয়ে সন্ধ্যের আগে থেকেই ভারি পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে। ঘর-দোর ইন্দি-ছিন্দি বন্ধ ক'রেও শীত-কাতর বাঙ্গালী-দেহের কাঁপুনি যেন আর থামতেই চায় না। বাইরের জমাট নিশুতি রাত্রি একাকার ক'রে একটানা সুরে শ্রাবণের ধারার মত তখন অবিরল বর্ষণ হচ্ছিল।

বাইরের 'ফাঁকা .মাঠের হাওয়া লেগে দরজাটা মাঝে মাঝে সশব্দে নড়ে উঠছিল। ঠিক অম্‌নি কোন্ এক সময় দরজা টেনে তাড়াতাড়ি একটি লোক ঘরে ঢুকে পড়ে বললে—অরাজক আর কাকে বলে! দেখছেন মশায় দেখছেন একবার, গরীবের উপর অত্যোচারটা একবার দেখছেন?

অকস্মাৎ লোকটির এমনি অনধিকার প্রবেশে সকলেই একটু চম্‌কে উঠেছিল। নরেনবাবু একটু সাহসী, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দিন কয়েকের জন্য তিনি সৈন্য বিভাগের দপ্তরে কেরাণীগিরি করেছিলেন। প্রয়োজন হলে তাঁর মিলিটারি রোক্ এখনও মাঝে মাঝে চেপে ধরে।

বললেন—কে মশাই আপনি? কি চান্?

লোকটি কথাটা গ্রাহ্যই করলে না। ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ ক'রে সকলের দিকে চেয়ে একটু হেসে বললে—আপনারা সকলেই বাঙালী দেখছি; ভারি খুসী হলাম।

তাউইমশাই ধার্ম্মিক লোক। বললেন—আহা বসুন, বসুন এই চৌকির ওপর ভাল ক'রে। বিদেশে কোন বাঙালীকে দেখলেই মনে হয় কতকাল ধ'রে যেন চেনাচিনি। আপনি কোথা থেকে আসছেন?—আরে মশাই, দুর্ভোগ কেন আর বলেন! শহরে গিছলাম ডাক্তার বাড়ীতে। জগতগঞ্জের মাঠ পেরোতেই দেখছেন না ঝড়বৃষ্টিতে একেবারে ওলোট-পালট হয়ে গেলাম!

বিভাস ছেলেটি ভাবপ্রবণ, কবিত্বময় এবং দরদী। সে বললে, ভিজে গেছেন একেবারে, ছুট্‌তে ছুট্‌তে এলেন বুঝি?

লোকটা বললে—এখনও যে হাঁপাচ্ছি—বুঝতে পেরেছেন না? যদি না ছুটি এই বৃষ্টিতে···কাশির রোগ আছে মশাই, বুঝলেন ত?—ব'লে সে হঠাৎ কাশতে সুরু ক'রে দিল।

যাই হোক, কী আর হবে! বাঙালীর কাছে বাঙালী এসেছে, অনাদরও করা চলে না। তাউইমশাই তখনই তার জন্য গরম দুধ, মোহনভোগ, এক পেয়ালা চা আর পানের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন।

অর্থনীতিক অমরেশবাবু একটু কৃপণ। তাই তিনি ঠিক সময়টি বুঝে একটি সিগারেট বার ক'রে এগিয়ে দিয়ে বললেন, নিন্, ধরান্। ভারি ঠাণ্ডা! কিন্তু আমাদের অকর্ম্মণ্য দেশের পক্ষে এমনি জল-হাওয়াই দরকার! ঠাণ্ডা না হলে পরিশ্রম করা চলে না, আর পরিশ্রম নৈলে পয়সা রোজগারও—। দেখুন না বিলেতের ওরা—

ডেপুটি যোগীনবাবু বিলাতের নাম শুনেই এবার কথা বলবার সুযোগ পেয়ে গেলেন। গড়গড়ার নল থেকে মুখ তুলে বললেন—তা নয় মশাই তা নয়। আমাদের এই অলস বাঙালী জাতটা হচ্ছে কুণো ব্যাঙ। এদের স্বভাব হচ্ছে ম্যালেরিয়ায় ভোগা আর কাজ হচ্ছে পরনিন্দা। কোনো দিন কি এরা উন্নতি করতে পারবে ভেবেছেন? ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের ক্যালেণ্ডার ঘাঁটুন, দেখবেন মাদ্রাজিরা আজকাল কি রকম—

সুযোগ পেলেই যোগীনবাবু এমনিভাবে স্বজাতিদের ভূলুণ্ঠিত করতে ছাড়েন না।

অরুণবাবু অনেকদিন বেকার থাকবার পর চাকরি পেয়েছেন। সুতরাং আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষা, সমাজ-রাজনীতি প্রভৃতির ওপর তিনি মর্ম্মান্তিক চটা। একদিকে তিনি যেমন সমাজবিপ্লবী সাম্যবাদী, অন্যদিকে স্বজাতির নিন্দা তিনি এতটুকু সহ্য করতে পারেন না। যোগীনবাবুর কথায় ফস ক'রে জ্বলে উঠে বললেন—আমি বরং মুটে মজুরের কাছ থেকে দেশের নিন্দে সহ্য করতে পারি কিন্তু রায়সায়েব কিংবা ডেপুটির কাছ থেকে দেশের সম্বন্ধে খোঁটা শোনা—অবশ্য যোগীনবাবুকে আঘাত করবার জন্যে আমি একথা বলছিনে।

বিভাস ব'লে উঠলো—দেশকে আমরা ভাল ক'রে কেউই জানিনে। শিক্ষা, সভ্যতা, সমাজ-রাজনীতি কিংবা আজকের এই নবজাগ্রত তরুণের দল—ঠিক এদের ভেতর দিয়ে দেশকে দেখলে ভুল করা হবে। দেশকে দেখতে হবে চোখ বুজে ভাবের দিক দিয়ে। রবিবাবুর কথায় আমাদের দেশ সত্যিই ভুবন-মন-মোহিনী! পায়ের তলায় নীল জল, মাথায় সোনার কিরীট, পূর্ব্ব প্রান্তে—অমরেশবাবু তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—ওসব চলবে না, বুঝলে বিভাস? আজকের যুগে আর যাই চলুক—কোনো সেন্টিমেণ্টাল্ আলোচনা চলবে না; আমাদের সবাইকেই নিতান্ত স্পষ্ট হতে হবে। এখনকার সব চেয়ে বড় সমস্যা হলো, কেমন ক'রে আমরা বাঁচবো!

আগন্তুক লোকটি চুপ ক'রেই এতক্ষণ বসেছিল। শেষের কথাটা শুনে হঠাৎ সে যেন সজাগ হয়ে উঠলো। একটু নড়েচড়ে তার আরক্ত চোখ দুটো তুলে বললে—ঠিক ব'লছেন, সব চেয়ে বড় সমস্যা—না, একে সমস্যা ব'লে ছোট করবো না—আমাদের অহোরাত্রের চিন্তা হলো কেমন করে আমরা বাঁচবো! যে দিকে দেখছি, সবাই যেন মৃত্যুর দিকে ছুটে চল্‌চে। আজ পর্য্যন্ত মানুষ যা কিছু ভেবেছে, যা কিছু কাজ করেছে, যা কিছু আবিষ্কার করেছে—সমস্তই তার নিশ্চিত মরণযাত্রার সহায় হয়ে উঠেছে;

তাইত! এ লোকটি এতক্ষণ চুপ ক'রেই ছিল যে! নিতান্ত সাধারণ মানুষটি সহসা সকলের মাঝখানে কেমন ক'রে যেন বিশিষ্ট হয়ে উঠলো। যোগীনবাবু মুখ থেকে নলটা নামালেন। সৈনিক নরেনবাবুর রোক্ উবে গেল। অর্থনীতিক অমরেশবাবুর কথার সূত্রটা যে এমনি ভাবপ্রবণতার পথ ঘেঁসে চললো—এজন্যে ক্ষুণ্ণ হয়ে তিনি এদিকে চেয়ে রইলেন। তাউই-

মশায়ের একটু আফিং খাওয়ার অভ্যাস, তিনি তাই চোখ বুজে ঘাড় হেঁট ক'রে রইলেন। বিভাস তখন বোধ করি মনে মনে আওড়াচ্ছিল—

'নীল সিন্ধু-জল, ধৌত চরণ-তল।'

বাইরে বর্ষণ-ধারার শব্দ তখনও থামেনি। আহত দস্যুর মত গোঁ-গোঁ ক'রে হাওয়া বইছিল।

একটু থেমে লোকটি বললে—আজকের পৃথিবীতে ভগবান মিথ্যে হয়ে গেছে, মানুষ তার মনুষ্যত্ব একেবারে ভুলে গেছে। শতাব্দীর সভ্যতা হয়ে উঠেছে আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। এ কেন বলতে পারেন?

সমাজ-বিপ্লবী অরুণ এবার ভয়ানক জোরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। বললে—এ শুধু সাম্রাজ্যলোভীর পাপে, বুঝলেন? আমার মনে হয় প্রত্যেক ব্যক্তিকে আজ সমান অধিকার দিতে হবে। সাম্যবাদই হচ্ছে আজকের যুগে বাঁচবার সব চেয়ে বড় উপায়। এর মধ্যে কোনো ভাবের ঘোর নেই!

লোকটি একটু হেসে বললে—মানুষকে স্বাধীনতা দিলেই যে সে বড় হয়ে উঠবে, এ ভুল আপনাদের ভেঙে যাওয়া দরকার। মানুষ বাঁচে মানুষের প্রীতির মধ্যেই। শিক্ষা, সভ্যতা এবং জ্ঞান এ তিনটিই এ যুগের সব চেয়ে বড় মূলধন। কিন্তু একটি বস্তুর অভাবে আজও এরা সার্থক হয়ে উঠতে পারেনি। সে হচ্ছে, মানুষের প্রতি মানুষের সহজ প্রেম। জীবনের প্রতি একান্ত মমতা।

অমরেশবাবু এবার ভুরু কুঁচকে অবজ্ঞার হাসি হেসে বললেন—কিছু মনে করবেন না, এবার আপনাকে বেশ বুঝতে পেরেছি। ঐ প্রেম জিনিসটি হচ্ছে একেবারে ধোঁয়া। হ্যাঁ, স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধে যদি ওটা বলতেন তা হলেও না হয়—

বিভাস এতক্ষণ বোধ করি সিন্ধু-জলে সাঁতার কাটছিল। সে ব'লে উঠলো—অমরেশবাবুর কাছে চকচকে চাকৃতি ছাড়া বাদবাকি জগতটাই হচ্ছে নিতান্ত ধূম্রময়ী!

অমরেশ বললেন—বিভাসচন্দ্রের চোখের কাজল আজও মোছেনি দেখছি!

বিভাসের বদলে ওই লোকটিই উত্তর দিলে। বললে—এটা চোখের কাজল নয়, এ হচ্ছে সত্যিকারের কাল্‌চার। আমরা বস্তুজ্ঞানের অস্ত্র দিয়ে কাল্‌চারকে হত্যা করেছি। স্বাধীনতা মরেছে সভ্যতার পায়ের তলায়।

আজ বাইরের চেয়ে নিজেদের দিকেই আমাদের ফিরে যেতে হবে। আত্মবিশ্লেষণই হচ্ছে আমাদের এই পৃথিবীব্যাপী হত্যাশালা থেকে মুক্তি পাবার উপায়!

অমরেশ একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। বললেন—প্রেমকে আপনি কি রকম ভাবে নিতে চান্?

লোকটি বললে—প্রেম হচ্ছে জীবনের একমাত্র অবলম্বন। এ'কে না হলে কারো চলবে না। জীবনের প্রকাণ্ড বৃক্ষ এই বস্তুটি থেকেই রস টেনে নিজেকে চারিদিকে পরিব্যাপ্ত-প্রসারিত ক'রে দেয়। একে বাদ দিয়ে চল্‌লে বেঁচে থাকার কোনো সার্থকতাই নেই।

শেষ কথাটির ওপর এত জোর পড়লো যে সকলেই একবার মুখ তুলে চেয়ে দেখলেন।

লোকটি বলতে পারে ভালই কিন্তু সব জড়িয়ে তাকে তেমন ভাল লাগে না। অবিন্যস্ত জটার মত এলোমেলো কতকগুলো মাথার চুল, শুক্‌নো চেহারা, চোখদুটো লাল, দাড়ি-গোঁফে মুখখানা একাকার; চেহারাটা যেন হতশ্রী! লোকের সহানুভূতির চেয়ে সন্দেহই যেন বেশী আকর্ষণ করে।

ডেপুটি যোগীনবাবু নলটা মুখ থেকে নামিয়ে গড়গড়াটা সরিয়ে রেখে নিঃশব্দে ভিতরে চলে গেলেন। বুড়ো হয়েছেন,—প্রেমের আলোচনা তিনি এখন আর সইতে পারেন না।

তাউইমশাই ব'লে উঠলেন—আমাকেও সঙ্গে করে নিয়ে গেলে ভাল করতে, বুঝলে বেয়াই?

বেয়াই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে বললেন—তুমি বসে থাকো হে। আফিং খেতে ভালবাসো গাঁজাখুরি কথাগুলোও ওই সঙ্গে ভাল লাগবে!

সমাজবিপ্লবী এবং দেশভক্ত অরুণ অবজ্ঞার হাসি হেসে বললে,—যোগীনবাবুর জীবনে সব চেয়ে বড় দুঃখু হলো ওঁর মা-বাপ কেন বিলেতে জন্মাননি।

কিন্তু তার কথাটা কোথা দিয়ে কেমন ক'রে যেন ভেসে গেল। নবাগত লোকটির শেষ কথাটা তখনও যেন ঘরের চারিদিকে দেওয়ালে দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সকল কথার আড়ালে কি যে একটি গভীর কথা সে বলতে চায়—আজকের এই অন্ধকার দুর্যোগের রাতে তার জীবনের কোন্ মূক একটি বেদনাকে হয়ত সে এই অপরিচিত অজ্ঞাত আলাপীদের

কাছে ভাষায় বেঁধে দিয়ে যেতে চায়,—এই কথাটিই ক্ষণে ক্ষণে সকলের মনে হচ্ছিল।

অমরেশ বললেন—আপনি যার কথা বলতে চান সে রকম প্রেম ত পৃথিবীতে নিতান্তই অসম্ভব বস্তু। তা নিয়ে স্বপ্ন দেখাই চলতে পারে, সত্য হয়ে উঠতে পারে কি কোনো দিন ?

পারে! লোকটি বললে—আমরা আকাশে উড়তে পারি, জলের তলায় যুদ্ধ করতে পারি, গাছের হাসিকান্না আবিষ্কার করতে পারি, এত বড় শক্তি আমাদের রয়েছে—কেবল মানুষকে ভালবাসবার শক্তিই আমাদের নেই।

অরুণ বললে—আছে, নিশ্চয়ই আছে। আছে ব'লেই আমরা আজও সেই শক্তির কল্পনাও অন্তত করতে পারছি।

বিভাস বললে—জগতটা হচ্ছে শুধু আনন্দের প্রকাশ, আনন্দ থেকেই আমাদের উদ্ভব এবং পরস্পরের প্রীতিই যে আনন্দের স্বরূপ—এই ভাব, এই স্বপ্নও আমাদের ভুললে চলবে না। আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই ভারত একদিন—

চুপ কর হে, চুপ কর—অমরেশ তাকে আবার থামিয়ে দিলেন—তোমার ভাব-রসের রসিক সকলেই নয়। জমীদারের ছেলে তুমি, কত ধানে কত চাল ত আর জানো না ভাই!—আচ্ছা, আপনার কথাই আবার বলুন, শোনা যাক্। আপনার নিজস্ব যে একটা কাল্‌চার আছে এ কথা আমি মেনে নিচ্ছি। জীবনে বোধ হয় আপনি দুঃখ পেয়েছেন খুব, কি বলেন ?

লোকটি একটুখানি হাসলে। এ হাসির মধ্যে কোথায় যে একটি সুনিবিড় বেদনা লুকিয়ে আছে, কিংবা এ হাসি সংসারের সমস্ত উদ্বেগের প্রচ্ছন্ন একটি বিদ্রূপের প্রকাশ, অথবা এ হাসিটুকুর মধ্যে নিজের প্রতি কোনো অনুকম্পা ছিল কি না,—কিছুই বোঝা গেল না।

তাউইমশাই শুধু একবার ঘাড় তুলে আবার হেঁট হয়ে রইলেন। তিনি ধর্ম্মালোচনার অপেক্ষায় কাল যাপন কচ্ছিলেন।

লোকটি বললে—কিছুই না। সত্যকারের দুঃখের কি কোনো বর্ণনা আছে, আপনি বল্‌তে চান্ ?

—সে কি! নেই ? এই যে সংসারের এত—

আবার হেসে লোকটি বললে—সংসারের অনেক দুঃখই আছে; যার

অন্নবস্ত্র নেই, যার স্বাধীনতা নেই, যার আশ্রয় নেই, তার জীবন হয়ত শুধু বিধাতার রসিকতা। কিন্তু আমি এদের মোটেই দুঃখ বলি না। নৈলে—

অমরেশ ব'লে উঠলেন—ক্ষমা করবেন, এক মিনিট আগে আপনাকে হঠাৎ একটু ভুল বুঝেছিলাম। আপনি যা বলছেন তা যে শুধু আমরাই বুঝচিনে তা নয়, আপনি নিজেও এ সম্বন্ধে কিছু বোঝেন না। অবশ্য আজকের ঠাণ্ডায় বাদলায় আপনার হেঁয়ালী যে একেবারেই খারাপ লাগছে তা নয় ; কিন্তু লেখাপড়া আমরাও কিছু কিছু জানি. একটু ভেবেচিন্তে বললে খুসী হই।

সমাজতন্ত্রবাদী এবার চট্ ক'রে অর্থনীতিকের দলে ভিড়ে গেল। বললে —সত্যিই তাই। অর্থপিশাচ ধনিকেরা আজ সর্ব্বত্র যে মানুষের টুঁটি টিপে রক্ত খাচ্ছে, সাম্রাজ্যলোভীরা পরাধীন জাতিকে পায়ের তলায় মাড়িয়ে যাচ্ছে, —এরা যে সব দুঃখের সৃষ্টি করেছে সেগুলো কিছুই না, আর মানুষের সামান্য কল্পনার সৌখীন চিন্তা, সেই হবে দুঃখের বিশ্লেষণ ? এ সত্যই দুঃখের কথা।

লোকটি বললে—মার্জ্জনা করবেন, এসব আমার কথা মাত্র। আপনাদের কাছে যে এর কোনো দাম হবে এ সন্দেহও আমার নেই। তা ছাড়া এ আমার মতামতও নয়। মনে আসচে তাই ব'লে যাচ্ছি, কাল হয়ত অন্য কোথাও ঠিক এর উল্‌টো কথাই বল্‌বো।—পরে একটু হেসে বললে—আমার একটা গুণ আছে, আমি প্রতিদিন নিজেকে আবিষ্কার করতে পারি।

বিভাস এবার একটু সরে এসে বসলো। মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে শুধু বললে— আপনার নাম কি ?

—নাম ? আমার নাম সিদ্ধেশ্বর পাঠক। কেন বলুন ত ?

—আপনার মত লোকের দেখা পাওয়া সৌভাগ্য !

অমরেশ তখন উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে একদিকে চেয়েছিলেন। এবার বললেন—আপনার সমাজ নেই, প্রচলিত সংস্কার আপনি মানেন না, আপনার কোনো ধর্ম্ম নেই, দুঃখটাও আপনার কাছে একটা বাজে কথা।

সিদ্ধেশ্বর বললে,—বাজে কথা ত বলিনি। আমি বলতে চাই জগতে সব চেয়ে বড় দুঃখ হচ্ছে, নিজের সম্বন্ধে ভয়ানক চেতনা। এ যে জীবনের কত বড় ব্যথা—

অমরেশের মাথা আবার গোলমাল হয়ে গেল, কৌতূহল দমন ক'রে বললেন—এ আপনি সত্য বলচেন ?

অরুণ এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিল। হঠাৎ অমরেশের প্রশ্নটাকে চাপা দিয়ে বললে—নরনারীর প্রেমের ব্যাপারেও বোধ হয় আপনার কোনো বিশ্বাস নেই?

রাত ওদিকে অনেক হয়ে গেছলো। তাউইমশাই কি জানি কেন, এতক্ষণ মাঝে মাঝে উস্‌খুস্‌ কচ্ছিলেন।

সিদ্ধেশ্বর হেসে বললে—নেই বললেই ত আমার পক্ষে ভাল হতো। আর প্রেম ব'লে সত্যিই যে কোনো বালাই নেই, এই কথাই আমি সকল দিকে প্রচার করতে চাই। বিশেষতঃ নরনারীর সম্বন্ধে এত বড় মিথ্যা, এত বড় ফাঁকা কথা বোধ হয় আর কিছু নেই।

বিভাস কাতর হয়ে ব'লে উঠলো—সে কি দাদা, এ আবার আপনি কোন্ পথে ছুটচেন? আপনার জীবনে প্রেম কি একেবারেই বাজে কথা? সত্যিই কি সেখানে প্রেম নেই?

সিদ্ধেশ্বর শেষের প্রশ্নটিতে একেবারে যেন হতচকিত হয়ে গেল। উড্ডীয়মান পাখীর ডানা কেটে নিলে তার যে অবস্থা হয়, সেও তেমনি যেন হঠাৎ ভূলুণ্ঠিত হয়ে অসহায়ক্লিষ্ট, আচ্ছন্ন কণ্ঠে বলতে লাগলো,—আছে ভাই; আছে ব'লেই তাকে এত বড় আঘাত করলে সাহস করি! আচ্ছা, রাত এগারোটা বাজতে একটু দেরী আছে, কি বলেন? প্যাসেঞ্জার গাড়ীখানা কখন ছাড়ে কে জানে!

অমরেশ বললেন—খানিকটা দেরী আছে বটে ছাড়তে।

বিভাস বললে—তা থাকুক, আপনার প্রেমের গল্প না শুনে আপনাকে যেতে দেওয়া হবে না। বলুন!

এক অত্যাশ্চর্য্য বিয়োগান্ত প্রেমের গল্প সিদ্ধেশ্বর স্নুরু ক'রে দিল। কিন্তু গল্পটি প্রায় যখন শেষ হয়ে এসেছিল তখন হঠাৎ ওপাশের জানালার ধারে অনেকগুলো লোকের গলার আওয়াজ শোনা গেল।—

বাবুজি?—বাবুসাহেব?

সকলে চমকে উঠে জানলার দিকে চাইলে। তাউইমশাই আঁৎকে উঠে বললেন—কোন্ হ্যায়?

উত্তর পাওয়া গেল না; কিন্তু মিনিট দুই পরেই দেখা গেল, একটি ক্রন্দনরত ভদ্রলোকের সঙ্গে একজন জমাদার, একজন দারোগা আর দুটি কনষ্টেবল ওদিক দিয়ে ঘুরে এসে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলো। দারোগাটি নমস্কার জানিয়ে

বললে—ক্ষমা করবেন, এখানে একটি লোককে খুঁজতে এসেছিলাম। যজ্ঞেশ্বর ঘটক এখানে কার নাম?

সকলেই বজ্রাহতের মত তাকিয়ে রইলো। রোরুদ্যমান ভদ্রলোকটি চোখ মুছে বললেন—এখানে সে নেই দারোগাবাবু।

সিদ্ধেশ্বর ইতিমধ্যে কখন যে অদৃশ্য হয়ে গেছে কেউ জানে না।

অমরেশ বললেন—সিদ্ধেশ্বর পাঠক বলে একটি লোক—

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই লোকটাই। মাঝে মাঝে এই নামে চলে। কোথায় সে মশাই? কোথায় বলুন ত?

এই ত বসেছিল এখানে এতক্ষণ। বৃষ্টিতে ভিজে বেচারা···আর ত দেখতেই পাচ্ছি না। বোধ হয় ইষ্টিশানের দিকে গেছে। একটু আগে গাড়ী ছাড়বার সময় জিজ্ঞেস কচ্ছিল। কি দরকার তাকে বলুন ত?

দারোগাবাবুর দল দ্রুতবেগে প্রস্থান কচ্ছিল। তিনি বললেন,—দাগী আসামী মশাই, কেবল পালিয়ে বেড়াচ্ছে।—হতভাগা বদ্‌মাইস, চরিত্রহীন!

তিনিও তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন! বাইরে ঝড়-বৃষ্টি থেমে গিয়ে তখন ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে।

তাউইমশাই বললেন—মদের গন্ধ পেয়ে তখুনি আমি টের পেয়েছিলাম, বুঝলে মিলিটারি? কিন্তু যাই বল, ডেপুটি আমাদের খুব মানুষ চেনে। নৈলে যে লোক ধর্ম্ম মানে না—

মিলিটারী নরেনবাবু প্রস্তরবৎ বসেছিলেন।

অকস্মাৎ সেই মুহূর্ত্তে ওদিক থেকে বিভাস চীৎকার ক'রে উঠলো,—তাউই-মশাই, একি বলুন ত? আমার মনিব্যাগ? এই যে পকেটে ছিল···অনেক টাকা······

—অ্যাঁ?

রুদ্ধশ্বাসে বিভাস বললে—ব্যাঙ্ক থেকে ফিরে আর বাড়ী ঢুকিনি। অনেক টাকার নোট ছিল তাউইমশাই!

—বাঃ চমৎকার!—বসে বসে প্রেমের গল্প শুনছিলে বুঝি? দক্ষিণা দিতে হলো ত? এখন কি করবে?

অর্থনীতি এবং সমাজতন্ত্রবাদ তখন একেবারে চুপ।

রোগা

আপিসে না গেলেই নয়। শরীরটা ভালো যাচ্ছে না অনেক দিন থেকে। কিন্তু আমাকে দেখা মাত্রই ইদানীং কেরানী মহলে সাড়া ওঠে,—এবার বেশ জমিয়ে ব'সে একটা গল্প বলো দেখি! এক একদিন এমন হয় যে, সবাই মিলে নাছোড়বান্দা; কাজকর্ম ছেড়ে সকলে গুছিয়ে ব'সে আপিস ঘরে শুধু গল্প। কিন্তু গল্প বলতে বসলেই যে গল্প বলা যায়, এ আমি মনে করিনে। তাছাড়া যেটা বললুম, সেটা হয়ত জমলো না; কিংবা যেটাকে গল্প মনে ক'রে বললুম, লোকে সেটা শুনে হয়ত বললে, এ বস্তু আর যাই হোক,—গল্প নয়। সুতরাং গল্প বলা একটা সমস্যা বৈকি। কল্ টিপলে মেসিন ঘোরে, কিন্তু গল্পের দাবি নিয়ে কোনো এক ব্যক্তির গলা টিপলে সে ব্যক্তির কেবল মাথাই ঘোরে।

সেদিন আমাদের পাড়ায় নবকেষ্টবাবুর ডাক্তারখানায় একটুখানি বসেছি মাত্র, অমনি ওরা ধরেছে,—গল্প বলো। রুগ্ন শরীর নিয়ে কোথায় বা যাই, তাই কাছাকাছি ডাক্তারখানায় দু'দণ্ড সময় কাটাতে এলুম,—এখানেও এই বিপত্তি। তোমার মেজাজ-মর্জি যেমনই থাক্, অসুখবিসুখ যাই হোক, তুমি যেহেতু গল্প জানো, সেই হেতুই তোমাকে গল্প বলতে হবে। অসুস্থ হ'লেও তোমাকে বলতে হবে, ইচ্ছে না থাকলেও বলতে হবে।

ডাক্তারবাবুর আসতে দেরি হচ্ছে, সুতরাং কিছুক্ষণের জন্য বেরিয়ে পড়লুম। আবার আমাকে ঘুরে এখানেই আসতে হবে। বলা বাহুল্য, একটু বিরক্ত হয়েই আমি কাছাকাছি এক পার্কে এসে ঢুকলুম। পার্কে আসাও বিপদ, চেনা লোক দেখলেই ধ'রে বসবে, গল্প বলো। তবে পার্কে আজকাল বড় একটা আসাও হয় না। তা ছাড়া এলেও যে একটু নিরিবিলি বসবার জায়গা খুঁজে পাবো তাও অসম্ভব। আজকাল আবার মেয়েরাও পার্কে ভীড় করে। ফলে, বিকেলবেলাটা পার্কে এমন মেয়ে-পুরুষের ভীড় হয় যে, নিরিবিলি হাঁটাচলা একেবারে দুরাশা।

হঠাৎ চোখে পড়লো দক্ষিণ সীমায় প্রায় বড় রাস্তাটার ধারেই একখানা বেঞ্চি খালি। রোগা শরীর নিয়ে ঢুকেছি, একটুখানি বসবার জায়গা পেয়ে ভারি আনন্দ হোলো। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বেঞ্চিখানার কোণে খুশী হয়ে ব'সে পড়লুম। চারিদিকে থৈ থৈ করছে মেয়ে আর পুরুষ। ছোট ছেলে-

মেয়েরা এখানে ওখানে খেলা করছে। সারাদিন গুমোটের পর মধুর বাতাস বইছে।

আমার বেঞ্চির পিছন দিকের পথ দিয়ে অবিশ্রান্তভাবে বায়ুসেবীর দল আনাগোনা করছে। কা'রো দিকে তাকাবার, কিছু লক্ষ্য করবার কোনও কৌতূহল আমার নেই। খানিকটা সময় কোনো মতে কাটাবো, এই উদ্দেশ্য।

আধ ঘণ্টা প্রায় কেটে গিয়েছে, এমন সময় সহসা আমি কি যেন কি কারণে একটু সচেতন হয়ে উঠলুম। আমার আন্দাজটা সম্পূর্ণ নির্ভুল কিনা আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না। কিন্তু আমার মনে হোলো, আমার পিছন দিয়ে যে অসংখ্য মেয়ে-পুরুষ আসছে আর যাচ্ছে, ওদের মধ্যে বিশেষ ক'রে একজন যেন একটু অন্যরকমের। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই, সে ব্যক্তি পুরুষ নয়, মেয়ে। তার আনাগোনাটা যেমন দ্রুত, তেমনি ঘন ঘন। চুপ ক'রেই রইলুম। ঘাড় ফিরালে পাছে আমার কৌতূহল প্রকাশ পায়, এজন্য যথাসম্ভব বৈরাগ্য বজায় রেখে নিজের মনেই ব'সে রইলুম। তখনও সন্ধ্যা হয়নি, শেষ বেলাকার আলো বেশ আছে।

পাঁচ সাত মিনিট পরেই দেখি, ঠিক সেই মেয়েটি হঠাৎ থমকে দু'পা এগিয়ে আমারই বেঞ্চির ও-কোণে এসে বসলো। বুঝতে পারা গেল, অনেকক্ষণ থেকেই সে ইতস্ততঃ করছিল। মেয়েটি সুশ্রী—তবে পরিচ্ছদটা তেমন কিছু মূল্যবান নয়। তার হাতে কাগজ-মোড়া এক মুঠো পান ছিল, তার থেকে একটির পর একটি পান নিয়ে মুখে পুরতে লাগলো। বয়স বছর পঁচিশের মধ্যে, কিন্তু ভাবভঙ্গী বেশ সহজ। এক সময় মুখ থেকে পানের রস পড়লো আঁচলে—ভ্রূক্ষেপ করলো না। আজকাল পানের দোকানের আয়নার সামনে মেয়েরা দাঁড়িয়ে পান কিনছে, এ মেয়েটিও খুব সম্ভব দোকান থেকেই পান কিনে এনেছে। আশা করা যাক ভদ্র ঘরেরই মেয়ে। মেয়েটির স্বাস্থ্যশ্রী বেশ উজ্জ্বল—কিন্তু যাক, অন্যদিকেই আমার মুখ ফেরানো ছিল। এবার উঠবো। এতক্ষণে হয়ত নবকেষ্টবাবু ডাক্তারখানায় এসে পৌচেছেন। গিন্নী মাথার দিব্যি দিয়ে বলেছেন, সন্ধ্যের আলো জ্বললেই বাড়ী ফিরো। রোগা শরীরে যেন ঠাণ্ডা লাগিয়ো না।

এই উঠি আর কি। এমন সময় হঠাৎ মেয়েটি আমার দিকে ফিরলো। বললে, একটি কথা জিজ্ঞেস করলে কিছু মনে করবেন?—হ্যাঁ, আপনাকেই বলছি।

মুখ ফিরিয়ে তাকালুম। সলজ্জ শান্ত চেহারা। কণ্ঠস্বর সহজ, শিষ্ট। সে প্রশ্ন করলো, আপনার কি মনে আছে, রাঁচীতে আপনাকে দেখেছিলুম? সেখানে কি আপনি চাকরি করতেন?

রাঁচীতে?—আমি অবাক।—কবে বলুন ত?

কেন, গেল বছর? আপনার মনে পড়ছে না?

গেল বছর! আপনি বোধ হয় ভুল করছেন, আমি নই। সাত আট বছরের মধ্যে আমি রাঁচী যাইনি।

মেয়েটি বললে, ও, তাহলে আমারই ভুল—আমায় ক্ষমা করবেন।—একটু থেমে সে আবার প্রশ্ন করলো, এখানে আপনি কোথায় থাকেন?

বললুম, এই কাছাকাছি—ওই পূবদিকের গলিতে। পোওয়াটাক রাস্তা।

সে বললে, এবার কলকাতায় কী গরম দেখেছেন? বৃষ্টির নাম-গন্ধও নেই! রোদ একটু কমতে না কমতেই লোকেরা পিলপিল ক'রে পথে বেরিয়ে পড়ে!

মেয়েটির কথাবার্তা ভদ্র বৈ কি। তবে ফরাসী দেশে নাকি এইভাবেই বন্ধুত্ব হয়। কিন্তু এটা ভারতবর্ষ, তাই একটু আড়ষ্ট হচ্ছিলুম। তবে তার কথাবার্তায় এমন সরলতা ছিল যে, আমাকেও একটু সৌজন্য রক্ষা করতে হোলো। বললুম, আপনাদের বাড়ী কোন্ দিকে?

বেশী দূরে নয়, এখান থেকে ধরুন মিনিট দশেকের পথ!

বাড়ীতে কে কে আছেন আপনার?

মেয়েটি হাসলো। বললে, গেরস্থ ঘরে সাধারণত যারা থাকেন তাঁরাই আছেন? আমি আমার বাবার ওখানেই থাকি।

বললুম, আপনার স্বামী কি করেন?

স্বামী!—ওকথা থাক্, আপনি অন্য কথা বলুন।—পান চিবানো বন্ধ ক'রে মেয়েটি একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

ডাক্তারখানায় এতক্ষণে বোধ হয় নবকেষ্টবাবু এসেছেন: ভাবলুম এবার আমি উঠি। কিন্তু পুনরায় মেয়েটি বললে, আপনাকে অনেকক্ষণ ধ'রে লক্ষ্য করছিলুম, কিন্তু এমন ভুল হবে আমি ভাবিনি। অবিকল আপনি সেই ভদ্রলোকটির মতো দেখতে। এমন মিল দেখা যায় না।

বললুম, কে সেই ভদ্রলোক?

চেনা লোক, খুবই চেনা। কিন্তু আশ্চর্য,—চিনতে পারলুম না। চিনতে পারলে ভালো হোতো। অনেক কথা ছিল।

এবার আমি মুখ তুলে তাকালুম, এবং মেয়েটিও আমার চোখের উপর চোখ রাখলো। দেখলুম সে-চাহনি অত্যন্ত নির্মল, এবং প্রসন্ন। নিজের সন্দেহের জন্য নিজেকেই আমি ধিক্কার দিলুম। মেয়েটি আমার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রেই বললে, আপান আমার একটু উপকার করবেন?

ভ্রূকুঞ্চন ক'রে তাকালুম। কৌতুকজনক বটে।

মেয়েটি বললে, আমি বড় কষ্ট পাচ্ছি, বিশ্বাস করুন।

সোজা হয়ে নড়ে চ'ড়ে বসলুম। গলা পরিষ্কার ক'রে বললুম, আপনাকে দেখে ত' মনে হচ্ছে না, কোনো কষ্ট পাচ্ছেন?

মেয়েটির কণ্ঠস্বরে কাঁপন লাগলো। বললে, বাইরে থেকে কিচ্ছু টের পাবেন না। মেয়ে মানুষ বেশী কষ্ট পায় ভেতরে, সকলের মাঝখানে থেকেও সকলের চেয়ে বেশী কষ্ট পায়। আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন।

আমাদের পিছন দিকে অবারিত লোকজন আনাগোনা করছে। দেখে যাচ্ছে অনেকে, কারো বা চোখে মুখে কিছু সরল কৌতূহল দেখা যাচ্ছে। সন্ধ্যার বিলম্ব নেই। শান্তকণ্ঠে বললুম, আপনি ত' স্বামীর কাছে এসব আলাপ আলোচনা করতে পারতেন?

স্বামী যদি বন্ধু না হয়, তার কাছে কি মনের কথা কেউ বলে? তা ছাড়া এমন কথাও আছে, স্বামীর কাছে কোনোমতেই বলা যায় না! স্ত্রীর মন আর স্ত্রীলোকের মন এক নয়!

মেয়েটির চিন্তাশীলতা দেখে আমার চমক লাগলো। এ নিতান্ত রাস্তা-ঘাটের পান-খাওয়া ঢলঢলে মেয়ে নয়। উচ্চশিক্ষার পালিশ আছে। আস্তে আস্তে বললুম, আপনার জন্যে আমি কি করতে পারি বলুন?

পানের রস আবার গড়িয়ে এসেছে তার ঠোঁটের কোণ বেয়ে। মনে হচ্ছে ঈষৎ অসতর্ক, একটুখানি অমনোযোগী। বসবার ভঙ্গীও যেন একটু অগোছালো। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে সে বললে, আগে কথা দিন আমার একটি সামান্য অনুরোধ রাখবেন?

অনুরোধ? কি রকম?

যে-যন্ত্রণা আমি সহ্য করছি, আপনি তার প্রতিকার করুন এই অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনি দয়া ক'রে আমার অনুরোধ রাখুন!

মেয়েটির আকুলতা দেখে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। এবার বোধ-

হয় আমার রোগা শরীরে ঠাণ্ডা লাগছে। নবকেষ্টবাবুর ডাক্তারখানা হয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরবো।

আপনি কি উঠছেন ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার স্ত্রী অপেক্ষা করছেন, আমার জন্যে ! মেয়েটি ব্যাকুল হয়ে হাতখানেক স'রে এলো। বললে, যাবেন না! আরেকটু বসুন—! তবে যে বললেন, আমার অনুরোধ আপনি রাখবেন ?

আবার আমাকে বসতে হোলো। বললুম, অনুরোধ রাখবো একথা ঠিক বলিনি !

আপনি যে কথা দিলেন তখন ?

কথা! কই, না ?

মেয়েটি তেমনি আকুল কণ্ঠে বললে, একটি মেয়ে যদি আপনার চোখের সামনে ছটফট করে, আপনার মনে কোনো দাগ পড়ে না ?

এবার আমি একটু হাসলুম। বললুম, তাহলে সত্য কথাই বলি। তখন থেকে আগাগোড়া আপনার মনের কথাটা আমি ঠিক ধরতে পাচ্ছিনে।

উত্তেজনায় মেয়েটির কণ্ঠ কেঁপে উঠলো। বললে, চোখ দিয়ে আপনি আমাকে দেখছেন, মন দিয়ে ত' দেখছেন না ? গুলীর আঘাত খেয়ে রক্ত-মাখা হরিণ মাটিতে প'ড়ে ছটফট করছে। সে কি চায়—আপনি বোঝেন না ?

বুঝি—সে মৃত্যু চায়! কিন্তু বিকেলবেলা পার্কে হাওয়া খেতে এসে আপনার মতন হাসিখুশী মেয়ে ত' আর মরতে চায় না!

মেয়েটি বললে, কী দুর্ভাগ্য আমার! আপনি আমার সেই চেনা লোকটি নন্, এই দুঃখ। এইজন্যেই আমাদের প্রফেসর বলেন, পুরুষের চোখ দিয়ে মেয়েদের মনকে জানাটা কিছুতেই সত্য হয় না!

বললুম, আপনি কি তবে মরতে চান ?

নিশ্বাস ফেলে সে বললে, হ্যাঁ, মরতে চাই।

উত্তপ্ত কণ্ঠে বললুম, যে-ব্যক্তি মরতে চায়, সে ত' পান চিবিয়ে লোকের সঙ্গে আলোচনা করতে বসে না! পার্কে এসে একজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে যে মেয়ে মরবার আলোচনা পাড়ে, সে মেয়ের অবিশ্যি মরাই উচিত, তবে কিনা সে মেয়ে সহজে মরে না!

আমার তিরস্কারে সে দমলো না। বললে, কেন মরে না ?

বললুম, না, সে মরে না। শুধু মরবার ভয় দেখিয়ে সে অন্যের কাছ থেকে সুবিধা আদায় করে। তবে আপনাকে স্পষ্টই বলি, আমার পকেটে টাকাকড়ি বিশেষ কিছু নেই, শুধু ওষুধের দামটা আছে। এর পরেও যদি আপনার কোনো বক্তব্য থাকে, তাহলে পুলিশকে ডেকে এবার আমাকে সব কথাই প্রকাশ করতে হবে।

আশ্চর্য, লক্ষ্যই করিনি এতক্ষণ মেয়েটির দুই চোখ বেয়ে ঝরঝরিয়ে জল নেমে এসেছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে এবার বললে, আমার মরবার স্বাধীনতাও নেই বলতে চান? আমাকে বাঁচাবার চেষ্টা কেউ করে না, কিন্তু মরতে গেলে সবাই বাধা দেয়।

বললুম, আপনার আত্মহত্যার সব পথই ত' খোলা আছে।

জানি!—মেয়েটি এদিক ওদিক তাকিয়ে চাপা কণ্ঠে কেঁদে ফেললো। পুনরায় বললে, বিষ আছে, দড়ি আছে, আর আছে পুকুরের জল, কেরোসিন তেল, রেলের লাইন, ইলেক্‌ট্রিকের তার—কিন্তু—কিন্তু আপনি আমাকে ব'লে দিন কোনো একটা মৃত্যু, যেটায় কোনো যন্ত্রণা নেই!

আশেপাশে লোক চলাফেরা করছে। ভয়ে ভয়ে আমি চুপ করলুম। অধীর কান্না কেঁদে মেয়েটি আবার বললে, বড় কষ্ট পাচ্ছি, আমার জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে সব,—আমাকে দিন এমন কিছু যাতে আমার ঘুম আর না ভাঙ্গে, আমি···আমি কেবল চিরকালের জন্যে ঘুমিয়ে পড়তে চাই।

মেয়েটি এমন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো যে, হতবুদ্ধির মতো আমি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলুম। আমার বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেল।

পিছন থেকে এই সময়ে হঠাৎ একটা ডাক শোনা গেল। সচেতন হয়ে দেখি, সন্ধ্যার আলো সবেমাত্র জ্বলেছে, এবং একটি হিন্দুস্থানী ছোকরা পার্কের রেলিংয়ের বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকছে, এ দিদি?

সে তার হিন্দিভাষায় জানালো, দু' আনা পানের দাম সে পাবে। বহুৎ টাইম সে পয়সার জন্য এখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে।

চোখ মুছে মেয়েটি এবার বললে, দেখছেন ত' সেই থেকে কুকুর লেগেছে আমার পেছনে।

কুকুর!—জিজ্ঞেস করলুম, তা'র মানে?

[illegible], কুকুর আমাকে তিষ্ঠতে দিচ্ছে না!

কিন্তু আর কোন জবাব দেবার আগে তিন চারটি ভদ্রলোকের সঙ্গে

একজন বর্ষীয়সী সম্ভ্রান্ত মহিলা তাড়াতাড়ি এসে আমাদেরকে ঘিরে দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি ক'রে উঠলেন, এই যে এখানে···পেয়েছি···সর্বনাশী, এই তোর মনে ছিল? সারাদিন ধ'রে বাড়ীসুদ্ধ লোক পথে-পথে খোঁজাখুঁজি করছে···মরণ নেই তোর?

আমি বিমূঢ়, হতচকিত। ভদ্রলোকেরা মেয়েটিকে গ্রেপ্তার করলো।

বর্ষীয়সী মহিলা বললেন, তুমি কে বাবা জানিনে, তবে আমার মেয়ে বোধ হয় তোমাকে পেয়ে গল্প ফেঁদেছিল! চল্ পোড়ারমুখী, বাড়ী চল্, রাস্তাঘাটে এই কেলেঙ্কারী, তোর মরণ হ'লেই বাঁচি!

ওর মধ্যে একজন গিয়ে পানওয়ালাকে তার প্রাপ্য দিয়ে দিল। তারপর জন দুই ভদ্রলোক এবং মহিলাটি মেয়েটিকে পাকড়াও ক'রে নিয়ে অগ্রসর হলেন। দুমিনিটের মধ্যেই লোকজন জড়ো হয়ে গেল।

একটি প্রিয়দর্শন যুবক আমার কাছে এসে দাঁড়াল। বললে, আপনাকে কোনো অপমান করেনি ত? ও আমারই বোন।

বললুম, না না, অপমান করবেন কেন? ভারি ভদ্র মেয়েটি।

ছেলেটি বললে, ওকে নিয়ে আমাদের বাড়ীতে ভারি মুস্কিল। গেল বছর এম-এ পাশ ক'রে ও ওই রকম হয়ে যায়। কিছুদিন আগে রাঁচী থেকে পালিয়ে এসেছে।

সমস্ত ব্যাপারটা এবার যেন আমার কাছে পরিষ্কার হচ্ছে। শুধু বললুম, আমার বিশ্বাস, স্বামীর প্রতি আপনার ভগ্নীর একটু অভিমান আছে!

স্বামী!—ছেলেটি বললে, ওর বিয়ে হয়নি এখনও। বিয়ের সব ঠিকঠাক, হঠাৎ সাতদিন আগে ওর একটুখানি পরিবর্তন দেখা গেল! ঠিক পাগল নয় কিন্তু। অত্যন্ত সামান্য, এই ধরুন, এক পার্সেণ্ট এদিক ওদিক। সুস্থ আর পাগলের মাঝখানে এত সূক্ষ্ম তফাৎ যে, আমাদের নিজেদের কথা ভাবলেও ভয় করে। ওকে আপনি ক্ষমা করবেন। আচ্ছা, নমস্কার।

প্রতি নমস্কার জানিয়ে আমি আড়ষ্ট দেহে নবকেষ্টবাবুর ডাক্তারখানার দিকে অগ্রসর হলুম। গল্পটা জমলো না, বাধা পেয়ে গেল।

শিকার

ছেলেমানুষের মনে যে-দাগ পড়ে সেই দাগ কোনওদিন মোছে না। মার খেলেও যে-দাগ, ভালোবাসা পেলেও সেই দাগ। ও-দুটো সমানভাবেই গাঁথা থাকে।

তরুদিদির বাঁকা চোখে থাকতো খরদৃষ্টি,—কিশোর বালক আন্দুর নিরোগ স্বাস্থ্যের দিকে তাকিয়ে সেই দৃষ্টি ভ'রে উঠতো ঈর্ষ্যায়। আন্দুর গা ছমছম ক'রে উঠতো ভয়ে। সে যেন কুঁকড়ে ছোট হয়ে যেতো এই দূর সম্পর্কীয়া দিদির সামনে।

চিরকালের জন্য এই দাগ বসে গেছে।

তরুদিদি জমিদারের বউ। বাপের বাড়ীটি হোলো গরীবের ঘর,—বিধবা মা শুধু আছেন। বছরের মধ্যে তিন চার বার তরুদিদি তাঁর রুগ্ন এবং ম্যালেরিয়াগ্রস্ত চার পাঁচটি ছেলেমেয়ে নিয়ে এসে উঠতেন ডাক্তারি চিকিৎসার জন্য। ওদের মধ্যে একটি মেয়ের আবাল্য মৃগীরোগ, এবং কোলের ছেলেটির আজন্ম পুঁয়ে রোগ। সুস্থ সন্তান কা'কে বলে, তরুদিদি সেটি জানতেন না। রূপ এবং স্বাস্থ্য ছাড়া তাঁর জমিদারিতে আর সবই ছিল।

কিন্তু এই দুটি অভাবের একটি পরোক্ষ ক্ষতিপূরণ ছিল তাঁর নিজেরই সর্বাঙ্গে। শরীরের প্রতিটি অঙ্গে এবং একথা বলা চলে,—প্রত্যঙ্গেও, ভারি ভারি অলঙ্কার কম বেশী দুই সের সোনারুপোয় ভরা থাকতো, এবং রাত্রের দিকে কোলের শিশুটি কেঁদে উঠতো বার বার তাঁর সোনার গহনার খোঁচায়। স্বামীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা ঠিক কি প্রকার, সেটি খুব স্পষ্ট নয়।

গহনার ভারে তিনি হাঁপাতেন,—কেন না মানুষটি হোলেন স্থূলাঙ্গ ও খর্বকায়া,—আর তাই দেখে দরিদ্র পরিবারের সবাই অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকতো।

সেবার অত্যন্ত গম্ভীর মুখে তিনি বাপের বাড়ীতে ঢুকেই প্রথম কঠোর সম্ভাষণ করলেন তাঁর বিধবা ও নিরুপায় জননীকে,—এতটুকু বিবেচনা নেই তোমাদের ঘটে? আমার যে চর্বির ব্যামো, মনে নেই তোমাদের? একজন লোক পাঠাতে পারোনি ইষ্টিশানে? বাড়াশুদ্ধ আক্কেলের মাথা খেয়েছো?

মা বললেন, তেমন ত' কেউ নেই, কে যাবে মা?

কে যাবে! মরেছে বুঝি সব? আগে বললেই পারতে! আমি না হয় নাই আসতুম!

ম্লান হাসি হেসে মা চুপ ক'রে গেলেন। কিন্তু তরুদিদির এই উগ্র কঠোর প্রথম সম্ভাষণে বাড়ীসুদ্ধ সবাই হতবাক।

এবারেও তাঁর সঙ্গে আছে সেই ঝিয়ের মেয়েটা। ওর নাম হিমি। এ বাড়ীর ছেলেমেয়ে মহলে সে খুব পরিচিত। মেয়েটা তরুদিদির দু'চোখের বিষ হলেও বার বার সঙ্গে আসে, এবং তারই জন্য তরুদিদির অবস্থানকালটি বেশ সরগরম থাকে। হিমি হোলো ওঁদেরই গাঁয়ের এক প্রজার মেয়ে, বছর এগারো বারো বয়স, এবং অতিশয় স্বাস্থ্যবতী। বস্তুতঃ, ওর স্বাস্থ্যের কাঠিন্যই হোলো ওর যেন অপরাধ। হিমি এসে পৌঁছলেই ছেলেমেয়েরা ওর সঙ্গে মিলে যায়, এবং তরুদিদি ক্রুদ্ধ বিদ্বেষে সেটি পর্যবেক্ষণ করেন। মেয়েটা বিশেষ কারো অপ্রিয় ছিল না।

তরুদিদির ছেলেমেয়েদের চেহারায় জমিদার গোষ্ঠি-সুলভ কোনও ছাপ নেই। সবগুলিই কৃষ্ণবর্ণ কঙ্কাল ও হতশ্রী। প্রথমেই খাবার জন্য তারা বাহানা ধরলো,—কেউ শুয়ে পড়লো আনাগোনার পথে, কেউ ঢুকলো রান্না-ভাঁড়ার ঘরে, কেউবা নোংরা ক'রে বসলো একেবারে সকলের মাঝখানে। কিন্তু সেই হট্টগোলের মধ্যে প্রথমেই ছুটে এসে তরুদিদি হিমির গালে ঠাস ক'রে এক চড় বসিয়ে দিলেন,—হারামজাদি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিস্? ওদের সামলাতে পারিসনে?

আন্দু ব'লে উঠলো, ওর কোনো দোষে নেই তরুদিদি!

থাম্, ছোট মুখে বড় কথা ক'সনে! তরুদিদি কঠোর কণ্ঠে এক হাঁক দিলেন। আন্দু কাঁচুমাচু হয়ে সেখান থেকে স'রে গেল।

মেয়েটাই যে কেবল বিনা দোষে মার খেলে তাই নয়, ওই চপেটাঘাত পড়লো সমস্ত বাড়ীখানারই গালে,—অন্ততঃ ওর প্রতিধ্বনি সেই কথাটাই প্রকাশ করলো; সেই কারণে হিমির উপরে এই নির্বিচার লাঞ্ছনাটা সবাই যেন একটি মুহূর্তে নিজেদের মধ্যেই ভাগ ক'রে নিল।

হিমি কিন্তু একটু অন্য ধরণের। মার খেলে সে ভ্রূক্ষেপ করে না এতটুকু। বিড়ালকে মারলে বিড়াল স'রে যায় বটে, কিন্তু নিজের হাতে লাগে। হিমির দেহ পাথরের মতো শক্ত আর নীরেট। এর আগে দেখতে পাওয়া গেছে ঠাণ্ডায় বর্ষায় ওর কিছু হয় না। অযত্নেই মেয়েটা সুস্থ থাকে। আধ সের

চালের পান্তাভাত খায় এক খাবল নুন আর তেঁতুল দিয়ে। যেখানে সেখানে প'ড়ে লোহার মতো ঘুমোয়। ডাকলে বরং পাড়ার লোক জাগে কিন্তু তার ঘুম ভাঙ্গে না।

মনিবের পায়ে পায়ে জড়িয়ে থেকে তুষ্ট রাখাই ভৃত্যের কর্তব্য,—কিন্তু হিমি ছিল অন্যরকম, এটি তরুদিদি অনুভব করতেন। তাঁর মনে হোতো হিমি তাঁকে গ্রাহ্য করে না। রাগও ছিল সেইখানে।

কোলের ছেলেটার পুঁয়ে রোগ, কিন্তু তাকে ভুলিয়ে শান্ত রাখা ছিল শিবেরও অসাধ্য। কিন্তু ওই কাজটিই ছিল হিমির। আড়াল থেকে আন্দু সকৌতুকে দেখতো, কাঁদুনে ছেলেটাকে দূরে নিয়ে গিয়ে হিমি তাঁকে কাঁদাচ্ছে আরো বেশী, এবং এদিক ওদিক তাকিয়ে ছেলেটাকে টিপে টিপে দু'এক ঘা বসিয়েও দিচ্ছে, আবার চেঁচালেও মুখ টিপে ধরছে। একসময় ছুটতে ছুটতে আসেন তরুদিদি। চীৎকার ক'রে বলেন, আমাকে ভাত তুলতে দিবিনে মুখে? কেন তুই ওকে ভুলিয়ে রাখতে পারিসনে? বদমাই নচ্ছার—।

হিমি গোঁজ গোঁজ ক'রে বলে, অত কাঁদলে আমি কি করবো?

ফের আমার মুখের ওপর কথা?—তৎক্ষণাৎ তরুদিদি রাগে অন্ধ হয়ে যান এবং পলকের মধ্যে একপাটি জুতো এনে হিমির পিঠে সজোরে বসিয়ে দেন্।

হিমি একটু নড়ে না, কাঠের মতো ব'সে থাকে। ছেলেটা আবার চীৎকার ক'রে কেঁদে ওঠে। আন্দু গা ঢাকা দিয়ে চ'লে যায়।

তরুদিদির উচ্চকণ্ঠের দাপটে বাড়ীশুদ্ধ সবাই তটস্থ।

ওরই মধ্যে হিমি আবার একটু খামখেয়ালীও বটে। কাজ করে যখন, তখন সে অক্লান্ত। বাজার করে, ওষুধ আনে, নোংরা কাঁথা কাচে, বাসন মাজে, এঁটো পাড়ে, জল তোলে, রান্নাবান্নার জোগাড় দেয়, ঘর-দোর ঝাঁটায় কিন্তু তার মেজাজ যদি ভালো না থাকে, তাহলে সেদিন আর রক্ষা নেই। বাজার থেকে পচা মাছ কিনে আনবে, ওষুধের শিশি ভেঙে আসবে, বাসন-পত্র ফেলবে ঝনঝনিয়ে, জলের বাল্তি কাৎ করবে শোবার ঘরে, রান্নাঘরে এঁটোকাঁটা ফেলে রাখবে,—সেদিন ওকে দিয়ে আর কোনও কাজ করাবার উপায় থাকবে না। ছোট ছেলেটা যদি সেদিন কেঁদে কেঁদে ককিয়েও যায়, হিমি ভ্রূক্ষেপও করবে না, বরং নিজে এক সময় ছাদের চিলেকোঠায় গিয়ে চুপটি ক'রে বসে থাকবে। আর নয়ত সেদিন এমন ঘুম ঘুমোবে যে, একে-

ঝারে পাথরের ডেলা। সকালের দিকে শোবে, বিকেলেও তার ঘুম ভাঙবে না।

কিন্তু আশ্রিত-অনাথা ঝিয়ের এই স্পর্ধা তরুদিদি বরদাস্ত করবেন, তেমন মানুষ তিনি নন্। কাঠের চেলা নিয়ে তিনি একসময়ে উঠে যেতেন সেই চিলেকোঠায় এবং কোনও বিচার বিবেচনা ক'রে দেখার আগেই তিনি কোমরে কাপড় জড়িয়ে মেয়েটাকে সায়েস্তা করতে আরম্ভ করতেন। হিমি অনড় হয়ে মার খেতো।

আন্দু চুপ ক'রে একান্তে দাঁড়িয়ে থাকতো। আশ্চর্য, এত মারধর, কিন্তু মেয়েটা কোনওদিন কাঁদলো না। লোহার মতো কঠিন নিশ্চল হয়ে থাকতো, আর পিঠের ওপর দিয়ে গাছপাথর চ'লে যেতো। বাড়ীর ছেলেমেয়েরা ভয় পেয়ে তরুদিদির ত্রিসীমানা থেকে দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতো অন্ধ আক্রোশে তরুদিদির চোখ দুটো দপদপ ক'রে জ্বলছে। অমনি এক উত্তেজনার কালে একদিন অন্দু প'ড়ে গিয়েছিল তরুদিদির মুখোমুখি। তরুদিদি কেমন এক-প্রকার তীব্র হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে দূর সম্পর্কের ছোট ভাইটিকে প্রশ্ন করলেন, তোর অসুখ করে না কেন? কি খাস তুই? কি জন্যে ভালো থাকিস?

সুস্থ থাকাটাই যেন অপমানজনক। ভয় পেয়ে থতিয়ে মুখখানা লুকিয়ে আন্দু সেখান থেকে স'রে গেল।

রোষে ক্ষোভে উত্তেজনায় তরুদিদি ফোঁস ফোঁস ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁর দুটি ছেলেমেয়ে আবাল্য ভুগছে ম্যালেরিয়ায়। একটি মেয়ের মৃগীরোগ— কথায় কথায় সে বেঁকেচুরে যায়। পরের ছেলেটি জ্বর আর আমাশয়ে শয্যাগত। শান্তি ছিল না তাঁর। অথচ কী পরিমাণ অলঙ্কার তাঁর সর্বাঙ্গে! তরুদিদির ওই ক্রুদ্ধ চলাফেরার মধ্যে তাঁর সর্বাঙ্গের গহনাগুলি ঝমর-ঝমর ক'রে বেজে ওঠে। গহনাগাঁটি খুলে রাখা জমীদারের স্ত্রীর পক্ষে নাকি সম্মানজনক নয়। তাঁরা পুবদেশের মস্ত জমিদার।

মাঝরাত্রে সহসা একদিন চীৎকার ক'রে উঠলেন তরুদিদি। রাত তখন বোধ হয় বারোটা। মা এলেন ছুটে, বুড়ো দাদুর ঘুম ভেঙ্গে গেল। কিন্তু ব্যাপারটা সামান্য। তরুদিদির মাথা ধরেছিল সন্ধ্যাবেলা থেকে। হিমির ওপর হুকুম হয়েছিল, সে মাথার কাছে ব'সে তরুদিদির মাথা টিপে দেবে। ছেলে-মানুষ মেয়ে, মাথা টিপতে টিপতে এক সময় তন্দ্রায় ঢুলে পড়েছে। তরুদিদি তৎক্ষণাৎ বাঘিনীর মতো উঠে দাঁড়ান এবং সেই অন্ধকারে হিমির শরীরের

কোথায় যেন কিভাবে আঘাত করেন, মেয়েটা নিজের পেটটা দুই হাতে চেপে ঘুমের ঘোরে এক প্রকার আর্তনাদ করতে থাকে। চেঁচামেচিতে সবাই ছুটে এলো। তরুদিদি তারই ওপর হিমিকে এর মধ্যে দু'ঘা বসিয়ে দিয়েছেন। তরুদিদির মা মেয়েটাকে টানতে টানতে সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। আন্দু ঠাহর ক'রে দেখলো, হিমি মুখের আওয়াজ করছে বটে, কিন্তু চোখে তার এক ফোঁটাও জল নেই। আশ্চর্য, মেয়েটাকে কোনমতেই কাঁদানো যায় না! কিন্তু তারও চেয়ে আশ্চর্য সে রাত্রে সবাই মিলে তরুদিদিরই সেবা করতে লাগলো।

একদিন হিমি আবার এক অপাট ক'রে বসলো। তরুদিদির নতুন পছন্দসই শাড়ীখানা কাচতে গিয়ে বালতির খোঁচায় ছিঁড়ে ফালা দিয়ে শুকোতে দিল। ঘটনাটা তখন ঠিক টের পাওয়া যায়নি, কিন্তু বিকেলে গা ধুয়ে এসে শাড়ীখানা জড়াতে গিয়ে তরুদিদি একেবারে শিউরে উঠলেন। এ কাজ হিমি ছাড়া আর কা'রো নয়। তিনি বললেন, দাঁড়া, এবার তোর তেজ আমি ঘোচাবো।

বাড়ীসুদ্ধ থরহরিকম্প। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই, হিমির কোনও গ্রাহ্যও নেই। একটি বালিকার জীবনে মারপিট যেন স'য়ে গেছে,—ওটাকে অনিবার্য ব'লে জীবনের সঙ্গে সে মিলিয়ে নিয়েছে। কোনও লাঞ্ছনাতেই তার ভয় অথবা উদ্বেগ—কোনটাই নেই।

একটি ছোট সুস্থ ও সবল মেয়ের 'তেজ ঘোচাবার' জন্য সকলের বড় অস্ত্র হোলো, তাকে সম্পূর্ণ উপবাসে রাখা। তরুদিদি সেই ব্যবস্থাই করলেন। তাঁর হুকুম এ বাড়ীতে অলঙ্ঘনীয়। সেইদিনই সন্ধ্যা থেকে হিমির আহারাদি সম্পূর্ণ বন্ধ হোলো। শুধু তাই নয়। সেই শীতের সন্ধ্যায় নিজে এসে তরুদিদি হিমির কাঁথাকুঁথি নিয়ে চ'লে গেলেন। তিনি নামজাদা জমিদারের স্ত্রী,—অবাধ্য এবং দুঃশীল প্রজাকে কেমন ক'রে সায়েস্তা করতে হয়, তাঁর জানা আছে বৈকি। তাঁর চলে যাবার কিছুক্ষণ পরে হিমি এলো, এবং এখানে ওখানে ঘোরাঘুরি ক'রে দেখলো তার বিছানার পুঁটলিটি পর্যন্ত কেড়ে নিয়ে গেছে। দেখে শুনে তারও মাথায় রক্ত চড়ে গেল। সে সটান গিয়ে দাঁড়ালো তরুদিদির সামনে। বললে, আমার বিছানা কই?

তরুদিদি চুপ। তিনি সেদিন কিছু অসুস্থ, তাঁর হার্টের অবস্থা সেদিন ভালো ছিল না। উত্তেজনা ঘটলে অসুখ বাড়তে পারে।

হিমি পুনরায় বললে, আমি বুঝি আজ থেকে খাবো না কিছু? সবাই খাবে, আর আমি খাবো না কি জন্যে?

তরুদিদির পক্ষ থেকে কোনও জবাব নেই।—

হিমি বললে, বেশ, আমিও ব'লে রাখলুম, খেতে না দিলে আমিও কোন কাজ করতে পারবো না।

হিমি চ'লে গেল। লেপ ঢাকা দিয়ে তরুদিদি নিঃশব্দে পড়ে রইলেন।

দুদিন পরে ব্যাপারটা একটু রহস্যময়ই মনে হচ্ছিল। এক কাঁসি ভাতের কম যে-মেয়ের পেট ভরে না, তার সম্পূর্ণ উপবাস চলছে। হিমি খাচ্ছে না একবারও, সেদিকে তার চেষ্টাও নেই। সে ছটফট করবে, পায়ে ধ'রে কাঁদবে, এবং তার বদলে তাকে আরও উৎপীড়ন করা হবে—এই ছিল প্রত্যাশা। কিন্তু হিমি সম্পূর্ণ নিস্পৃহ, তার ভ্রূক্ষেপও নেই কোনওদিকে। ডাকলে সে কাছে আসে না, এবং—বিস্ময়ের কথা—খাদ্যের প্রতি তার কিছুমাত্র ঔৎসুক্যও দেখা যায় না। বাড়ীর সবাই ওই মেয়েটার দুর্ভাগ্যের দিকে আড়ষ্ট হয়ে চেয়ে থাকে। ক্ষুধার্ত মেয়েটার চেহারা মনে ক'রে কা'রো কা'রো মুখে অন্নও রোচে না। কিন্তু তরুদিদির সেদিকে এতটুকু গ্রাহ্য নেই। তাঁরও জিদ বেড়ে গেছে। তিনি এবার ওই অবাধ্য মেয়েটার সম্বন্ধে একটা হেস্তনেস্ত চান্। দেখা যাচ্ছে তাঁর হার্টের ব্যামোর কথা ভুলে গিয়ে তিনি কেমন যেন একপ্রকার প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠেন, এবং রুগ্ন ছেলেমেয়েদের ফেলে রেখে তিনি গোয়েন্দার মতো এদিক ওদিক ছোঁক ছোঁক ক'রে ঘুরে আসেন, কথায় কথায় সকলকে সাবধান ক'রে দেন কঠিন কণ্ঠে—খবরদার, কেউ ওকে খেতে দেবে না! আমি এর শোধ তুলবো।

দিন চারেক হ'তে চললো, হিমির মুখে অন্নজল নেই। অবাক ক'রে দিল মেয়েটা সকলকে। সে পরম নিশ্চিন্তে একপাশে প'ড়ে থাকে, এবং আহারাদি সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন। পরনের সেই নয়হাতি ধুতিখানার এক প্রান্ত মেঝের উপর বিছিয়ে রাত্রে সে অকাতরে ঘুমোয়। তরুদিদির মনে পরাজয়-বোধ জেগে ওঠে। তিনি চান্ কেউ ওকে গোপনে খেতে দিক্, এবং তিনি আহত সর্পের মতো তাকে ছোবল মারুন। কিন্তু এমন ভুল কেউ করে না। তরুদিদি তখন দাঁতের ওপর দাঁত ঘষতে ঘষতে রাত্রের দিকে এক একবার হিমিকে পাহারা দিয়ে আসেন। দেখা যায়, হিমি পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোয়।

তা'র নিটোল কঠিন দেহের কোথাও অনশনের কৃশতা নেই।—বলিষ্ঠকায়া স্বাস্থ্যোন্নতা কিশোরী মেয়েটার দিকে চেয়ে তরুদিদির দুই হিংস্র চক্ষু দপদপ ক'রে যেন অন্ধকারে জ্বলতে থাকে। অতঃপর আপন বিষাক্ত দীর্ঘশ্বাস চেপে তিনি ফিরে এসে লেপের মধ্যে ঢোকেন। নিজের মাথার চুল ছিঁড়ে চীৎকার ক'রে সারারাত সবাইকে গালি দিতে পারলে হয়ত তিনি কতকটা স্বস্তিবোধ করতেন।

সেই নিঃসাড় এবং নিস্তব্ধ গভীর রাত্রে ও মহলের বিছানার ভিতর থেকে আন্দু এবার আস্তে আস্তে মাথা তুলে তাকায়। না, কেউ কোথাও জেগে নেই। শেষবারের মতো টহল দিয়ে তরুদিদি নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করেছেন, আর তিনি উঠবেন না।

আন্দু পা টিপে-টিপে ওঠে। তারপর কুলুঙ্গী থেকে একটি কাগজের বাক্স নিয়ে চলে যায় দালান পেরিয়ে সেই ছোট ছাদের পাশে। সন্তর্পণে গিয়ে হেঁট হয়ে হিমির কানে কানে সে ডাকে। হিমি জেগেই থাকে আগের থেকে। আন্দু চাপা গলায় বলে, বাক্সের মধ্যে ভাত-চচ্চড়ি আছে। চৌবাচ্চা থেকে জল খেয়ে নিস।

তেমনি পা টিপে-টিপে আন্দু নিঃসাড়ে পালায়। মেয়েটা খাবার আগে ওর দিকে তাকিয়ে একবার হাসে।

পিত্রালয়ে তরুদিদির বসবাস এইভাবেই একদিন শেষ হয়ে আসতো। সকলের অশ্রদ্ধা কুড়োতেন তিনি, সকলকে পরোক্ষভাবে অপমানও করতেন। যারা তাঁর পায়ের তলায় দলিত হোতো, তাদেরই কাছে তিনি পূজা প্রত্যাশা করতেন। তাঁর ঘৃণার পাত্র ছিল সবাই। তিনি নিজে ছিলেন যেহেতু খর্বকায় ও স্থূলাঙ্গ, সেজন্য কারো মাথা উঁচু হোক—এ তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। আন্দুকে কাছাকাছি দেখলে তিনি চাপা উত্তেজনায় ফুলে উঠতেন।

তাঁর যাবার আগের দিন হিমি আবার একটা ভীষণ অপরাধ ক'রে বসলো। বোধ হয় মাসীমাই কাপড় শুকোতে দেবার জন্য ছাদে উঠছিলেন। সিঁড়ির ঘরের পাশে চোখ পড়তেই তিনি দেখলেন, খেজুর গুড়ের একটি নাগরির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে হিমি গোপনে টাউ টাউ ক'রে গুড় খাচ্ছে। প্রায় আধখানা নাগ্‌রি সে তখন শেষ ক'রে এনেছে।

খবরটা মাসীমা কোনমতেই চাপতে পারলেন না। উঠে পালাতে গিয়ে হিমি সিঁড়ির উপরেই হুড়মুড়িয়ে প'ড়ে গেল কাপড়ে বেধে। খবর পেয়ে

তরুদিদি ছুটে এলেন। তাঁর ঝি চুরি ক'রে খাচ্ছিল, এ ত' তাঁরই পক্ষে অপমান! দ্রুতপদে তিনি ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে একখানা বঁটি নিয়ে ছুটে এলেন। অমন মেয়েকে আজ তিনি কেটেই ফেলবেন। অনেকের ধারণা, সবাই মিলে তরুদিদির হাত থেকে বঁটিখানা সময় মতো সেদিন কেড়ে না নিলে তিনি মেয়েটাকে সত্যিই হয়ত কেটে ফেলতেন। তাঁরা বড় জমিদার,—বছরে দশ-বিশটে দেওয়ানি আর ফৌজদারি মামলা তাঁদের নামে আলীপুর কোর্টে ঝুলেই থাকে। ওর ওপর না হয় আর একটা বাড়তো,—এই যা। কিন্তু বঁটিখানা হাত থেকে কেড়ে নিলেও তরুদিদিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা না দিয়ে কারও উপায় ছিল না। তিনি উচ্চকণ্ঠে একবার হাঁক দিলেন, সবাই সামনে থেকে স'রে যাও বলছি। ও আমার ঝি, আমার ভাত-কাপড়ে মানুষ, ওর ব্যবস্থা আমার হাতে। তোমাদের কোনও এক্তিয়ার নেই।—বলতে বলতে তিনি একগাছা বাঁকারি নিয়ে এলেন।

সিঁড়িতে প'ড়ে গিয়ে হিমির বেশ চোট লেগেছিল। হাঁটু কেটে গেছে, কোমরে আঘাত লেগেছে। সুতরাং ওই সিঁড়ি থেকে মেয়েটা আর উঠতে পারেনি। কিন্তু তারই ওপর যখন সপাসপ বাঁকারির ঘা পড়তে লাগলো,—অদূরে দাঁড়িয়ে আন্দুর মুখ থেকে বেরিয়ে আসতে লাগলো আর্ত কান্নার আওয়াজ। দাঁতের উপর দাঁত রেখে হিমি ব'সে আছে মাথা নীচু ক'রে,—পিঠে আর মাথায় আর পায়ে পড়ছে বাঁকারির ঘা। রক্ত ফেটে পড়ছে তা'র চামড়া দিয়ে।

কিন্তু কেবল হিমিই মার খাচ্ছে না,—মার খাচ্ছে আন্দুও। সংসারে এক একটি প্রাণী এমন জন্মায়। মার খায় একজন মুখ বুজে, আঘাত খেয়ে কাঁদে অন্যজন। আন্দু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে,—তরুদিদি রোষকষায়িত চক্ষে তা'র দিকে তাকান।

এতদিন পরে তরুদিদির মা এবার চেঁচিয়ে ওঠেন,—ও ছাড়া তুই কি আর ঝি খুঁজে পাসনি তরু? এবার যখন আসবি, ওকে যেন আর এ বাড়ীতে আনিস্‌নে। মরণ হ'লেই মেয়েটার মুক্তি হয়!

তরুদিদির মা কেঁদে ফেললেন। হিমির মুখ দিয়ে আওয়াজ নির্গত হচ্ছিল।

কিন্তু কান্নাকাটি সবই মিথ্যে হোলো। একটি দিনের মধ্যেই হিমি দিব্য গা-ঝাড়া দিয়ে উঠলো। গায়ে পিঠে তার দড়া দড়া দাগ, হাঁটুর কাছে কালশিরে,

বাঁকারির ঘায়ে কপাল ফোলা,—কিন্তু সে সুস্থ। লোহা পুড়ে পুড়ে ইস্পাতে পরিণত হয়েছে।

যাবার সময় জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে সকলের সঙ্গে হিমি গাড়ীতে গিয়ে উঠলো হাসিমুখে। গাড়ী ছেড়ে দিল। অবাক হয়ে তা'র পথের দিকে আন্দু চেয়ে রইলো।

এরপর তরুদিদি বাপের বাড়ীতে এসেছেন অনেকবার। বছরের পর বছর। কিন্তু হিমি আর একটিবারও আসেনি সঙ্গে। সে গ্রামের মেয়ে। গ্রাম থেকেই মায়ের সঙ্গে যেন কোথায় ভেসে গেছে। তা'র জন্য তরুদিদির কোনও উদ্বেগ নেই। হিমিকে ভুলে গেছে সবাই।

অনেক বছর চ'লে গেছে তারপর।—

সে-বাড়ী বিক্রি হয়ে গেছে। মাসিমা মারা গেছেন অনেক কাল আগে। তরুদিদিদের আর কোনও খোঁজ খবর পাওয়া যায় না। ছড়িয়ে পড়েছে সবাই নানাদিকে।

আন্দু হয়েছে এখন আনন্দমোহন। বিয়ে ক'রে সে ঘরসংসার পেতেছে অন্যত্র। সে এখন ইলেকট্রিক অফিসে চাকুরি করে। কোটপ্যাণ্ট প'রে একখানা খাতা হাতে নিয়ে সে পাড়ায়-পাড়ায় লোকের বাড়ীর মেন্-ইলেকট্রিক মীটার প'ড়ে খাতায় টুকে নেয়। সাইকেল চ'ড়ে তা'কে আনাগোনা করতে হয়।

মাঝে মাঝে তাকে যেতে হয় অনেক অলিগলিতে। হয়ত বা অনেক নোংরা পল্লীর মেয়েছেলের সমাজে। ইতর-ভদ্র মানতে গেলে অফিসের কাজ চলে না। তবে কিনা কাজ হোলো তা'র মাত্র দুমিনিটের। মিটারের নম্বর মেলানো, আর কারেণ্ট খরচের পরিমাণ পাঠ ক'রে খাতায় টুকে নেওয়া,— ব্যস, ছুটি।

হঠাৎ একদিন কিন্তু দুমিনিটে ছুটি পাওয়া গেল না। পিছনে দাঁড়িয়ে একটি মেয়েছেলে প্রশ্ন করলো, কত উঠলো এবার?

খাতায় টুকতে টুকতে আনন্দমোহন জবাব দিল, আশী ইউনিট।

কথাটা শুনেও স্ত্রীলোকটি দাঁড়িয়ে রইলো। আনন্দমোহনের সময় কম, এখনও বহু বাড়ী বাকি। খাতা বন্ধ ক'রে সাইকেলখানার দিকে হাত বাড়াবার সময় স্ত্রীলোকটির দিকে তা'র এবার চোখ পড়লো। সে একটু থতিয়ে গেল। স্ত্রীলোকটির মুখে মধুর হাসি, দুই কানে হীরের ফুল, গলায় জড়োয়া হার। যৌবনের লাবণ্য ঠিকরে পড়ছে।

চেনো ?

আনন্দমোহন ঢোক গিলে বললে, হিমি না ?

না,—হেমাঙ্গিনী ! চিনতে পেরেছ দেখছি ! ষোল আঠারো বছর হ'তে চললো না ?

হ্যাঁ, তা হবে বৈ কি । কতকালের কথা ।—আনন্দমোহন ভগ্নকণ্ঠে জবাব দিয়ে একবার সাইকেলখানার দিকে তাকালো ।

তোমার সেই তরুদিদির কি খবর ? সেই জমিদারের বউ ?

আছেন তিনি এক রকম ! দেশেই আছেন ! তবে আমার ভগ্নিপতিটি মারা গেছেন বছর কয়েক হোলো ।

হেমাঙ্গিনী একটু হাসলো । তারপর বললে, আমাকে উপোষ করিয়ে রাখতো, আর তুমি ভাত চুরি ক'রে অর্ধেক রাতে আমাকে খাওয়াতে,—মনে পড়ে ?

কাষ্ঠ হাসি হেসে আনন্দ জবাব দেয়, হ্যাঁ, হ্যাঁ, কত ছেলেমানুষিই করা গেছে !—আচ্ছা, এগারোটা বেজে গেল, এবার যাই !

ও কি কথা !—হেমাঙ্গিনী বললে, এতকাল পরে দেখা, সেই ভাতের দাম শুধবো বৈকি !

আনন্দ মুখ তুলে তাকালো ।—বিলক্ষণ ! সেসব পুরনো কাসুন্দি ! সেসব কি আর মনে করতে আছে ? এবার আমি যাই । বেশ ত, অন্য সময়ে আবার দেখা হবে ।

কঠিন হাসি হেসে হেমাঙ্গিনী বললে, না গো না, দেখা যখন পেয়েছি, সে-দেনা এখনই শোধ করবো । ভেতরে এসো ।—বলতে বলতে হঠাৎ আনন্দর হাত থেকে খাতাখানা সে কেড়ে নিয়ে পুনরায় বললে, ঘরে না এলে এ খাতা এখনই ছিঁড়ে ফেলবো ।

আনন্দ বললে, এমন করলে আমার চাকরি যাবে, তা জানো :

যাক্, আমি তোমায় এ পাড়ায় ভালো চাকরি দেবো । আমাকে দেখিয়ে অনেক রোজগার করতে পারবে ।

আনন্দ বললে, একজনের ওপর রাগ আছে তোমার অনেক কাল আগে, তাই ব'লে আমাকে এসব অপমানের কথা বলছ কেন ?

অপমান ? হেমাঙ্গিনী হেসে বললে, ঠিক জানো এটা অপমান ? যদি বলি এটা ভালোবাসা ?

কিন্তু আনন্দকে আর কিছু বলবার অবসর না দিয়ে ঝপ্ ক'রে তা'র একখানা হাত ধ'রে হেমাঙ্গিনী তাকে উঠোন থেকে ঘরে তুলে আনলো।

অদূরে কয়েকটি মেয়েছেলে জোট পাকিয়ে বসেছিল, এবার খিলখিলিয়ে বললে, দেখো! দিনদুপুরে মাগির কাণ্ড দেখো।

ভিতরে এসে আনন্দ প্রতিবাদ জানালো,—আরে, আরে, শোনো, বারোটার মধ্যে আমাকে আপিসে পৌছতে হবে। আঃ কি হচ্ছে এসব? সাইকেলখানা বাইরে পড়ে,—চুরি যেতে পারে। ছাড়ো, ছাড়ো—

হেমাঙ্গিনী উল্লসিত কণ্ঠে বললে, সাইকেল গেলে আমিই তোমাকে আবার সাইকেল কিনে দেবো! কিন্তু তুমি হারালে আর যে তোমাকে পাবো না!

আনন্দ বললে, তোমার মতলব কি? তুমি যা ভাবছো আমি তা নই। সরো, যেতে দাও আমাকে।

কোনও কথায় কান না দিয়ে হেমাঙ্গিনী ভিতর থেকে ঘরের দরজাটা বন্ধ ক'রে দিল। তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, যাবে বৈকি, তুমি কি আর থাকতে এসেছ? তবে ঘণ্টাখানেক বাদে যাবে।

আমার কিন্তু এসব ভালো লাগছে না!

খিলখিল ক'রে হেমাঙ্গিনী হেসে উঠলো,—লাগবে, একটু সবুর করো,—চোখ বুজে আসবে ভালো লেগে! আগে পুতুলটিকে সযত্নে কাছে নিয়ে কলঙ্কের কালি মাখাই,—দেখবে তখন, দরজা খুলতে আর মন উঠবে না!

বাঘিনী আজ যেন তা'র শিকারকে ধরেছে। তা'র কঠিন কামড়ের থেকে পালাবার পথ ছিল না। সেই আবছায়াময় ঘরের গুমোটের মধ্যে হেমাঙ্গিনীর হিংস্র দুই চক্ষু দপদপ ক'রে জ্বলছিল,—ঠিক যেমন জ্বলতো তরু-দিদির দুই চক্ষু। দুই নারীর মধ্যে কোথায় যে একটা সূক্ষ্ম যোগসূত্র এতকাল ধ'রে থেকে আছে, সেই কথা তলিয়ে ভাবতে গিয়ে আনন্দ যেন খেই হারিয়ে ফেলছিল।

বিশ্বসংসারের বিলুপ্তি ঘটে যাচ্ছে ততক্ষণে। শিকারটা প্রায় মৃত। ক্ষিপ্তোন্মত্ত জন্তুটা ধীরে ধীরে হৃৎপিণ্ডের রক্তটা লোল-জিহ্বাগ্রে লেহন করছিল। ঘরময় তখন ঘুরছে যেন একটা সুদূর মৃত্যুকণ্ঠের জড়িত প্রলাপ: কাপুরুষ! মার খেতুম নেড়িকুকুরের মতন, দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমরা দেখতে! আজ বিষ নিয়ে যাও, ব্যাধি নিয়ে যাও,—ছারখার হোক তোমাদের পরিবার!

আনন্দের মৃত্যু ঘটে গেছে!

বাসনা

শীতের রাত কিনা, প্লাট্‌ফরমে লোকজন ছিল কম। আরে ভাই শোনো, প্লাট্‌ফরমে নেমেই আমি গন্ধ পেয়েছি, দু'জন গোয়েন্দা আমার পিছু নিয়েছে। সবচেয়ে ছুঁচো গোয়েন্দা হোলো বাঙ্গালী—সব চেয়ে সাংঘাতিক। মহীশূরে যাও বাঙ্গালী গোয়েন্দা, কাশ্মীরে যাও গোয়েন্দার কর্তা হোলো বাঙ্গালী। ভালো কাজেও যেমন, তেমনি সবচেয়ে নোংরা কাজে বাঙ্গালীর খ্যাতিও সবচেয়ে বেশী।

তারপর? রঞ্জিত উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করলো।

হেমন্ত চলতে চলতে বললে, শোনো। রাত তখন প্রায় ন'টা হবে—এখন সাড়ে বারোটা। আমি আর কি করি, পরের ট্রেনের দেরী তখন প্রায় দুঘণ্টা। ওয়েটিং রুমের অন্ধকারে এক বেঞ্চে গিয়ে শুলুম, অত্যন্ত ক্লান্ত। প্রায় দুদিন পেটে কিছু পড়েনি। তিনশো মাইলের মধ্যে অন্ততঃ বা'র দশেক গাড়ী বদল করেছি। ঘুম এসেছে এবার, কিন্তু কী মশা ভাই, চোখ বুজবার জো নেই। রিভলভারটা সংগে রয়েছে, ডাকাতির টাকাও কিছু ছিল। ভাবছিলুম, শোন্-ঈষ্ট-ব্যাঙ্কের খোট্টা পুলিশ দারোগাটা আমার গুলী খেয়ে এতক্ষণ হয়ত মারাই গিয়ে থাকবে। এই নিয়ে গোটা পাঁচেক হোলো!

বাজারের রাস্তাটা পেরিয়ে দুজনে সরু একটা গলির মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। নোংরা দুর্গন্ধময় নালী একদিকে, অন্যদিকে খোলার খাপরাঘর সারি বেঁধে চলেছে। রঞ্জিত পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো।

শোনো, শুয়ে আছি চুপচাপ গাড়ীর অপেক্ষায়—গাড়ীর অনেক দেরী, এমন সময়ে দু'জনের এক বেটা রুমের মধ্যে এসে দাঁড়ালো। রিভলভারটা একবার ছুঁয়ে ভাবলুম, দিই বেটাকে ঝেড়ে একহাত। ভয়ে ভয়ে কাছে এসে মিষ্টি গলায় বললে, আপনি কোথায় যাবেন, স্যর?—বললুম, শ্বশুরবাড়ী। অর্থাৎ কলকাতায়। আপনি কে? বললে, আমি টিকিট চেকার। আপনার টিকিটখানা একটু দেখান। কোত্থেকে আসছেন স্যর আপনি? বললুম, টিকিট পরে দেখাচ্ছি—আচ্ছা, আমাকে পুরি-মেঠাই খাওয়াতে পারেন?

কী উৎসাহ লোকটার, আমাকে ফাঁদে ধরাতে পারলেই ত চাকরির

উন্নতি! বললে, পারি বৈ কি—না না, আপনি ভদ্রলোক, খেতে চেয়েছেন, বিলক্ষণ, পয়সা দেবেন কেন? আমিই এনে দিচ্ছি!—লোকটা ছুটলো।

রঞ্জিত চাপা গলায় অধীর প্রশ্ন করলো, তারপর?

ছুঘণ্টা আর কতটুকু? খাবার এনে দিয়েছে—খাচ্ছি মজা ক'রে, এমন সময় ট্রেন এসে পড়লো। আমার মতলব ঠিকই ছিল। গাড়ীখানা কলকাতা যাবে, দাঁড়ালো অনেকক্ষণ। ওরা ভেবে নিয়েছে আমি গাড়ী ধরবো না। সুতরাং পরিপাটি ক'রে খেয়ে হাত ধুয়ে পান চিবিয়ে বেশ গুছিয়ে বসেছি,—এমন সময় গাড়ী ছাড়লো। গাড়ীতে স্পীড্ দিচ্ছে—দিচ্ছে—দিচ্ছে—প্রায় স্টেশন থেকে বেরিয়ে যায়, এমন সময় হঠাৎ উঠে আমি ছুটতে ছুটতে একখানা থার্ডক্লাস কামরার হাতল ধ'রে বাগিয়ে উঠে পড়েছি। আমি জানি, ওরা পরের স্টেশনে টেলিফোন্ করবে, সুতরাং বুঝতেই পাচ্ছ,—প্রাণের দায়ে কিছুদূর গিয়ে চলন্ত ট্রেন থেকে আবার আমাকে লাফিয়ে পড়তে হোলো। মাইল তিনেক হাঁটতে হাঁটতে তোমার বাড়ীতে গিয়ে পৌছলুম। একটা সুবিধে এই পেলুম, থার্ড ক্লাস যাত্রীরা তখন মুড়ি দিয়ে অগাধে ঘুমোচ্ছে।

রঞ্জিত এক জায়গায় এসে থামলো। সামনে মেটে চালাঘরের ছোট দরজা। রঞ্জিত অতি সন্তর্পণে খুটখুট ক'রে দরজায় তিনবার টোকা দিল, তারপর বললে, এ ছাড়া তোমাকে আর কোথাও জায়গা দিতে পারবোনা হে,—অবিশ্যি এটা ভালো জায়গা নয়। তবু এখানে দিন দুই চার ভালোই বিশ্রাম নিতে পারবে। পুলিশের চোখ এখনো এখানে পড়েনি।

রঞ্জিত আর একবার দরজায় শব্দ করলো। পরে বললে, আমার কাছে তোমার বিপদ ঘটলে সমস্ত বাঙলা দেশে আমি মুখ দেখাতে পারবো না,—দেশশুদ্ধ আমাকে ছি ছি করবে। তুমি যে আবার দলের পাণ্ডা কিনা!

যথারীতি ধীরে ধীরেই দরজাটা এবার খুললো। ভিতরের কেরোসিনের ডিবের স্তিমিত আলোয় একটি স্ত্রীলোককে দেখে রঞ্জিত বললে, কেউ আছে?

মেয়েটি চাপা গলায় বললে, আছে দু'জন।

যাবে এক্ষুণি?

হাসিমুখে মেয়েটি বললে, কাঁচা বয়েস, সহজে যাবে না!

হেমন্তকে দেখিয়ে রঞ্জিত বললে, এ আমার বন্ধু, থাকবে তোমার এখানে। একে পশ্চিমের ঘরটায় রেখো। সাবধান।

রঞ্জিতের পিছু পিছু হেমন্ত ভিতরে এসে দাঁড়ালো। ভিতরটা সম্পূর্ণ

বুকচাপা। দারিদ্র্যের বীভৎসতা চারিদিক থেকে যেন এরই মধ্যে তার গলা টিপে ধরেছে, কিন্তু তা'র বিপ্লবী জীবনের একটি রাত্রির এই বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাকে যেন কেমন এক প্রকার অভিভূত ক'রে দিয়েছে। কথা বলবার বা প্রতিবাদ জানাবার শক্তি তা'র ছিল না।

রঞ্জিতের কথায় রাজি হয়ে মেয়েটি চ'লে যাচ্ছিল, পিছন থেকে রঞ্জিত পুনরায় ডাকলো, শোনো, শিবানী—

মেয়েটি ফিরে দাঁড়ালো। কপালে তার কাঁচপোকার টিপ, মুখখানা পাউডার ঘষা, পরণে চকচকে চেক্ শাড়ী, গায়ের জামাটা ব্যবসায়ের উপযোগী, দুই ঠোঁটে পানের দাগ, মুখের শ্রী যেমন হোক, মাংসল স্বাস্থ্যটা প্রথমেই চোখে পড়ে। রঞ্জিত বললে, শোনো, আমার বন্ধু কিছু খাবে না, ও খেয়ে এসেছে।

শিবানী বললে, ও কি কথা, ঠাকুরের ভোগ দেবো না? আমার ভাত আছে, ভাগ ক'রে খাব।

না আজ থাক, কাল ওকে রেঁধে দিয়ো।

তোমরা কি দুজনেই থাকবে?

রঞ্জিত বললে, না, আমি এক্ষুণি পালাবো।

কিন্তু তোমার সংগে কথা আছে যে? দাঁড়াও, আমি ছেলে দুটোকে তাড়িয়ে আসছি এক্ষুণি—তোমরা ওঘরে গিয়ে ব'সো।

আমার কিন্তু রাত হয়ে যাচ্ছে। প্রায় একটা বাজে।

শিবানী হাসিমুখে বললে, বেশ যা হোক, পোড়ারমুখীকে না হয় পায়ের তলায় রাখলেই একদিন।—এই ব'লে সে ছুটে চলে গেল।

পশ্চিমের ঘরে ঢুকে রঞ্জিত নিজেই আলোটা জ্বাললো। সামনেই একখানা ভাঙ্গা তক্তা। তার ওপর একখানা ছেঁড়া চাটাই ছাড়া আর যা কিছু শয্যাদ্রব্য আছে, তা শ্মশানের পরিত্যক্ত সামগ্রীর মধ্যেও খুঁজে পাওয়া কঠিন। মেটে দেওয়ালের গায়ে ছোট ছোট দুটি কাঠের জানালা। ঘরের একদিকে একরাশি জ্বালানি কাঠ, এপাশে গোটা দুই কলাইয়ের বাসন। চৌকির নীচে এত জঞ্জাল যে, সাপের আড্ডা বললে ভুল হয় না।

হেমন্ত বললে, জায়গাটা অদ্ভুত বটে। কিন্তু মেয়েটি কে বলো ত?

রঞ্জিত বললে, পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো ব্যবসা যারা চালায়, মেয়েটা তাদেরই একজন।

হেমন্ত একটু থতিয়ে বললে, তোমার সঙ্গে ভাব হোলো কেমন ক'রে?

ওর স্বামী এককালে আমার বিশেষ পরিচিত ছিল। লোকটা ওকে ত্যাগ ক'রে আবার বিয়ে করেছে।

ত্যাগ করলো কেন?

রঞ্জিত হাসিমুখে বললে, তুমি কি এক রাত্রেই সবটা শুনে নিতে চাও?

হেমন্ত মুখ ফিরিয়ে কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইল। পরে বললে, তুমি তা'হলে স্বীকার করো, একজনের পারিবারিক জীবনের সর্বনাশ করেছ? একটা জীবনকে তুমি অধঃপতনে নামিয়েছ।

রঞ্জিত বললে, ওরে ভাই, জীবন বড় জটিল। তুমি পাঁচটা লোককে খুন ক'রে কতগুলো নিরীহ মানুষকে পথে বসিয়েছ, তা জানো?

সেখানে যে একটা আদর্শ আছে!—হেমন্ত প্রতিবাদ জানালো।

আদর্শের জন্যে আরো অনেক রকমের আত্মবলি আছে, হেমন্ত।

বাইরে পায়ের শব্দ হোলো। শিবানী দ্রুতপদে ঘরে এসে দাঁড়ালো। বললে, ওরা গেছে,—বাঁচলুম, গা ঘিন্ ঘিন্ করে ওদের উৎপাতে।

রঞ্জিত বললে, দিয়ে গেল কিছু?

শিবানী বললে, ওদের মধ্যে একটা ছেলে খুব বড়লোক। টাকার পরোয়া করে না। প্রায়ই এখানে আসে।

হেমন্ত বললে, এইভাবে লোকের কাছে টাকা নিতে ভালো লাগে?

হ্যাঁ—শিবানীও তৎক্ষণাৎ জবাব দিল।

ঘেন্না করে না?

একটুও না।

ঘেন্না করে না কেন?—হেমন্ত জানতে চাইলো।

শিবানী বললে, ডাকাতি ক'রে কেউ বা টাকা নেয়, কেউ বা টাকা নেয় ভালোবেসে! মেয়েদের পক্ষে শেষেরটাই সুবিধে!

হেমন্ত প্রতিবাদ জানিয়ে বললে, কিন্তু এ টাকা ত দেহ বিক্রির টাকা।

শিবানী একবার রঞ্জিতের দিকে তাকিয়ে বললে, মেয়েমানুষের জন্মই ত সেই জন্যে! এ আর নতুন কি? কি বলুন, দাদা!

দাদা! হেমন্ত যেন চাবুক খেয়ে চমকে উঠলো। এ আবার কি প্রকার সম্ভাষণ!

রঞ্জিত শান্ত কণ্ঠে জবাব দিয়ে বললে, অনেকে তোমার কথা বুঝতে চাইবে না শিবানী।

আচ্ছা, আমি ভাই এবার পালাবো।

শিবানী বললে, এরই মধ্যে ?

হ্যাঁ—তার আগে আমার বন্ধু জয়ন্তর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই। আজকে ও ঘুমোক—বড় ক্লান্ত। কাল থেকে জয়ন্তর সঙ্গে তুমি খুব ঝগড়া করো।

রঞ্জিত পলকের মধ্যেই হেমন্তর নামটা বদলে দিতে পারলো।

পরে সে বললে, আর শোনো একটা কথা,—এটা কিন্তু একটু লুকিয়ে রাখতে হবে।

এই ব'লে রঞ্জিত হেমন্তর কাছ থেকে রিভলবার এবং টাকা ও গহনা সমেত একটা পুঁটুলী বা'র করে শিবানীর সামনে ধরলো, শিবানী হাসিমুখে বললে, আবার বুঝি সেই সব উৎপাত। ওটায় গুলী ভরা আছে ?

হেমন্ত বললে, হ্যাঁ, পুরোপুরি ভরা।

রিভলভারটা নিয়ে শিবানী অত্যন্ত অভিজ্ঞ হাতে এক প্রকার মোচড় দিয়ে বোতামটা আটকে দিল, যাতে গুলী না ছিটকে বেরোয়। হেমন্ত তার নিপুণ হাতের কাজ দেখে সত্যিই অবাক হয়ে গেল। রঞ্জিত বললে, আমি চললুম, আবার ঠিক সময়ে আসবো। শিবানী, এসো, দরজাটা দিয়ে যাও।

শিবানী গেল রঞ্জিতের পিছু পিছু। মেয়েটাকে এত বিচিত্র মনে হচ্ছে যে, খেই খুঁজে পাওয়া যায় না। কেমন একটা সাবলীল অন্তরঙ্গতা,—তা'র চেহারা অনেকটা যেন পারিবারিক। হেমন্তর মনে পড়ছে তা'র এক সম্পর্কের বৌদিদিকে। স্বামীগতপ্রাণা সচ্চরিত্রা বধূ, কিন্তু আপন দেহের আব্রু সম্বন্ধে সে এতই উদাসীন যে, বিসদৃশ লাগে। এ স্ত্রীলোকটি সম্পূর্ণ বিপরীতস্বভাবা, কিন্তু এর দেহতরঙ্গে কোন ভঙ্গী নেই, চোখে কোনো মাদকতার কলা-কুশলতা নেই,—যেটি এদের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। হেমন্ত অবাক হয়ে থাকে।

বাইরের দরজা সযত্নে বন্ধ ক'রে শিবানী আবার এসে ঘরে ঢুকলো। তারপর হাসিমুখে বললে, আপনার বন্ধুকে আমি দাদা বলি, উনি আমার সহোদরের চেয়েও বড়।

হেমন্ত বললে, এ কি আমি বিশ্বাস করবো ?

শান্ত নম্র হাস্যে শিবানী জবাব দিল, দরকার হ'লে আপনার এ বিশ্বাস ভেঙেও দেবো, জয়ন্তবাবু।

হেমন্ত সবিস্ময়ে বললে, এমন দরকার কি হয়, যার জন্যে নৈতিক পবিত্রতাকে নষ্ট করা চলে? কি বলছ তুমি?

শিবানী তাকালো হেমন্তর মুখের দিকে, তাকিয়ে এমন হাসিই হাসলো যে, বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক অজ্ঞান শিশুর দিকে চেয়ে যেমন ক'রে হাসে। তারপর বললে, আপনি বিপ্লবী না?

হেমন্ত বললে, লোকে বলে বটে!

আপনার দাড়ি-গোঁফ নেই, বয়স অতি কম, কিন্তু আপনাকে মুসলমান সেজে ঘুরতে হচ্ছে, দাড়ি-গোঁফ মুখে পরতে হয়েছে, এর কারণ কি? উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যে আপনি সবই ছাড়তে পারেন, এই না?

হেমন্ত বললে, অনেকটা—

শিবানী বললে, আমারও ধর্ম আছে একটা, তা'র জন্য আমি যে কোনো পাপ আর নোংরা কাজ করতে পারি। আপনার কাছে যেটা অন্যায়, আমার কাছে সেটা ন্যায়।

কিন্তু নারীধর্ম?

আছে বৈ কি!

মেয়েদের সতীত্ব?—হেমন্ত হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বললে।

শিবানী শান্তকণ্ঠে জবাব দিল, একটা মহৎ কাজের জন্য যদি দু'চারটে চামড়ার সতীত্ব যায়, কোন ক্ষতি নেই।

মহৎ কাজের দাম সতীত্বের চেয়ে কি বড়?

নিশ্চয়! একশোবার।—শিবানী জবাব দিল।

ঘরের পাশের গলিতে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। রাত হয়ত দুটো বেজে গেছে। পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে বুঝতে পেরে সহসা শিবানী ফুঁ দিয়ে দপ ক'রে আলোটা নিবিয়ে দিল, তারপর অবলীলাক্রমে হেমন্তর মুখে হাত চাপা দিয়ে বললে, চুপ।

কে? আমার রিভলভার?

চুপ, ভয় পেয়ো না, ওরা হয়ত রাত্তিরের খদ্দের! হয়ত অন্য কেউ।

দু'জনে নিঃসাড় হয়ে রইলো। পায়ের শব্দ জানালার নীচে এসে থেমে গেল। তারপর জানালার গায়ে সেই প্রকার তিনবার টক টক শব্দ। পরিচিত আঙুলের আওয়াজটি পলকের মধ্যে অনুভব ক'রে শিবানী তক্তার উপর উঠে চাপা গলায় সাড়া দিল, কে বিনু?

জানালার বাইরে মৃদু চাপা গলা শোনা গেল, হ্যাঁ, ছোড়দি।

শিবানী আঁচল খুলে এক গোছা টাকার নোট নিয়ে হাত বাড়িয়ে বললে, নিয়ে যাও। আবার এসো শনিবার রাত্তিরে।

এরপর দু'জনে কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। পায়ের শব্দটা আবার ধীরে ধীরে একসময় মিলিয়ে গেল। হেমন্ত অন্ধকারে বুঝতে পারলো, তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে শিবানী হাসছে। একসময় শিবানী বললে, তুমি বললুম, তখন তোমাকে, কিছু মনে করেছ? তোমার আমার বোধ হয় একই বয়স হবে।

হেমন্ত চুপ ক'রে রইলো। শিবানী পুনরায় বললে, তোমার বন্ধু তোমাকে বোধ হয় নরকে ডুবিয়ে গেছে, কি বলো?

হেমন্ত বললে, অন্ততঃ এটা স্বর্গলাভ নয়!

অন্ধকারে শিবানী আবার হাসলো! তারপর বললে, এবার তুমি ঘুমোও। একলা থাকতে ভয় করবে?

ভয়!

ভয় যদি করে, তোমার কাছে শু'তে পারি। কতদিন ধ'রে ঘুম পাড়িয়েছি কত ছেলেকে!

শিবানীর গলার আওয়াজটা যেন অদ্ভুত শোনালো। যেন অনেক দূরের, অনেক দীর্ঘশ্বাসের সুরের। হেমন্ত বললে, না না, আমি বেশ থাকবো।

শিবানী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মেয়েটা অসাধারণ সহজ। এত সহজ যে, গা ছম ছম করে। প্রকাশ পেয়েছে, শিবানী হলো রঞ্জিতের বন্ধু-স্ত্রী, অর্থাৎ কথাটা এই, সে সম্ভ্রান্ত মেয়ে। অনেক মেয়ে গৃহত্যাগ করে, অনেক মেয়ের বনাবনি হয় না গার্হস্থ্য জীবনের সঙ্গে অথবা স্বামীর সঙ্গে,—কিন্তু সেজন্যে তাদের নীচে নেমে আসতে হবে, অথবা পথের পতিতাবৃত্তি তুলে নিতে হবে, এ কোন্ যুক্তি? পুরুষেরা মেয়েদেরকে নষ্ট করে, লোকের এই হাস্যকর বিশ্বাস কেন? মেয়েরা পুরুষের লালসার খোরাক যোগায়। কেন যোগায়? কামিনীর লালসা মেটাতে হয় কা'দের? পুরুষকে নীচে নামায় কা'রা? এযুগে মেয়েদের তুলে ধ'রেছে যারা—তারা আর যেই হোক, মেয়ে নয়!

সবচেয়ে আনন্দের কথা এই শিবানী আশ্চর্য রকম তেজস্বিনী, তার কথায় আর আচরণে শিক্ষা ঠিকরে বেরোয়। তার পতিতাবৃত্তি নেওয়াটা যেন সুচিন্তিত, অনেকটা যেন অঙ্কের নির্ভুল ফলাফলের মতো।

মেয়েটা অবাক করেছে হেমন্তকে। হেমন্তর ঘুম আসে।

রঞ্জিত এগিয়ে গিয়ে বললে, এই ঘরে এসো—এইটে হলো শিবানীর—যাকে বলে শয়ন-মন্দির। এখানেই আছে তোমার রিভলভার, তোমার টাকার পুঁটলী। পুলিশ আজ ভোরে এখানে হুলিয়া জারী করছে তোমার নামে, মনে রেখো। তোমাকে ধরাতে পারলে পাঁচ হাজার টাকা। ছবি লট্‌কে দিয়েছে থানায় থানায়।

হেমন্ত বললে, তাই নাকি? শিবানী কোথায়?

রঞ্জিত বললে, শিবানী! শিবানী দিনের বেলা এখানে থাকে না।

কোথায় যায়?

তার ছোট ছেলে আছে কাছেই গাঁয়ে—সেখানে যায়, সন্ধ্যায় ফেরে।

হেমন্ত বললে, স্বামীকে ছেড়ে শিবানী কি এইভাবেই এখানে পেট চালায়?

পাগল! তাহ'লে ত' সমস্যা মিটেই যেতো। নিজের জন্যে নয় গো, তাকে খাওয়াতে হয় অনেক লোককে। তুমি যে এখানে থেকে খাচ্ছ, তোমাকে খাওয়াচ্ছে কে?

এর জন্য তাকে ধর্ম খোয়াতে হবে?

ধর্ম! শিবানীর ধর্ম শিবানী! ওর পিঠের চামড়া খুলে দেখো, কতদিনের কত অপমানের দাগ। সুখী মানুষ দুর্গমের দিকে পা বাড়ায় কেন? কিসের লোভে। কী পাবার আশায়?

রঞ্জিত তার মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

ঘরের মধ্যে ঠাসা বই-কাগজ। কতকালের পুরনো বই, কত অসংখ্য কাগজের টুকরো। মাটির দেওয়ালে ঝোলানো দেশনেতাদের কাঁচিকাটা ছবি। সিরাজদ্দৌলা, মীরকাসেম, নানাসাহেব, লক্ষ্মীবাই,—এবং একালের সুভাষ বসু, সূর্য সেন—সকলের। দেওয়ালের গায়ে ইতিহাস, কত তাদের ভাষা আর স্বপ্ন, কত অনাচারের কাহিনী, কত মর্মন্তুদ আত্মোৎসর্গের ইতিকথা। কত কি যেন হেমন্ত খোঁজে, কত বিস্ময়ের চিহ্ন সে আবিষ্কার করে! আশ্চর্য, এই তীর্থপথ তার একদিন জানা ছিল না—এ যেন সমগ্র বাংলার বিপ্লববাদের হৃদয়মন্দির। হেমন্ত অভিভূত হয়ে থাকে।

এই ছাখো, তোমার ছবি কত যত্নে আল্‌বামের মধ্যে রাখা। এটা তোমার পাঁচ বছর আগের ছবি, তুমি তখন প্রথম কাজে নেমেছ।

হেমন্ত আল্‌বাম নিয়ে নিরীক্ষণ করে। ছবির নীচে শিবানীর হাতে লেখা, ঠাকুর, তুমি আমার প্রণাম গ্রহণ করো। শিবানী বিপ্লবীদের পূজা করে,

বিপ্লবীদের কল্যাণের জন্য আত্মমর্যাদা বিকিয়ে দেয়। অনেক নীচে থাকে সে, থাকে সকলের পিছে। গত রাত্রির কাহিনী হেমন্তর মনে পড়ে। জানালার নীচে থেকে চাপা কণ্ঠে ডাক আসে, ছোড়দি! শিবানী টাকা দেয় তাদের হাতে। তারা বিপ্লবী, তারা অন্ধকারের চর, তারা নিশাচর। তার ঘরে আসে মাতাল, আসে লম্পট, আসে অনাচারী। শিবানী টাকার পরোয়া করে না, দেহদানের সংকোচ করে না, সতীত্ব-নারীত্ব কোনোটাই গ্রাহ্য করে না।

কাল রাত্রে একসময় শিবানী বলেছিল, দেহ ছাই! নোংরা হোক, পাঁকে ডুবুক, দেহ জ্বলে পুড়ে যাক, কিন্তু ভিতরের আলোটা না নিভলেই খুশি থাকবো। ময়লা জঞ্জাল পুড়ে খাক্ হোক সেই আগুনের শিখায়।

বাইরে কয়েকজন ফেরীওলা আসে।—কেউ মাছ-আনাজ আনে, কেউ আনে দই-মিষ্টি, কেউ আনে চাল-ডাল। ওদের মধ্যে একজন এসে অলক্ষ্যে একখানা চিঠি আর একখানা খবরের কাগজ দিয়ে যায়। অবাক হয় হেমন্ত। কে ও লোকটা? রঞ্জিত বলে, ওরা কেউ ফেরীওলা নয়, ওরা সবাই দলের লোক। পার্টিমেম্বাররা এখানে আছে ছড়িয়ে, ওরা তারাই—ওরা খাবার জিনিষ সাপ্লাই ক'রে যায়।

চিঠি কার?

আমার নামের। একটা ফিকিরের আয়োজন আছে।

কি?

কাল হচ্ছে স্বাধীনতা দিবস। ছোট হাকিম তোড়জোড় করছে কাল একটা মারামারি বাধাবার। আমরা ফ্ল্যাগ্ তুলবো ঠিকই। সভাও করবো। ছোট হাকিম নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে, কিন্তু আমরা আইন ভাঙ্গবো।

হেমন্ত প্রশ্ন করলো, সভাপতি কে?

রঞ্জিত বললে, এখানকার যিনি লক্ষ্মীবাঈ—তিনি!

মেয়ে?

হ্যাঁ, মেয়ে। বাসনা গড়াই! নাম শোনোনি?

হেমন্ত উদ্দীপ্ত চক্ষে বললে, বাসনা গড়াই? এখানকারই মেয়ে নাকি? কাগজে দেখেছি আশ্চর্য তার কীর্তি! আচ্ছা, বাসনা গড়াই না এদিককার তেভাগা আন্দোলন চালাচ্ছে? রঞ্জিত বললে, তুমি কিছু জানো মনে হচ্ছে। আসলে ক্লিফ্‌টন্ সাহেবকে খুন করেছিল বাসনা গড়াই ওর বাঙ্গলোয় ঢুকে। এই নিয়ে বাসনা গড়াই চারটে ইংরেজকে মারলো।

হেমন্ত হেসে বললে, সত্যি, মহিলাটি ভয়ানক ইংরেজ-বিদ্বেষী।

রঞ্জিত বললে, ইংরেজকে ও কৃমিকীটের চেয়েও ঘেন্না করে!

হেমন্ত বললে, কাল তোমাদের সভা কখন?

সকাল দশটায়। রেলের মাঠে সভা—বহু গ্রাম থেকে লোক আসবে। ফ্ল্যাগ্ তুলতে না দিলেই দাঙ্গা।

আমিও যাবো সভায়।—হেমন্ত প্রস্তাব জানালো।

রঞ্জিত বললে, দূর পাগল!

হেমন্ত বললে, ভয় কি! দাড়িগোঁফ থাকবে লাগানো! নতুন একখানা লুঙ্গি শুধু দিয়ো। গায়ে চাদর দিয়ে দেখে আসবো তোমাদের সভা।

ধরা পড়লে ফাঁসী মনে রেখো।

সে ত' একদিন হবেই। তার আগে পর্যন্ত বেঁচে আছি, এটাও ঠিক।

খবরের কাগজটি খুলে দেখা গেল আগামী কালকার সভার বিবরণ। ভোরে প্রভাত ফেরী, জাতীয় সংগীতের শোভাযাত্রা, স্বদেশী চিত্রপ্রদর্শনী এবং আরো কত কি। বেলা দশটায় এই জেলার অগ্নিক্ষরা-নেত্রী বাসনা গড়াইয়ের সভানেত্রীত্বে রেলময়দানে পতাকা উত্তোলন। বিশিষ্ট নেতৃবর্গ এসে পৌছেছেন এখানে। আহারাদির পর বিশ্রাম ক'রে বিকালের দিকে রঞ্জিত চলে গেল। বলা বাহুল্য, সোজা গেল সে মদের দোকানের দিকে। সেখানে গিয়ে দেশী মদ কিনে গেলাস নিয়ে দোকানেই ব'সে গেল। পান করে সে প্রচুর। গোয়েন্দারা তা'র সম্বন্ধে কোনো দুশ্চিন্তা পোষণ করে না। রঞ্জিত মাতলামি করতে করতে সন্ধ্যার পরে বস্তির দিকে অভিযান করে। গোয়েন্দারা নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী যায়।

সন্ধ্যার পরে শিবানী ফিরে এলো। হেমন্ত অপেক্ষা করছিল তা'র জন্য। কী ভালো লেগেছিল শিবানীকে সারাদিন! পলকের জন্য হেমন্তর ইচ্ছা জাগলো, ছুটে গিয়ে শিবানীর দুই হাত ধ'রে বলে, আমি তোমার সেই ঠাকুর, সেই হেমন্ত মিত্তির—যার ছবির নিচে তুমি প্রণাম জানিয়ে রেখেছ। শিবানী, তোমার ওই উৎপীড়িত পশুপদদলিত দেহের নীচে দু'খানি পায়ের তলায় আমিও যাবার সময় আমার প্রণাম রেখে যেতে চাই। কিন্তু হেমন্ত আত্মসম্বরণ ক'রে তা'র মুখের পরচুলটা ঠিক ক'রে নিল। বিপ্লবীর মনে দুর্বলতা না আসে। আত্মপরিচয় প্রকাশ করলে হেমন্তর কিছুতেই চলবে না। যেমন সে এসেছে তেমনি নির্বিঘ্নেই সে যেন চ'লে যেতে পারে।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ গোলমাল শোনা গেল শিবানীর বাইরের ঘরে। সম্ভবত জন দুই মাতাল এসেছে আজ সন্ধ্যায়, তাদেরই জড়িত কণ্ঠের কলরব। মাঝে মাঝে কাঁচের আওয়াজ, মাঝে মাঝে সোডার বোতল খোলা। ওরই সঙ্গে চূর্ণ আক্রোশের ছিটে, গানের টুক্‌রো, বক্তৃতার ভগ্নাংশ, উচ্চহাস্যের তাল, —অর্থাৎ ওই জীবনেরই আনুসঙ্গিক। মাঝখানে সহসা শিবানীর কাতরোক্তি শুনে হেমন্ত বেরিয়ে এলো। অনুমান মিথ্যা নয়। মৃদু করুণ কণ্ঠে শিবানী প্রতিবাদ জানাচ্ছে,—কিন্তু মারধোর চলেছে তা'র ওপর। সংযম রক্ষা করা কঠিন। হেমন্ত এগিয়ে গিয়ে বন্ধ দরজার কাছে দাঁড়ালো। ভিতরে শিবানীর চাপাকণ্ঠের কী কাতরোক্তি—কী ফুঁপিয়ে কান্না! হেমন্ত লাফিয়ে পড়তে পারে পশুর ওপর এখনি,—কিন্তু হট্টগোলে যদি পুলিশ আসে তবে আর রক্ষা নেই। শিবানীর জীবন ছারখার হবে। ভিতর থেকে আওয়াজ শোনা গেল, কে বাইরে?

হেমন্ত পলকের মধ্যে নিজের ঘরের দিকে চ'লে এলো। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে শিবানী এলো বেরিয়ে। পশ্চিমের ঘরে ঢুকে দেখলো, অন্ধকারে চৌকির ওপর ব'সে রয়েছে হেমন্ত। কাছে এসে শিবানী বললে, সারাদিন দেখোনি তাই রাগ করেছ, না?

হেমন্ত মুখ তুললো। শিবানীর মুখে ও নিঃশ্বাসে কড়া দেশীমদের গন্ধ বিচ্ছুরিত হচ্ছে। হেমন্ত বললে, ছি, আমি কেন রাগ করবো? আচ্ছা, ওরা কি তোমাকে মারছিল?

শিবানী বললে, হ্যাঁ,—তুমি তখন দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিলে, না?

মারছিল কেন তোমাকে?

আগে বলো, তুমি দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিলে কেন?

পশুর হাত থেকে তোমাকে বাঁচাবার জন্যে।

তোমার এ রাগ কেন, জয়ন্ত?

হেমন্ত আবার শিবানীর মুখের দিকে তাকালো। শিবানী কতকটা জড়িত কণ্ঠে বললে, কেউ ছোট নয়, জয়ন্ত। স্বামী, সন্তান, লম্পট, অনাচারী, পশু, দেবতা, বিপ্লবী—সব মিলিয়ে পুরুষ। কেউ ছোট নয়।

হেমন্ত বললে, তাই ব'লে তোমাকে মেরে খুন করবে? আমি যে তোমাকে কাঁদতে দেখলুম শিবানী?

শিবানী হেসে বললে, হ্যাঁ, মারলে লাগে, কান্নাও আসে। কিন্তু কী

করবো, এক একটা লোকের অভ্যাস অমনি। মেয়েমানুষকে পায়ের তলায় ফেলে না থেঁৎলালে হয় না। মারবার সময় জানে, মার আমি সইতে পারি।

কিন্তু এ-জীবন তুমি কত দিন সইবে শিবানী?

তোমরা যতদিন না আগুন জ্বালাবে! বড় গরীবের দেশ জয়ন্ত, নিজের দেহ না বেচলে টাকা পাইনে। অনেক ছেলে লুকিয়ে রয়েছে, অনেক ছেলে পালিয়ে বেড়ায়—আমি তাদের ফেলতে পারিনে। বড়লোক আছে, তারা ঘেন্না করে তোমাদের, তারা ছেলেদের ধরিয়ে দেয়—তারা জমিজায়গা কেড়ে নেয়, সেপাইদের ডেকে এনে ধান-চাল বের ক'রে নিয়ে যায়। আমাদের বাঁচবার কোন উপায় রাখে না।

বাইরে থেকে কর্কশ কণ্ঠের ডাক শোনা গেল। শিবানী বললে, এবার আমি যাই, তুমি শান্ত হয়ে থাকো। রাত্তিরে আসবো।

হেমন্ত বললে, আবার যাবে কেন? ওদের তাড়াও!

হ্যাঁ, তাড়াবো। কিন্তু ওরা খুশী না হয়ে যাবে না। ওদের ছটফটানি শান্ত হ'লে ওরা নিজেই চলে যায়, আর একটুও দাঁড়ায় না।

হেমন্ত বললে, আমার সঙ্গে অনেক টাকা আছে শিবানী, সব টাকা তুমি নাও। আমি সব দিয়ে যাচ্ছি।

শিবানী বললে, বেশ ত' দিয়ো। যতদিন তোমার টাকা ফুরোবে না ততদিন আমি বিশ্রাম নেবো। কুকুররা এলে তাড়িয়ে দেবো দরজা থেকে। এবার আমি যাই।

হেমন্ত খপ ক'রে শিবানীর হাত ধরলো। বললে, একটা কথা দাও?

শিবানী বললে, কি ব'লো?

কথা দাও, আর কোনোদিন মদ খাবে না?

শিবানী বললে, মদ না খেলে ওদের কাছে যেতে ঘেন্না করে! ওরা জন্তু হয়ে আসে জন্তুর সঙ্গে লড়াই করার জন্যে,—আমাকে জন্তুর অভিনয় করতে হয়, জয়ন্ত!

শিবানী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হেমন্তর মন সংস্কারাচ্ছন্ন। এটা তা'র কাছে একেবারে নতুন। এটা যেন জীবনের প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলার বিপক্ষে বিদ্রোহ। এটা নীতির বাইরে, এটা সমাজের বাইরে। সে বিপ্লবী, তা'র লক্ষ্য হোলো দেশের মুক্তি, আদর্শের সার্থকতা। একদিন তা'কে গীতা স্পর্শ ক'রে শপথ নিতে হয়েছে,

মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন! সে হবে সন্ন্যাসী—কায়মনোবাক্যে। লোভ, মোহ, খ্যাতি, সম্পদ্—সমস্ত তার কাছে তুচ্ছ। নারী তা'র কাছে দেবী, দেবী কখনও লালসার বস্তু নয়। কিন্তু এখানে বিশ্বাসকে কিছু বদলাতে হচ্ছে। সবচেয়ে পবিত্র ব'লে যে-নারীদেহের প্রতি লোভ প্রকাশ করা তাদের নীতিবিরুদ্ধ, নারী নিজেই সেই দেহকে সর্বাপেক্ষা তুচ্ছ ব'লে খণ্ডে খণ্ডে বিকিয়ে দিচ্ছে পশুদলের ক্ষুধার্ত মুখের কাছে! পুরুষ দেখছে মেয়েদের স্থান কত উঁচুতে, মেয়েরা দেখছে তাদের আশ্রয় পুরুষের পায়ের তলায়। শিবানী নিজের দেহ থেকে নিজের প্রাণসত্তাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়েছে। কী নিরাসক্ত আত্মদান তা'র! নির্মোহ নির্লোভ দেহখানাকে উৎপীড়িত হ'তে দেখে তার বেদনাবোধ নেই। মুক্তিযজ্ঞের যে বিরাট হোমাগ্নি জ্বলেছে সমস্ত দেশে,—শিবানী নিজের দেহকে উৎসর্গ করেছে সেই আগুনে। যে কোন পথ দিয়ে যেমন ক'রে হোক নিজেকে তার উৎসর্গ করা চাই। দুপুরবেলা রঞ্জিতের কাছে সে শুনেছে, দু-বছর আগে ইংরেজ গোরা বহুলোকের মাঝখানে শিবানীর মায়ের উপর পাশবিক অনাচার করেছে, ঘরে আগুন লাগিয়ে তার এক ভাইকে জীবন্ত দগ্ধ করেছে—তার সহোদরা ভগ্নীকে নিয়ে গেছে পল্টনের তাঁবুতে। সংবাদপত্রে এসব অনাচারের কাহিনী প্রকাশিত হওয়া আইনবিরুদ্ধ ছিল সেদিন। রঞ্জিত বললে, এখানে চরিত্রের নীতিরক্ষার কথা ওঠে না, হেমন্ত। প্রতিবাদের সভা আমরা ডাকিনি, ভাই—আমরা প্রতিকার খুঁজেছি। অহিংসা, চরকা, শান্তিপূর্ণ হরতাল, আইন অমান্য, অসহযোগ—এতে আমরা ভুলিনি। আমরা মারখাওয়া গ্রাম আর পরিবার থেকে ছেলে-মেয়ে এনেছি, আমরা এনেছি চাষীদের ডেকে। যাদের ভাত-কাপড় জোটে না তারাই আমাদের অস্ত্র, পেটের ক্ষিধেই আমাদের মূলধন,—যারা নিঃস্ব তারাই সহজে দয়াহীন হতে পারে। যে মেয়েরা সম্ভ্রম খুইয়েছে, দেহ বিকিয়েছে, লজ্জা ছেড়েছে, তারা নিষ্ঠুর আর ভীষণ হতে জানে। তারা পরোয়া করে না জীবনের, ভয় পায় না মরণের। তোমাকে শিবানীর মতন আরো অনেক মেয়েকে দেখাতে পারতুম।

শিবানী ঘরে এলো অনেক রাত্রে। সে স্নান ক'রে শুচিশুদ্ধ হয়ে এসেছে, এলো চুল থেকে তার ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছিল। কপালে টিপ নেই, মুখে পাউডার নেই, পরিচ্ছন্ন হয়ে এসেছে সে। লণ্ঠনটা সে এক জায়গায় রাখলো। হেমন্ত বললে, এর মধ্যে এলে যে?

শিবানী বললে, এবার আর কেউ নয়, কেবল তুমি। তোমাকে নিয়ে থাকবো। গরম জল করেছি, হাত-পা ধোও।

বাইরে মৃদু মৃদু বৃষ্টি হচ্ছিল। আজ শীত পড়েছে খুব। বস্তির গলিপথ আজ সন্ধ্যা থেকেই প্রায় জনহীন। তা'ছাড়া গতকাল গিয়েছে সরস্বতী পূজা, —আজ বিসর্জনের সন্ধ্যা।

শিবানী কাছে এসে হেমন্তর দু'হাত ধরে নামালো। গরম জলে তাকে পরিপাটি ক'রে ধুইয়ে নতুন তোয়ালে দিয়ে তা'র পা মুছিয়ে দিল। শিবানীর ঘন নেশা তখনও কাটেনি। তারপর রান্নাঘরে গিয়ে গরম গরম লুচি আর তরকারি এনে হেমন্তকে সে নিজের হাতে সযত্নে খাওয়াতে ব'সে গেল।

এর মানে কি, শিবানী ?

যদি কিছু প্রায়শ্চিত্ত হয় ! হাসিমুখে শিবানী জবাব দিল।

তুমি ত' আজো পাপ করোনি।—হেমন্ত বললে।

কেমন ক'রে জান্‌লে ?

হেমন্ত বললে, যুধিষ্ঠির মিথ্যা বলেছিল যুদ্ধ জয়ের জন্যে। পুরাণের গল্পে আছে, সতীত্বের আদর্শের জন্য অনেক মেয়ে আত্মবলি দিয়েছে ; কিন্তু মহৎ আদর্শের জন্য অনেক মেয়ে সতীত্ব আর নারীধর্মকে বলি দিয়েছে, এও অনেক পাওয়া যায়। রোজ প্রভাতে পঞ্চকন্যাকে স্মরণ করি, তাঁদের সতীত্বের আদর্শের জন্যে নয়, শিবানী। তুমি কাঁদছ কেন, বলো ত ?

আঁচলে চোখ মুছে শিবানী বললে, আমার ভালোবাসায় কি তুমি বিশ্বাস করবে ?

না।—হেমন্ত জবাব দিল।

খাওয়া শেষ হ'লে শিবানী আঁচল দিয়ে হেমন্তর হাত মুখ মুছিয়ে দিল। পরে ভগ্ন কণ্ঠে বললে, তোমাকে হয়ত আর কোনদিন দেখতে পাবো না। আমার ভালোবাসা নিয়ে যাও তুমি।

ছি—বিপ্লবী জবাব দিল, যাবার আগে মিথ্যে জিনিস আমার হাতে তুলে দিয়ো না শিবানী।

মিথ্যে !

মিথ্যে বৈ কি। তুমি শুধু ভালোবাসো ইংরেজের হৃৎপিণ্ডের রক্ত ! আর যা কিছু ভালোবাসো, সেটা তোমার ঐ মদের নেশা—নেশা কাটলে আর কিছুই থাকবে না।

শিবানী বললে, কিন্তু আমার ছোট্ট ছেলেটি ?

ওটাও তোমার ভুল—হেমন্ত বললে, ভয়ানক ভুল। মৃত্যু আর অপমৃত্যু দুটোই তোমার জানা। নিজেকে যে সবচেয়ে ভালোবাসে, তারই কাছে দাম হোলো স্বামীর, সন্তানের, সম্পদের, খ্যাতির, প্রতিষ্ঠার। তোমার কিছু নেই, তাই ভালোবাসাও নেই। নিজের দেহের ওপর তোমার অনুরাগ নেই, তাই তুমি সর্বস্বান্ত। তোমার ধর্ম তোমার দেহের ওপর দাঁড়িয়ে নেই ব'লেই তুমি এত বড়।

হাত কাঁপছে শিবানীর, তবু আলোটা বাড়িয়ে সে কাছে এনে রাখলো। শিয়রের জানালাটা সে হাত বাড়িয়ে বন্ধ ক'রে দিল। অতি যত্নে মাথার বালিশটা গুছিয়ে সে হেমন্তকে শোয়ালো। তারপর একখানা হাতে হেমন্তর গলাটা জড়িয়ে ধ'রে সাদরে বললে, তুমি কে ?

আমাকে লোভ দেখিয়ো না, শিবানী।

ছি, ও কি কথা ? চন্দন কাঠ পু'ড়ে গেলেও তা'র সুগন্ধ ঢাকা পড়ে না, জয়ন্ত। লোভ তোমাকে ছুঁতে পারে না, তাই ত' ছুঁয়েছি তোমাকে! তুমি বিপ্লবী, তোমার ভয় কি ?

হেমন্ত বললে, আমার সংস্কার আছে, চেতনা আছে!

রাঙা দুটো আয়ত চোখ হেমন্তর মুখের ওপর রেখে শিবানী বললে, থাক্ ওসব ছাইভস্ম! তুমি মুখোস খোলো। কপালে কাটার দাগ টেনেছ, চোখের কোলে দিয়েছ কালি, মুখে মিথ্যে দাড়ি-গোঁফ,—তুমি এবার সত্যি হয়ে ওঠো।

আমাকে জেনে তোমার কী লাভ ?

আঁচল দিয়ে শিবানী হেমন্তর কপালের দাগ মুছিয়ে দিল। চোখের কালি দিল ঘুচিয়ে। তারপর অতি সন্তর্পণে হেমন্তর মুখের উপর থেকে আঠা মাখানো দাড়ি-গোঁফ খুলে সরিয়ে দিল। প্রকাশ পেলো একজন তরুণের সুকুমার সুন্দর নধর মুখচ্ছবি। গোঁফের রেখা তাম্রাভ কচি, ঠোঁট দুটি পাতলা টসটসে—দাঁতগুলি পরিচ্ছন্ন। শিবানীর মাদক-জরোজরো দুই মুগ্ধ চক্ষু দেখতে দেখতে যেন ঝাপসা হয়ে এলো। ললিত জড়িত কণ্ঠে সে শুধু বললে, এই তুমি ? এতক্ষণ পণ্ডিতের মতন কথা বলছিলে ? তুমি যে আমার চেয়ে অনেক ছোট!

পায়ের শব্দ হোলো। পা টলতে টলতে রঞ্জিত এসে ঢুকলো ঘরের মধ্যে।

শিবানী একটুও নড়লো না, এতটুকু সরলো না। হেমন্তর গলা জড়িয়ে বুকের ওপর মুখ রেখে গদগদ কণ্ঠে বললে, কতকালের পুণ্য আমার!

রঞ্জিত দূরে দাঁড়িয়ে বললে, কেন?

এই আমি প্রথম দেখলুম!

কা'কে?

পুরুষকে! শিশুর মতন পবিত্র পুরুষ। বলো, কে তুমি? রঞ্জিত কাছে এসে বললে, মুখোস খুলে দিয়েও চিনতে পারোনি? তোমার আল্‌বাম নিয়ে এসো, ওরই পায়ে তুমি প্রণাম রেখেছ, শিবানী।

হেমন্ত বললে, তোমার কাছে আমার গৌরব অনেক ছোট, একথা আমি কোনোদিন ভুলবো না, শিবানী।

আকণ্ঠ আবেগে শিবানীর গলা বুজে গেছে। চোখে জল গড়িয়ে এসেছে তা'র। ধরা চাপা গলায় ফিসফিস ক'রে সে বললে, তুমি—তুমি হেমন্ত মিত্র!

রঞ্জিত সেখানেই বসে নেশার ঘোরে ঢুলতে লাগলো। হেমন্ত এবার একটু উঠে বসবার চেষ্টা করলো। বললে, কাল তোমাদের সভায় আমাকে যেতে দিয়ো, রঞ্জিত।

শিবানী বললে, সেটা কাল, আজ নয়। আজ তুমি আমাদের দু'জনের।

রঞ্জিত জড়িত কণ্ঠে বললে, শিবানীর অনেক দিনের সাধ ছিল তোমাকে দেখবার।

শিবানী বললে, কাল থেকে তুমি আবার রক্তের পথ মাড়িয়ে যেয়ো, আজ থাকো আমার কোলের কাছে, থাকো আমার বুকের পাশে। আলো জেলে তোমাকে আমি দেখবো সারারাত!—এই ব'লে সে সত্যিই হেমন্তকে আরো কাছে টেনে নিল। কাঙালিনী যেন খুঁজে পেয়েছে হারানো রত্ন!

দাদা?

রঞ্জিত মুখ তুললো। শিবানী বললে, কালকের সব ঠিক আছে?

হ্যাঁ।

আর কোনো খবর?

না।

শিবানী আলোটা এবার নিভিয়ে দিয়ে বললে, তবে বাকি রাতটুকু আমার প্রাণের ঠাকুরকে নিয়ে থাকতে দাও, শেষরাত্রে উঠে যাবো।

হেমন্তকে কাছে নিয়ে শিবানী চৌকির ওপর শুয়ে পড়লো। ঢুলতে ঢুলতে এক সময় রঞ্জিত নিঃশব্দে উঠে বেরিয়ে গেল। কী যেন অসীম পরিতৃপ্তি তা'র মুখে চোখে।

হেমন্ত অন্ধকারে একসময় বললে, শিবানী, আবার কাঁদছ যে ?

শিবানী ফুঁপিয়ে বললে, বড় সাধের কান্না—একটু কাঁদতে দাও!

কেন ?

তুমি যে থাকবে না কাল থেকে ?

হেমন্ত বললে, সকালের শিউলী ঝ'রে পড়ে—তা'র জন্যে দুঃখ কি ?

শিবানী বললে, সমস্ত রাত ধ'রে মৃত্যুর কান্না কাঁদা, সকালে ঝ'রে পড়া!

হেমন্ত চুপ ক'রে রইলো। শিবানী বললে, কি পেলে তুমি খুশী হও ?

কিছু না পেলে বেশী খুশী হই।—হেমন্ত স্পষ্টকণ্ঠে জবাব দিল।

কেন ?

রাখার কোন জায়গা নেই। যা পাবো ফেলে যেতে হবে কাল ভোরে। ভালো কিছু পেলে ফেলে যেতে দুঃখ পাবো। কিছু চাইনে, শিবানী।

শিবানী বললে, আমাকে যদি নাও ? আমার সব, আমার যা কিছু ?

হেমন্ত সহাস্যে বললে, মাংসপিণ্ড!

শিবানী চুপ ক'রে রইলো। তার চোখের জল ঝ'রে চলেছে গড়িয়ে গড়িয়ে। তার বিরাম নেই। বিপ্লবীরা ডাক শোনে না, কাছে টানলেও থাকে অনেক দূরে। শিবানী আস্তে আস্তে হাতখানা বাড়িয়ে হেমন্তর মুখের উপর বুলিয়ে অনুভব করলো তা'র জীবনের সর্বোত্তম দীক্ষাদাতাকে।

হেমন্ত শুধু বললে, কেঁদো না শিবানী!

শিবানী বললে, তোমাকে বাঁচানো যায় না কোনমতে ?

ফাঁসীর আসামীকে বাঁচতে বলো কেন ? আমি খুনে।

কাল তোমাকে যেতেই হবে ?

শিবানী!

শিবানী চুপ ক'রে গেল। কিন্তু আবার গলা জড়িয়ে বললে, তোমাকে বাঁচান যাবে না ব'লেই চোখের জল ফুরোতে চাইছে না।

এবারে শান্ত হয়ে ঘুমোও দেখি?—হেমন্ত অনুরোধ জানালো।

শিবানীর নেশা এবার কেটেছে। সে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগলো।

জনরোল উঠেছে রেলের ময়দানে সকালের দিকে। কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা অমান্য ক'রে শোভাযাত্রা বেরিয়েছে পথে পথে। বহু গ্রাম থেকে অর্ধনগ্ন বুভুক্ষ নরনারী এসেছে কাতারে কাতারে। শৃঙ্খলাভঙ্গের ভয় ছিল কর্তৃপক্ষের মনে। স্বয়ং বড় হাকিম সাহেব পুলিশ ফৌজ সঙ্গে নিয়ে রেলময়দানের ঘাঁটি আগলে রয়েছেন। এখন যুদ্ধ-প্রচেষ্টা চলেছে চারিদিকে, দেশের আভ্যন্তরীন শান্তিরক্ষা একান্ত দরকার।

কিন্তু এটি স্বাধীনতা দিবস। কংগ্রেস নির্দিষ্ট স্বাধীনতার শপথ আজ গ্রহণ করাই চাই। আগে পতাকা উত্তোলন, পরে সবাই দণ্ডায়মান হয়ে শপথ গ্রহণ,—এ দুটি স্বয়ং সভানেত্রী সম্পন্ন করবেন। জনরোল উঠেছে বটে, কিন্তু জনসাধারণ শান্তিভঙ্গের জন্য আদৌ ব্যস্ত নয়।

এক সময় হাজার হাজার কণ্ঠের জয়ধ্বনিতে জানা গেল, সভানেত্রী বাসনা গড়াই সভায় উপস্থিত হয়েছেন। ভিড়ের ভিতরে এক সময় হেমন্ত চোখে চোখে দেখে নিল রঞ্জিতকে ; রঞ্জিত একটু হাসলো। হেমন্তর পরণে লুঙ্গি, পায়ে নরম ক্যাম্বিশের জুতো, গায়ে ঢাকা চাদর, মুখে মস্ত দাড়ি-গোঁফ, কপালে কাটার দাগ, চোখের কোণে কালি।

সভানেত্রী বাসনা গড়াই পতাকা উত্তোলনের জন্য এগিয়ে এলেন। দূরের থেকে তাঁকে সহসা দেখে হেমন্ত স্তম্ভিত ! সে শিরানী। ভোর রাতে সে বিছানা ছেড়ে উঠে গেছে,—এবার এসেছে সদ্যস্নাতা, কপালে সিন্দুর, পরণে রাঙ্গাপাড় খদ্দরের শাড়ী, চোখ দুটি শান্ত, অহিংসভাবে কেমন প্রসন্ন, আত্মস্থ। বিস্ময়াহত হেমন্তর চক্ষে আর পলক পড়ে না। সকালের স্নিগ্ধ কোমল রৌদ্রের আলোয় শিবানীকে মহীয়সী মনে হচ্ছে। চারিদিক থেকে জয়ধ্বনি উঠলো, বন্দেমাতরম্। হাকিম হুকুম দিলেন, পতাকা নামিয়ে ভেঙ্গে ফেলো। পুলিশ ফৌজ সেই অপমানজনক আদেশ বর্ণে বর্ণে পালন করলো। জনসমুদ্রে তুফান দেখা দিল। তরঙ্গের পর তরঙ্গের আঘাত।

কংগ্রেস প্রতিশ্রুতি পাঠের জন্য বাসনা গড়াই একখানি বড় কাগজ বা'র করলেন। সে কাগজের নকল ছিল বহু লোকের হাতে। শিবানী পড়তে আরম্ভ করেছে, এমন সময় হাকিম হুকুম করলেন, বন্ধ করো। কিন্তু বন্ধ হোলো না, শিবানী পড়ে চললো। পুলিশ লাঠি চালনা আরম্ভ ক'রে দিল,— জনতা ছত্রভঙ্গ হচ্ছে। এক সময় লাঠি পড়লো গিয়ে স্বয়ং সভানেত্রীর পিঠে। শপথ-পাঠ তখনও শেষ হয়নি, সুতরাং লাঠি পড়ল তার মাথায়। মার খাচ্ছে

সাধারণ অসাধারণ সব লোকই। শপথ গ্রহণ করতে দেওয়া হবে না, ওতে ইংরেজ রসাতলে যাবে। জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে, পুলিশ সাহেব তা'র চেয়েও ক্ষিপ্ত। বাসনা গড়াইয়ের কপাল বেয়ে গড়িয়ে এসেছে রক্তের ধারা, কিন্তু শপথ-পাঠ তখনও শেষ হয়নি। শেষ অংশটার কাছাকাছি আসতেই হাকিম সাহেব হুকুম করলেন, গুলী চালাও।

হেমন্ত এইটির জন্য অপেক্ষা করছিল। ক্ষিপ্তোন্মত্ত জনসাধারণের মাঝখানে গুলী চালাবার ফলে গুলী গিয়ে লাগল সভানেত্রীর গায়ে। বাসনা গড়াই প্রতিশ্রুতিপাঠের শেষ ছত্রে কোন মতে পৌঁছে অচেতন হয়ে রক্তমাখা দেহে মাটিতে প'ড়ে গেলেন। হেমন্ত পাঁকাল মাছের মতো পিছলে ভিড়ের ভিতর থেকে রবার্ট্‌স সাহেবের দিকে এগিয়ে এলো, তারপর পলকের মধ্যে চাদরের ভিতর থেকে রিভলবার বা'র ক'রে পিছন দিক থেকে—এক-দুই-তিন-চার একটির পর একটি গুলী সাহেবের পিঠের সর্বাঙ্গে গিঁথে দিয়ে চাদরের মধ্যে হাত লুকিয়ে নিল।

কয়েকজন এ দৃশ্য দেখেছে, তাদের মধ্যে রঞ্জিত একজন।

তারপর আর না বলাই ভালো। দূরের থেকে এক সময় হেমন্ত লক্ষ্য ক'রে দেখেছে, বাসনা গড়াইকে নিয়ে যাওয়া হোলো হাসপাতালে। রঞ্জিত দূরের থেকে চোখ টিপে কেবল জানালো, বেঁচে যাবে, ভয় নেই।

* * *

দুপুর বেলায় এক হাটতলায় তামাক খেয়ে দাড়িতে হাত বুলিয়ে মাথার পাগড়ীটা ঠিক ক'রে নিয়ে হেমন্ত ধীরে ধীরে মসজিদের দিকে চললো। এখনও তা'র নমাজ পড়া হয়নি!

এত হুজ্জৎ জানলে সে কি শহরে আসতো? চারিদিকে তখন ধরপাকড় চলছে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট রবার্ট্‌স মারা গেছেন।

খুব সম্ভব

ঠিক মনে নেই, বোধ হয় মোরাদাবাদ ষ্টেশনই হবে। দিল্লীর দিকে যাবার পথে ওখানে গাড়ী বদল করবার জন্য নেমেছিলুম। রাত তখন বারোটা। হেমন্তঋতুর শেষ প্রান্ত; পশ্চিম দেশের রাত কুয়াশার রহস্যে অস্পষ্ট।

বিদেশের কোনো জংসন ষ্টেশনে গভীর রাত্রির অবাস্তব আলো-আঁধারের পশ্চাদ্‌পটে দ্বিতীয় আর একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সঙ্গে বন্ধুত্বের ভূমিকাটা কেমন, সে-আলোচনা এতদিন পরে আপাতত অনাবশ্যক! একটু মনে আছে ওয়েটিং রুমে জায়গা না পেয়ে ঠিক দরজার বাইরে আলোর তীব্রতাকে আড়াল ক'রে আমি আমার মালপত্রের ওপরেই ব'সেছিলুম, এবং ঠিক আমার পাশেই সেই নবলব্ধ বন্ধুটির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। ভদ্রলোকের বয়স খুব অল্প নয়, তবে তাঁর চোখে এক প্রকার চাঞ্চল্য ছিল, যেটি অস্বাভাবিক ব'লে বুঝতে পারছিলুম।

তাঁর উদ্বেগের মাঝখানে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে সহসা বাঙালী ব'লে চিনতে পেরে তিনিই অবশ্য আলাপ করলেন; কত বাজলো বলতে পারেন স্যার?

হাত-ঘড়িতে সময় দেখে বললুম, বারোটা দশ।

মোটে? ঘড়ি আপনার ঠিক আছে?

বললুম, মাত্র এক মিনিট ফাস্ট।

তিনি দীর্ঘ একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন, সেটি চার হাত দূর থেকেও আমার শ্রুতিগোচর হোলো। তারপর বললেন; ক্ষমা করবেন, আমি যে এখানে মাত্র পনেরো মিনিট অপেক্ষা ক'রে আছি, এ আমার মনেই ছিল না। যেন কতকাল চ'লে গেছে, কত ঘটনা ঘ'টে গেছে। সময়টা মনেরই একটা অবস্থা, কি বলুন?

লোকটির শুষ্ক কণ্ঠস্বরে একপ্রকার বৈরাগ্যের আভাস আমার কানে বাজলো। আমার মনে হোলো, স্টেশনের এই আলো-ছায়া আর লোক-কোলাহল পেরিয়ে যদি পশ্চিম দেশের ওই ধূলিধূসর মাঠে গিয়ে দাঁড়াতে

পারতুম, তবে আজকের পূর্ণিমারাত্রির শূন্যলোকে হয়ত লোকটির বৈরাগ্যের যথার্থ চেহারা দেখা যেতে পারতো।

তাঁর প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারিনি, মনে আছে। কেবল মৃদুস্বরে প্রশ্ন করলুম, কতদূরে আপনি যাবেন?

আমি?—ব'লেই ভদ্রলোক চুপ ক'রে গেলেন। প্রশ্নটা বেমানানভাবে করেছি কি না বুঝতে পারলুম না। কিন্তু এই সামান্য প্রশ্নের জবাব দিতে যে তাঁর এত দেরি হবে, এও আমার কাছে দুর্বোধ্য। একটু অপ্রস্তুত হয়ে আমি চুপ ক'রে গেলুম।

ভদ্রলোক আবার উদ্বিগ্ন সতর্ক চক্ষে এদিক ওদিক তাকালেন। তারপর বললেন, ওঃ, এখন বারোটা দশ বললেন না? তাহ'লে আর অস্থির হই কেন?—হ্যাঁ, বলা শক্ত, কতদূরে যাবো। মানে, ঘুরতে বেরিয়েছি কিনা। অনেকটা ভারত প্রদক্ষিণ আর কি। বারোটা দশ বললেন, তাহ'লে ত এখনও আড়াই ঘণ্টা প্রায়!

লোকটির অসংবদ্ধ কথা, অনেকটা অসংলগ্নও বটে। কিন্তু আমি চুপ ক'রে গেলুম। সুমুখে প্রকাণ্ড মালপত্রের একটা স্তূপাকারের পাশ দিয়ে আলোটার একটা ফলা এসে পড়েছিল তাঁর চিবুকে,—বাকি মুখখানা তাঁর ছায়াবৃত। ঠিক স্পষ্ট চেহারাটা দেখা যায় না। কেবল তাঁর অস্থিরতার ফাঁকে ফাঁকে চকিত এক একটি মুহূর্তে স্টেশনের প্রতিফলিত আলোয় মুখ চোখ দেখা যাচ্ছিল। লোকটি সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবান।

এরপর আলাপের কোনো প্রয়োজনই ছিল না কোনো দিক থেকে। কিন্তু স্বজাতির সান্নিধ্য আর প্রতীক্ষাকালের দীর্ঘতাই সম্ভবত উভয়ের মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন সেতু রচনা করেছিল। আমার গাড়ী ভোররাত্রের দিকে, এবং তাঁরও গাড়ী আড়াই ঘণ্টা বাদে। সুতরাং উভয়ের পক্ষে স্টেশনের এই কোলাহল আর শূন্যতার আকাশ যে ক্লান্তিকর, এ অবস্থা দুজনের কাছেই স্পষ্ট।

কথা উঠলো পশ্চিমের আবহাওয়া নিয়ে। সেকথা গড়িয়ে চললো কিছুক্ষণ। তারপর একে একে এলো দিল্লীর দুর্গ, পুরীর সমুদ্র, আসামের জঙ্গল। ভদ্রলোকের ভ্রমণের তালিকা কম নয়। রাজপুতনার কোথায় যেন যশলমীরের দুর্গ, আবু পাহাড়ের মন্দির, আর দাক্ষিণাত্যের উপত্যকা—ওসব তাঁর অতি পরিচিত। মধ্যভারতের কোন্ অঞ্চলে কয়েক বছর আগে

তিনি রেল কোম্পানীর চাকরীতে সুড়ঙ্গ নির্মাণের কাজে গিয়েছিলেন! সেখানে কোথায় যেন দু'হাজার বছর আগেকার গ্রীক্‌সভ্যতার প্রত্যক্ষ চিহ্ন দেখে এসেছেন। এমনিতরো বহু গল্প তিনি নির্ঝরের মতো ঝরঝরিয়ে ব'লে চললেন।

মাঝখানে এক সময় প্রশ্ন ক'রে বসলুম, বাঙ্গলাদেশে আপনি কতদিন যাননি?

বাঙ্গলায়?—তিনি থম্‌কে গেলেন। কিছুক্ষণ কি যেন চিন্তা ক'রে বললেন, হ্যাঁ, তা প্রায় বছর আষ্টেক হোলো বাঙ্গলা ছেড়েছি। বাঙ্গলায় আর যাবো না।

হেসে বললুম, বাঙ্গালী হয়ে বাঙ্গলায় যাবেন না? নিজের দেশ ত বটে।

মিনিট দুই তিনি নীরব। আমাদের মাথার উপরকার চালা পেরিয়ে প্লাটফর্মের পাশে লাইনের ঠিক উপরে পূর্ণিমার চাঁদ দেখা দিয়েছে। চন্দ্রের পাশে রোহিণী তারাটি উজ্জ্বল। শূন্যলোকে সূক্ষ্ম হিমের একটি চন্দ্রাতপ ভাসছে।

ভদ্রলোকটি এতক্ষণ পরে জ্যোৎস্নার দিকে তাকালেন। পূর্ণিমার জ্যোৎস্না তাঁর মুখে প্রতিফলিত হোলো। সহসা সেইভাবেই আকাশের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, বাঙ্গলায় ফিরবো না, কথাটা খুবই রূঢ়। কিন্তু ফিরবো না, একথা সত্যি। সেই গানটা আপনার মুখস্থ আছে? সেই যে,—'দিয়েছি সে-স্বর্ণলতায়, আপন হাতে চিতায় তুলে?'—মনে নেই?

বললুম, না।

ভদ্রলোক সহজ বিশ্বাসের সঙ্গে বললেন, শুনে আপনি আনন্দিত হবেন, কবি তাঁর এই গানটি লিখেছিলেন আমাকে নিয়ে, মানে, আমার স্ত্রীর নাম ছিল স্বর্ণলতা, এবং নিজের হাতেই তাঁকে আমি চিতায় তুলে পোড়াই।

তাঁর গলার আওয়াজে কোথাও কারুণ্য খুঁজে পেলুম না, সুতরাং সমবেদনা জানানো নিরর্থক। আমার নির্বিকার মুখের চেহারা দেখে তিনি একবার নিঃশব্দে হাসলেন। তারপর বললেন, কিন্তু মৃত্যুটা তাঁর একটু নতুন ধরণের,—আপনি আমার অপরিচিত, তবুও বলতে আমার আপত্তি নেই।

স্টেশনের মাথার উপর হেমন্তপূর্ণিমার চন্দ্র তখন আরো একটু পশ্চিমে হেলে পড়েছে। গভীর রাত্রে স্টেশনের জনতাও কিছু শীর্ণ। পরিশ্রান্ত

একদল কুলী ওপারের প্লাটফরমের প্রান্তে ব'সে তুলসীদাসের দোঁহায় সুর চড়িয়েছে। দূর থেকে কোথায় শান্টিং এঞ্জিনের ঘস্-ঘস্ আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল।

ভদ্রলোকের মুখে চোখে উদ্বেগের আর কোন চিহ্ন নেই। তিনি শান্ত কণ্ঠে ব'সে যে-গল্পটি ফাঁদলেন, তা'র আনুপূর্বিক মনে ক'রে বলা কঠিন। কেবল তার সংক্ষিপ্ত চেহারাটা ভূমিকা-বাহুল্যবর্জিত হয়ে আজও আমার চোখে ভাসছে। তাঁর গল্পের মোটামুটি ভাষ্যটা এই ঃ

তিনি কলকাতার লোক, কলকাতায় লেখাপড়া শিখে মানুষ। বাঙ্গলা দেশের গ্রাম কেমন তাঁর জানা ছিল না। বিবাহ করেছিলেন যে-মেয়েটিকে, সেও পশ্চিমের এক বড় শহরে মানুষ। বিবাহের বছর দুই পরে দম্পতির সখ জাগলো, তাঁরা বাঙ্গলার গ্রাম পরিদর্শন করতে বেরোবেন। গল্পে আর কবিতায় গ্রামের আকাশ, বাতাস, নদী, মাঠ,—এ সবের বর্ণনা তাঁদের পড়া ছিল। গ্রাম ছিল স্বপ্নের মতন।

একবার পুজোর সময় হঠাৎ একটা সুযোগ জুটে গেল। তাঁদের আফিসের এক মুহুরির দেশ ছিল কোন্ এক জেলার কি এক গ্রামে। সেখানে যেতে হলে রেল-স্টেশন থেকে নেমে স্টিমার, তারপর গোরুর গাড়ী, তারপর আবার নৌকো। নৌকো গিয়ে গ্রামের ঘাটে লাগে। একটি আদর্শ পল্লীগ্রাম সন্দেহ নাই। নদীর ধারেই সেই মুহুরীর খড়ের চালা। নদীতে ভাদ্রের ঢল নামলে চালাঘরের মেটে দাওয়ার কাছে জল উঠে আসে। দু'একখানা ঘর নদীর ভাঙ্গনে তলিয়েও গেছে। সস্ত্রীক ভদ্রলোক সেই খড়ের একখানা চালায় গিয়ে উঠলেন।

বেশি নয়, মাত্র সাত দিন ছিলুম—ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, কিন্তু সেই সাত দিন ধ'রে সেই গ্রামের একটি মেয়ে বিভীষিকার মতো আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ছিল। মেয়েটির বয়স বছর ষোল-সতেরো। গ্রামের সমাজের কাছে সে ছিল হাসি আর কৌতুক। মেয়েটার চেহারার বর্ণনা শুনুন।—কদাকার, কুৎসিত, ট্যারা, ভীষণ মোটা, একটু কুঁজো। গায়ের রং ঘন কালো, একটু খুঁড়িয়ে হাঁটতো। মুখে একটিও কথা বলতো না, কেবল ট্যারা চোখে নির্বাক নিগূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতো। কী বীভৎস, কী অন্তর্ভেদী তা'র দৃষ্টি। পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য, আর যৌবন,—কিন্তু কী কুৎসিত। পরণে ছোট একখানা ময়লা কাপড়, গলা থেকে কোমর অবধি জড়ানো; গায়ে জামা নেই, লজ্জা

নিবারণের এমন কিছু দায়িত্বও সে মানতো না। মেয়েটা নতুন মানুষ আমাদের দেখে অহোরাত্র থাকে আশে পাশে। আমার স্ত্রী প্রায়ই তাকে দেখে আতঙ্কে শিউরে উঠতেন। তাঁকে একা দেখলে মেয়েটা এমন কঠিন-ভাবে এগিয়ে যেতো, যেন খুন করবে! একদিন খাবার সময় হঠাৎ সে এসে সামনে দাঁড়াতেই ঘৃণায় আমাদের খাবার ত্যাগ করতে হলো। স্ত্রী একদিন বমি করলেন তাকে দেখে। কী যে দেখে আমাদের কাছে এসে মুখ তুলে, বুঝিনে। একদিন কিছু পয়সা দিতে গেলুম, মুখ ফিরিয়ে চ'লে গেল। জামা-কাপড় দিতে গেলুম, সরে দাঁড়ালো। খাবার দিতে গেলুম, মুখের কি যেন একটা শব্দ ক'রে মুখ ফিরিয়ে নিল। নিষ্কলঙ্ক অস্পৃষ্ট একটি কুমারী মেয়ে, তা'র প্রতি গ্রামের কারো আসক্তি নেই; তারও কোথাও আকর্ষণ ছিল না।

কিন্তু আমার স্ত্রীর প্রতি তা'র এই ভয়ানক অন্ধ আকর্ষণ দেখে আমি ভয় পেতুম। চাহনিটা লোলুপ, অগ্নিস্রাবী, নিরর্থক। অমাবস্যার রাত্রে করালী মৃণ্ময় প্রতিমা যেমন ভয়ভীষণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, তেমনি। আপনি শুনলে বিস্মিত হবেন, একদিন ভোররাত্রে উঠে দরজা খুলতেই দেখি, গুগ্‌লি দাঁড়িয়ে।—হ্যাঁ, গুগ্‌লিই তা'র নাম। কেন সে সারারাত ছিল ওখানে দাঁড়িয়ে, সহস্র প্রশ্ন ক'রেও উত্তর পেলুম না। সাহস ক'রে তা'র পিঠে সস্নেহে একবার হাত রাখলুম,—কিন্তু আপনি কাদামাখা মহিষের পিঠে হাত দিয়েছেন কখনো? কী মসৃণ ঠাণ্ডা, যেন কোন সরীসৃপের গা,—চিক্কন, পিছল, শীতল। আমার হাতখানা আড়ষ্ট অবশ হয়ে এলো।

বিজয়া দশমীর গভীর রাত্রে আমরা চালাঘরে ঘুমিয়ে। সহসা কপালের কাছে কালো একটা প্রকাণ্ড জন্তুর নিঃশ্বাসে আমার স্ত্রী চিৎকার ক'রে উঠলেন। ধূসর কম্বলে ঢাকা যেন বৃহৎ এক মাংসপিণ্ড আমাদের শিয়রে। হেঁট হয়ে পড়েছে। কী উজ্জ্বল লোলুপ ছোট ছোট চোখ! আমাদের চিৎকারে সবাই ছুটে এলো,—কিন্তু আলো জ্বালার আগেই গুগ্‌লি যে কোথা দিয়ে অদৃশ্য হোলো, দেখতে পেলুম না। পেলুম ভোর বেলায়। আমাদের খাটের তলায় সে গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়েছিল, ভোরের দিকে দরজায় ঝাঁপ তুলে বেরিয়ে চ'লে গেল।

সবাই তাকে দেখে কৌতুক বোধ করে, কিন্তু আমার স্ত্রীর প্রতি তার এই সর্বনাশা আকর্ষণ লক্ষ্য ক'রে আমি যেন আতঙ্কিত হয়ে উঠতুম। মুহুরির অত আতিথেয়তা আর সেবাযত্নের মধ্যে ভাবতুম, কবে পালাবো। মনে

হোতো, মেয়েটা যেন তা'র কঠিন কদাকার আঙুলগুলো দিয়ে বন্যজন্তুর মতো আমাদের ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে চায়। আমার স্ত্রী দিন দুই থেকে যেন কেমন অসুস্থবোধ করছিলেন। হঠাৎ পূর্ণিমার দিন তিনি কেঁদে আমার হাত ধ'রে বললেন, আজকেই ফিরে চলো, তোমার পায়ে পড়ি। আর একদিনো না, একদণ্ডও নয়।

জামরুল গাছের তলায় সন্ধ্যার সময় কি যেন একটা ছায়া দেখে তিনি কাঁপছিলেন। তাঁর অধীর কান্না দেখে আমি হতবাক। বুঝলুম, গত কয়েকদিন থেকে তিনি যেন অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করছিলেন।

বেশ মনে পড়ছে কোজাগরী পূর্ণিমার আশ্চর্য অপরূপ রাত্রি। নদীর জলে-জলে রূপালি আগুন জ্বলছে। কূলে কূলে ভরা কুটিল উজ্জ্বল জল। হ্যাঁ, এমনি সুন্দর রাত। বাঙলার গ্রাম দেখেছেন কখনো জ্যোৎস্নায় নদীর ধারে? রূপালি জলের আকণ্ঠ গদগদ কাকলী শুনেছেন কখনো? কখনো দেখেছেন, আকাশ নেমে এসেছে নদীর জল-জোৎস্নায় অবগাহন করতে? সেদিনকার কোজাগরী ছিল সত্যই আশ্চর্য।

আমাদের বিদায় দেবার জন্য নদীর ধারে গ্রামের অনেকেই এসে দাঁড়িয়েছিল। জিনিসপত্র নৌকোয় উঠলো। কোজাগরী পূর্ণিমার রাত প্রাণ ভ'রে পান করব আমি আর আমার স্ত্রী,—মনে এই আনন্দ অবশ্যই ছিল। কিন্তু গ্রামের অতগুলি নর-নারীর মাঝখানে কুরূপ বীভৎসা গুগ্‌লিকে না দেখে একটু অস্বস্তি বোধ করছিলুম বৈ কি। স্নেহ তাকে করিনি, ঘৃণাও ঠিক তাকে করিনি, তবে ভয় পেয়েছি বৈ কি তাকে দেখে। বেশ বুঝলুম, প্রকৃতির এই সুন্দর পরিবেশের মাঝখানে, এই দিগন্তব্যাপী কবিতার পটভূমিকায় তাকে আসতে দেওয়া হয়নি, কেউ তাকে অন্যত্র সরিয়ে দিয়েছে। এবং আপনিও শুনে আশ্চর্য হবেন, একেবারে চ'লে যাবার আগে আমার স্ত্রী পলকের জন্য গুগ্‌লিকে দেখবেন, এই ছিল তাঁর আশা। অন্ধ লোলুপতার কি বাস্তবিকই কোনো চৌম্বক-শক্তি আছে, আপনি মনে করেন?

বললাম, তারপর?

তিনি বললেন, নৌকা ছাড়ার অন্তিম মুহূর্তেও গুগ্‌লি এসে পৌছতে পারলো না। আপনি হাসবেন না, আমি যেন কেমন একটা বিচ্ছেদের ঘন বেদনা অনুভব করছিলুম। বেশ মনে পড়ে, হাসিমুখে সকলের কাছে বিদায়

নিলুম বটে, কিন্তু কিছু স্নেহ যেন রেখে গেলুম ওই জামরুল-তলায়, ওই কাগ্‌জী লেবুর ডালের ছায়ায়, ওই গাব গাছের পাতায়-পাতায়। আমাদের নৌকো খরস্রোতে নেমে ছুটে চললো দক্ষিণ পথের দিকে। গ্রাম ছাড়িয়ে চ'লে গেল।

আশ্বিনের নদীর ভরা জলে মোটা মোটা সাপ জলের ভিতর থেকে উঠে আছ্‌ড়ে পড়ছিল। মাঝে মাঝে শুশুক ভেসে উঠে আবার তলিয়ে যাচ্ছে। ওরাও যেন কোজাগরী জ্যোৎস্নার তৃষ্ণায় আকাশকে এক একবার লেহন ক'রে নিতে চায়। আরো কতরকম জানোয়ার থাকে জলে,—আমার স্ত্রী সেই খরস্রোতে ভাসা দুরন্ত নৌকার ধারে আড়ষ্ট হয়ে বসেছিলেন।

নৌকার দুই কোণে মাঝি আর দাঁড়ি বসেছিল। সহসা অতর্কিতভাবে আমাদের নৌকো একবার দুলে উঠলো। চেয়ে দেখলুম, স্রোতের সেই অন্তর্গূঢ় কল-কোলাহলের ভিতর থেকে হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড জানোয়ার উঠে তার থাবা তুলে নৌকোর পাড় আঁকড়ে ধরলো। মুহূর্তে কী ঘটলো, ঠিক অনুধাবন করবার আগেই ভয়ার্ত দৃষ্টিতে দেখলুম, গুগ্‌লি! আপনি আশ্চর্য হচ্ছেন, একটি গ্রাম-কুমারীর দুঃসাহস দেখে। নদীর তলা দিয়ে ডুবে-ডুবে সে আমাদের অনুসরণ করেছে, সতি কথা। কিন্তু সেই ঘটনা আমার জীবনে অভিনব। দেখলুম তার জলঝরা এলোচুল বেয়ে নামছে কোজাগরী। পরণে তা'র কিছুই নেই। পিচ্ছিল সর্বাঙ্গ বেয়ে নামছে নদীর ধারা। চিক্কন কালো আর মসৃণ তা'র সর্বাঙ্গ। কিন্তু সেই জ্যোৎস্নালোকে কদাকারা যেন অপরূপ হয়ে উঠলো আমাদের চোখে। চেয়ে দেখলুম, সেই উলঙ্গ বাঘিনীর জলঝরা মুখে এক নধর মধুর হাসি,—যেন বাঙ্গলার গণ্ডগ্রামের আত্মার অপরূপ মূর্তি। তা'র স্বভাব, প্রকৃতি, তা'র কুরূপ যৌবন, তা'র বিকলাঙ্গের লজ্জা, তা'র নিরাবরণ বীভৎস মাংসস্তূপ, সমস্তটাই যেন ভরা জ্যোৎস্নার অবগাহনে অপরূপ সৌন্দর্যে সুন্দর হয়ে উঠলো। সেই দৃশ্য জীবনে কোনদিন ভুলবো না, স্যার।

উদ্‌গ্রীব হ'য়ে বললাম, তারপর?

আমাদের আত্মস্থ হ'তে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগলো। তারপর সকলে কী যে নিষ্ঠুর হয়ে উঠলুম, তা'র কথা বলতে গেলে আজো গা শিউরে উঠে। আমরা আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠলুম, কারণ, নৌকো উল্‌টে গেলে আমরা দুজনে নদীতে তলিয়ে যেতুম। সাঁতার ত জানতুম না! মাঝি আর দাঁড়ি চকিতে বিপদ উপলব্ধি ক'রে ভীষণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো। আজো বুঝতে পারিনি,

মেয়েটা কী লক্ষ্য নিয়ে এসেছিল, কীই বা বলতে চেয়েছিল। কিন্তু ক্ষমা তাকে কেউ করলে না। দাঁড়ি তার দাঁড় তুলে নিয়ে সহসা নির্দয়ভাবে গুগ্‌লির মাথার উপরে এক প্রচণ্ড আঘাত করলো। কী কঠিন নিষ্ঠুরতা, আপনাকে বোঝাতে পারবো না। গুগ্‌লি আমার স্ত্রীর হাতখানা আঁকড়ে ধরতে গিয়েছিল, কিন্তু পারলো না। অবশ হয়ে জলের মধ্যে প'ড়ে গেল। বেশ জানি, সে আঘাতে বেদুইন দস্যুর মাথাও ফেটে যায়! সামান্য একটি মেয়ে কি বাঁচে? অসম্ভব! সমগ্র আকাশ প্লাবিত কোজাগরী সেই রাত্রে আমাদের চোখে রক্তে রাঙা হয়ে উঠলো—স্তম্ভিত হ'য়ে কেবল ব'সে রইলুম। পিছন দিকে নদীর প্রবাহ যতদূর দেখা যায়, গুগ্‌লিকে আর মাথা তুলতে দেখলুম না!

কল্‌কাতায় ফিরে স্ত্রী শয্যা নিলেন। তাঁর সর্বাঙ্গে কেমন যেন সবুজের রং ধরেছিল, যেন গ্রামের ছায়া নামছে তাঁর দেহে। আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, তাঁর কী অসুখ! গুগ্‌লী তা'র অন্তিম পলকে আমার স্ত্রীর হাতখানা আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল, সেজন্য স্ত্রীর হাতে পাওয়া গিয়েছিল সামান্য একটু নখের আঁচড়। সেইটুকু আঁচড়ে তাঁর শরীর বিষাক্ত হয়েছিল, কল্‌কাতার সবচেয়ে বড় ডাক্তারও একথা স্বীকার করেননি। কিন্তু তবু নীল হয়ে এলো স্ত্রীর দেহ। একজন চিকিৎসক শেষকালে বলেছিলেন, স্নায়ু থেকে এই রোগের উৎপত্তি। এক প্রকার চিন্তা আছে, সে বস্তু মস্তিষ্ককে অধিকার করলে নাকি বিশেষ একরূপ বিষাক্ত লালাস্রাব হ'য়ে রক্তকণিকাগুলিকে অধিকার করে। তার ফলে শরীরের ত্বকে লাল, নীল, সবুজ, ধূসর—প্রভৃতি বর্ণের সৃষ্টি হয়। পাশ্চাত্ত্য দেশের আদিম চিকিৎসাশাস্ত্রে নাকি এই জাতীয় রোগের একটা উল্লেখ পাওয়া গিয়েছিল।

এবং আপনি শুনে আশ্চর্য হবেন—মৃত্যুর পরে আমার স্ত্রীর চেহারা অনেকটা গুগ্‌লির মত হয়ে উঠেছিল। হয়ত সূক্ষ্ম কোন যোগাযোগ, হয়ত আমার চোখে ভুল, হয়ত বা সৃষ্টির নিগূঢ় কোনো—

* * * *

মোরাদাবাদ ষ্টেশনে গভীর রাত্রে কখন একখানা ট্রেন এসে দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি। ভদ্রলোকের কথার প্রতি কান রেখে আকাশের দিকে চেয়ে বসেছিলুম

গাড়ীখানা হুইসল্‌ দিয়ে ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একখানা ইণ্টার ক্লাসের দিকে

আমার চোখ পড়লো। ভদ্রলোক ইতিমধ্যে দ্রুত গিয়ে গাড়ীতে উঠেছেন, বুঝতে পারিনি। কিন্তু তাঁর পাশে একজন কুরূপা স্ত্রীলোককে দেখে হঠাৎ বিস্মিত হলুম। এই স্ত্রীলোকটিই পরের গাড়ীতে আসবে, এই কারণেই সম্ভবতঃ তাঁর উদ্বেগ ছিল।

চলন্ত গাড়ী থেকে হাস্যমুখে তিনি আমাকে নমস্কার জানালেন। আমি চেয়েছিলুম তাঁর সঙ্গিনীর দিকে। নারীটি কিছু বয়স্কা,—কিন্তু এমন কুরূপা সহসা চোখে পড়ে না। স্থূলাঙ্গ মাংসল, ছোট ছোট চোখ,—মুখখানা যেন মনে ভয় আনে। সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে নয়, বেশ বোঝা যায়!

অঙ্গার

বছর আষ্টেক হোলো দিল্লীতে আমি চাকরী করছি। কলকাতার সঙ্গে সম্পর্ক কম। কোনো কোনো বছরে কলকাতায় এক আধবার আসি, ঘুরে বেড়িয়ে সিনেমা দেখে আবার ফিরে চলে যাই। নৈলে, ইদানীং আর আসা হয়ে ওঠে না।

বছর তিনেক আগে ফরিদপুর থেকে শোভনা আমাকে চিঠি লিখেছিল—ছোড়দাদা, তুমি নিশ্চয় শুনেছ আজ ছ'মাস হ'তে চললো আমার কপাল ভেঙেছে। ছেলেটাকে নিয়ে কিছুদিন শ্বশুরবাড়ীতে ছিলুম, কিন্তু সেখানেও আর থাকা চললো না। তোমার ভগ্নিপতি এক আধশো টাকা যা রেখে গিয়েছিলেন, তাও খরচ হয়ে গেল। আর দিন চলে না। তুমি আমার মামাতো ভাই হলেও তোমাকে চিরদিন সহোদর দাদার মতন দেখে এসেছি। ছেলেটাকে যেমন ক'রে হোক মানুষ ক'রে তুলতে না পারলে আমার আর দাঁড়াবার ঠাঁই কোথাও থাকবে না। এদিকে যুদ্ধের জন্য সব জিনিসের দাম ভীষণ বেড়ে গেছে। হুটু পাস ক'রে চাকরি খুঁজছে, এখনও কোথাও কিছু সুবিধে হয়নি। মা ভেবে আকুল। ইস্কুলের মাইনে দিতে না পারায় হারুর পড়া বন্ধ হয়ে গেল। বাবার কোম্পানীর কাগজ ভেঙে সব খাওয়া হয়ে গেছে। তুমি যদি এ অবস্থায় দয়া ক'রে মাসে মাসে দশটি টাকা দাও, তাহ'লে অনেকটা সাহায্য হতে পারে। ইতি—

দিল্লীতে আমার এই চাকরির খোঁজ প্রথম পিসেমশাই আমাকে দেন, সুতরাং শোভনার চিঠি পেয়ে স্বর্গত পিসেমশায়ের প্রতি আমার সেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতাটা হৃদয়াবেগের সঙ্গে ঘুলিয়ে উঠলো। সেই দিনই আমি পঁচিশটি টাকা পাঠিয়ে দিলুম এবং শোভনাকে জানালুম, তোর ছেলে যতদিন না উপার্জনক্ষম হয়, ততদিন প্রতি মাসে আমি তোর নামে পনেরো টাকা পাঠাবো।

সেই থেকে শোভনা, পিসিমা, হুটু, হারু—সকলের সঙ্গেই আমার চিঠিপত্রে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। পূজোর সময় এবং নতুন বছরের আরম্ভেও আমি কিছু কিছু টাকা তাদের দিতুম। তিন বছর এইভাবেই চলে এসেছে।

ইতিমধ্যে যুদ্ধের গতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশের কি-প্রকার অবস্থা দাঁড়িয়েছে, অথবা শোভনারা কিভাবে তাদের সংসার চালাচ্ছে, এর পুঙ্খানুপুঙ্খ খোঁজ-খবর আমি নিইনি, দরকারও হয়নি। মাঝখানে বোমার ভয়ে যখন কলকাতা থেকে বহু লোক মফঃস্বলের দিকে এখানে ওখানে পালিয়েছিল, সেই সময় শোভনার চিঠিতে কেবল জানতে পেরেছিলুম, ফরিদপুরে জিনিষপত্রের দর খুব বেড়ে গেছে। অনেক লোক এসেছে—ইত্যাদি। কিন্তু টাকা আমি নিয়মিত পাঠাই, নিয়মিত প্রাপ্তি স্বীকার এবং চিঠিপত্রও আসে। যা হোক এক রকম ক'রে শোভনাদের দিন কাটছে।

কিন্তু প্রায় ছ'মাস আগে মাসিক পনেরো টাকা পাঠাবার পর দিনকয়েক বাদে টাকাটা দিল্লীতে ফেরৎ এলো। জানতে পারলুম ফরিদপুরের ঠিকানায় পিসিমারা কেউ নেই। কোথায় তা'রা গেছে, কোথায় আছে, কিছুই জানা যায়নি। চিঠি দিলুম, তার উত্তর পাওয়া গেল না। আর কিছুকাল পরে আবার মনি-অর্ডারে টাকা পাঠালুম, কিন্তু সে টাকাও যথাসময়ে ফেরৎ এলো। ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে না পেরে চুপ ক'রে গিয়েছিলুম। ভাবলুম, টাকার দরকার হ'লে তারা নিজেরাই লিখবে, আমার ঠিকানা ত' তাদের অজানা নয়।

কিন্তু আজ প্রায় তিন বছর পরে হঠাৎ কলকাতায় যাবার সুযোগ হোলো এই মাত্র সেদিন। আমাদের ডিপার্টমেন্টের সাহেব যাচ্ছেন কলকাতায় তদ্বির-তদন্তের কাজে। আমাকেও সঙ্গে যেতে হবে। ভাবলুম, এই একটা সুযোগ। সপ্তাহ তিনেকের মধ্যে কোনো একটা শনিবারে যাবো ফরিদপুরে, সোমবারটা নেবো ছুটি—দিন দুয়েকের মধ্যে দেখাশোনা ক'রে ফিরবো। একটা কৌতূহল আমার প্রবল ছিল, যাদের বর্তমানে অথবা ভবিষ্যতে কোনো সংস্থান হবার কোন আশা নেই, সেই দরিদ্র পিসিমা আর শোভনা পনেরো টাকা মাসোহারার প্রতি এমন উদাসীন হোলো কেন? শুনেছিলুম, ফরিদপুর টাউনে ইতিমধ্যে কলেরা দেখা দিয়াছিল, তবে কি তাদের একজনও বেঁচে নেই? মনে কতকটা দুর্ভাবনা ছিল বৈ কি।

সাহেবের সঙ্গে কলকাতায় এলুম এবং এসে উঠলুম পাঁচগুণ খরচ দিয়ে এক হোটেলে। এসে দেখছি এই বিরাট মহানগর একদিকে হয়ে উঠেছে কাঙ্গালীপ্রধান ও আর একদিকে চলেছে যুদ্ধ সাফল্যের প্রবল আয়োজন। ফলে, যারা অবস্থাপন্ন ছিল তারা হয়ে উঠেছে বহু টাকার মালিক, আর

যারা গরীব গৃহস্থ ছিল, তা'রা হয়ে এসেছে সর্বস্বান্ত। দেশের সবাই বলছে, দুর্ভিক্ষ; গবর্ণমেণ্ট বলেছেন, না, এ দুর্ভিক্ষ নয়, খাদ্যাভাব। দুটোর মধ্যে তফাৎ কতটুকু সে আলোচনা আপাতত স্থগিত রেখে সপ্তাহখানেক ধরে আমার কর্তব্যস্রোতে গা ভাসিয়ে দিলুম। এর মধ্যে আর কোনোদিকে মন দিতে পারিনি। এইভাবেই চলছিল। কিন্তু ছোট পিসির মেজ ছেলে টুনুর সঙ্গে একদিন শেয়ালদার বাজারের কাছে হঠাৎ দেখা হয়ে যেতেই কথাটা আবার মনে পড়ে গেল। একটা ফুলকাটা চটের থলেতে সের পাঁচেক চাল আর বাঁ-হাতে ডাঁটাশাক নিয়ে সে বিকেলের দিকে পথ পেরিয়ে যাচ্ছিল। দেখা হতেই সে থমকে দাঁড়ালো। বললুম, কিরে টনু?

চমকে সে ওঠেনি, কিছুতেই বোধ হয় সে আর চমকায় না। কেবল তার অবসন্ন চোখ দুটো তুলে সে শান্তকণ্ঠে বললে, কবে এলে ছোড়দা?

তার হাত ধরে বললুম, তোদের খবর কি রে?

খবর?—ব'লে সে পথের দিকে তাকালো। কসাইখানার মিলিটারি মৃত্যুপথযাত্রী রুগ্ন গাভীর মতো দুটো নিরীহ তার চোখ; যেন এই শতাব্দীর অপমানের ভারে সে-চোখ আচ্ছন্ন। মুখ ফিরিয়ে বললে, খবর আর কি? কিছু না।

হাসিমুখে বললুম, এ কি তোর চেহারা হয়েছে রে? পঁচিশ বছর বয়স হয়নি, এরই মধ্যে যে বুড়ো হয়ে গেলি?

আমার মুখের দিকে চেয়ে টুনু বললে, বাংলা দেশে থাকলে তুমিও হতে ছোড়দা—

কথাটায় অভিমান ছিল, ঈর্ষা ছিল, হতাশা ছিল। বললুম, চাল কিনলি বুঝি?

টুনু বললে, না, আফিস থেকে পাই কন্‌ট্রোলের দামে। চারজন লোক, কিন্তু সপ্তাহে ছ'সেরের বেশী পাইনে। এই ত' যাবো, গেলে রান্না হবে। তোমার খবর ভালো. দেখতেই ত' পাচ্ছি। বেশ আছো—আচ্ছা, চলি, যুদ্ধ থামবার পর যদি বাঁচি আবার দেখা হবে।

বললুম, শোভনাদের খবর কিছু জানিস্? তারা কি ফরিদপুরে নেই?

না—ব'লে একটু থেমে টুনু পুনরায় বললে, তাদের খবর আমার মুখ দিয়ে শুনতে চেয়ো না ছোড়দা!

কেন রে? তারা থাকে কোথায়?

বৌবাজারে, তিনশো তেরোর এক্ নম্বরে। হ্যাঁ, যেতে পারো বৈ কি একবার। আসি তা হ'লে—এই ব'লে টুনু আবার চললো নির্বোধ ও ভারবাহী পশুর মতো ক্লান্ত পায়ে।

টুনুর চোখে মুখে ও কণ্ঠস্বরে যেরকম নিরুৎসাহ লক্ষ্য করলুম, তাতে শোভনাদের সঙ্গে দেখা করতে যাবার রুচি চলে যায়। কলকাতায় এসে তারা যদি শহরতলীর আনাচে কানাচে কোথাও ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতো তাহ'লে একটা কথা ছিল। কিন্তু বৌবাজার অঞ্চলের বাসাভাড়াও ত' কম নয়। একটা কথা আমার প্রথমেই মনে হলো, মুটু হয়তো ভালো চাকরি পেয়েছে। আজকাল অন্ন দুর্লভ, চাকরি দুর্লভ নয়। যারা চিরনির্বোধ ছিল, তারা হঠাৎ চতুর হয়ে উঠলো এই সম্প্রতি। একশো টাকার বেশী মাসিক মাইনে পাবার কল্পনা যাদের চিরজীবনেও ছিল না, তারা যুদ্ধ সরবরাহের কন্‌ট্রাক্টে সহসা হয়ে উঠলো লক্ষপতি এবং দুর্ভিক্ষকালে চাউলের জুয়াখেলায় কেউ কেউ হোলো সহস্রপতি। হয়ত মুটুর মতো বালকও এই যুদ্ধকালীন জুয়ায় ভাগ্য ফিরিয়ে ফেলেছে। এ যুদ্ধে কী না সম্ভব?

ওদের খবর নেবো কি নেবো না এই তোলাপাড়ায় আর কাজের চাপে কয়েকটা দিন আরো কেটে গেল। হঠাৎ আফিসের সাহেব জানালেন, আগামীকাল আমাদের দিল্লী রওনা হতে হবে। এখানকার কাজ ফুরিয়েছে।

আমারও এখানে থাকতে আর মন টিঁকছিল না। আমার হোটেলের নীচে সমস্ত রাত ধরে শত শত কাঙালীর কান্না শুনে বিনিদ্র দুঃস্বপ্নে এই ক'টা দিন কোনমতে কাটিয়েছি—আর পারিনে। দুর্গন্ধে কলকাতা ভরা। তবু এখান থেকে যাবার আগে একবারটি পিসিমাদের খবর না নিয়ে যাওয়ার ভাবনায় মন খুঁৎ খুঁৎ করছিল। বিশেষ ক'রে যাবার আগের দিনটা ছুটি পেলুম জিনিসপত্র গুছিয়ে নেবার জন্য। একটা সুযোগও পাওয়া গেল।

বৌবাজারের ঠিকানা খুঁজে বা'র করতে আমার বিলম্ব হলো না। মনে করেছিলুম তারা যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, হঠাৎ গিয়ে দাঁড়িয়ে একটা চমক দেবো। কিন্তু বাড়ীটা দেখেই আমি দিশেহারা হয়ে গেলুম। সামনে একটা গেঞ্জি বোনার ঘর, তার পাশে লোহার কারখানা, এদিকে মনিহারি দোকান, ভিতরে ভূষিমালের আড়ৎ। নীচেকার উঠোনে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখি, নীচের তলাটায় কতকগুলি লোক শোণদড়ির জাল বুনছে ক্ষিপ্রহস্তে। উপর তলাটায় লক্ষ্য ক'রে দেখি, বহু লোকজন। ওটা যে মেসবাসা, তা বুঝতে

বিলম্ব হলো না। একবার সন্দেহক্রমে বাড়ীর নম্বরটা মিলিয়ে দেখলুম। না, ভুল আমার হয়নি—টুনুর দেওয়া এই নম্বরটা ঠিক।

এদিক ওদিকে দুচারজনকে ধরে জিজ্ঞেস-পড়া করতে গিয়ে যখন একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলেছি, দেখি সেই সময়ে বছর বারো তেরো বয়সের একটি মেয়ে সকৌতুকে উপর তলাকার সিঁড়ি বেয়ে মেসের দিকে যাচ্ছে এবং তাকে দেখে চার পাঁচটি লোক উপর থেকে নানারঙ্গে হাতছানি দিচ্ছে। আমি তাকে দেখেই চিনলুম, সে পিসিমার মেয়ে। তৎক্ষণাৎ ডাকলুম, মিনু?

মিনু ফিরে তাকালো। বললুম, চিনতে পারিস্ আমাকে?

না।

তোর মা কোথায়?

ভেতরে।

বললুম, আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল্ দেখি? এ যে একেবারে গোলকধাঁধা! আয় নেমে আয়।

মিনু নেমে এলো। বললে, কে আপনি?

পোড়ারমুখি! ব'লে তা'র হাত ধরলুম,—চল্ ভেতরে, তোর মা'র কাছে গিয়ে বল্‌ব, আমি কে? মুখপুড়ি, আমাকে একবারে ভুলেছিস্?

আমাকে দেখে উপর তলাকার লোকগুলি একটু স'রে দাঁড়ালো। বেশ বুঝতে পাচ্ছিলুম, আমার হাতের মধ্যে মিনুর ছোট্ট হাতখানা অস্বস্তিতে অধীর হয়ে উঠেছে। উপরে উঠতে গিয়ে সে বাধা পেয়েছে, এটা তা'র ভালো লাগেনি। তা'র দিকে একবার চেয়ে আমি নিজেই তার হাতখানা ছেড়ে দিলুম। মিনু তখন বললে, ওই যে, চৌবাচ্চার পাশে গলির ভেতর দিয়ে সোজা চ'লে যান, ওদিকে সবাই আছে।

এই ব'লে সে উপরে উঠে গেল। চোখে মুখে তা'র কেমন যেন বন্য উদ্‌ভ্রান্ত ভাব। এই সেদিনকার মিনু—পরণে একখানা পাৎলা সস্তা ডুরে, চেহারায় দারিদ্র্যের রুক্ষ শীর্ণতা—কিন্তু এরই মধ্যে তারুণ্যের চিহ্ন এসেছে ত'ার সর্বাঙ্গে। তা'র অজ্ঞান চপলতার প্রতি ভীত চক্ষে তাকিয়ে আমি একটা বিষণ্ণ নিঃশ্বাস ফেলে ভিতর দিকে পা বাড়ালুম।

বিস্ময় চমক দেবার উৎসাহ আমার আর ছিল না। সরু একটা আনাগোনার পথ পেরিয়ে আমি ভিতরে এসে দাঁড়িয়ে ডাকলুম, পিসিমা?

কে ?—ভিতর থেকে নারীকণ্ঠে সাড়া এলো এবং তখনই একটি স্ত্রীলোক এসে দাঁড়ালো। বললে, কা'কে চান্ ?

অপরিচিত স্ত্রীলোক। রং কালো, নাকে নাকছাবি, মুখে পানের দাগ, পরণে নীল সাড়ি, আর হাতে কাঁচের চুড়ি। এই প্রকার স্ত্রীলোকের সংখ্যা বৌবাজারেই বেশী। বললুম, তুমি কে ?—এই ব'লে অগ্রসর হ্লুম।

স্ত্রীলোকটি বললে, আমি এখানকার ভাড়াটে।

এমন সময় একটি ছেলে বেরিয়ে এলো। দেখেই চিনলুম, সে হারু। হাসিমুখে বললুম, কি হারু, চিনতে পারিস্ ? তোর মা কোথায় ?

সে আমাকে চিনলো কিনা জানিনে, কিন্তু সহাস্যে বললে, ভেতরে আসুন। মা রাঁধছে।

অগ্রসর হয়ে বললুম, তোর দিদি কোথায় ?

দিদি এখুনি আসবে, বাইরে গেছে। আসুন না আপনি ?

বেলা বারোটা বেজে গেছে, কিন্তু এ বাড়ীর বাসিপাট এখনো শেষ হয়নি। দারিদ্র্যের সঙ্গে অসভ্যতা আর অশিক্ষা মিলে ঘর-দুয়ারের কেমন ইতর চেহারা দাঁড়ায়, এর আগে এমন ক'রে আর আমার চোখে পড়েনি। ছায়ামলিন দরিদ্র ঘর-দুখানার ভিজা দুর্গন্ধ নাকে এলো,—এ-পাশে নর্দমা ও-পাশে কুৎসিত কলতলা। একধারে ঝাঁটা, ভাঙা হাঁড়ি, কয়লা আর পোড়া কাঠকুটোর ভিড় ! ছেঁড়া চটের থলে টাঙিয়ে পায়খানা ও কলতলার মাঝখানে একটা আবরু রক্ষার চেষ্টা হয়েছে। পিসিমাদের মতো শুদ্ধাচারিণী মহিলারা কেমন ক'রে এই নরককুণ্ডে এসে আশ্রয় নিলেন, এ আমার কাছে একেবারে অবিশ্বাস্য। একটা বিশ্রী অস্বস্তি যেন আমার ভিতর থেকে ঠেলে উপরে উঠে এলো।

রান্নার জায়গায় এসে পিসিমাকে পেলাম। সহসা সবিস্ময়ে দেখলাম, তিনি চটাওঠা একটা কলাইয়ের বাটি মুখের কাছে নিয়ে চা পান করছেন। আমাকে দেখে বললেন, একি, নলিনাক্ষ যে ? কবে এলে ?

কিন্তু আমি নিমেষের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলুম তাঁর চা খাওয়া দেখে। পিসিমা হিন্দুঘরের নিষ্ঠাবতী বিধবা, স্নান আহ্নিক পূজা গঙ্গাস্নান, দান-ধ্যান—এইসব নিয়ে চিরদিন তাঁকে একটা বড় সংসারের প্রতিপালিকার আসনে দেখে এসেছি। সদ্যস্নাতা গরদের থান পরা পিসিমাকে পূজা-অর্চনার পরিবেশের মধ্যে দেখে কতদিন মনে মনে প্রণাম ক'রে এসেছি। কিন্তু তিন

বছরে তাঁর একি পরিবর্তন! আমিষ রান্নাঘরে ব'সে ভাঙা কলাইয়ের বাটিতে চা খাচ্ছেন তিনি!

বললুম, পিসিমা প্রণাম করবো। পা ছুঁতে দেবেন?

পা বাড়িয়ে দিয়ে পিসিমা বললেন, কলকাতায় আমরা কমাস হোলো এসেছি, তোমাকে খবর দেওয়া হয়নি বটে। আর বাবা, আজকাল কে কা'র খবর রাখে বলো। চারিদিকে হাহাকার উঠেছে!

আমি একটু থতিয়ে বললুম, পিসিমা—আপনাদের মাসোহারার টাকা আমি নিয়মিতই পাঠাচ্ছিলুম···কিন্তু আজ ছ'মাস হ'তে চললো আপনাদের কোন খোঁজখবর নেই।

খবর আর আমরা কাউকে দিইনি, নলিনাক্ষ!

পিসিমার কণ্ঠস্বর কেমন যেন ঔদাসীন্য আর অবহেলায় ভরা। একদিন আমি তাঁর অতি স্নেহের পাত্র ছিলুম, কিন্তু আজ তিনি যে আমার এখানে অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে খুশী হননি, এ তাঁর মুখ চোখ দেখেই বুঝতে পারি।

হ্যাগা, দিদি—? বলতে বলতে সেই আগেকার স্ত্রীলোকটি হাসিমুখে চাতালের ধারে এসে দাঁড়ালো। পিসিমা মুখ তুললেন। সে পুনরায় বললে, তুমি বাজারে যাবে গা? বাজারে আজ এই এত বড় বড় টাট্কা-তপ্‌সে মাছ এসেছে—একেবারে ধড়ফড় করছে!

তা'র লালাসিক্ত রসনার দিকে তাকিয়ে পিসিমার মুখখানা কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে এলো। তিনি বললেন, তুমি এখন যাও, বিনোদবালা।

এমন উৎসাহজনক সংবাদে ঔৎসুক্য না দেখে ম্লানমুখে বিনোদবালা সেখান থেকে স'রে গেল। পিসিমা বললেন, তোমার কি খুব তাড়াতাড়ি আছে, নলিনাক্ষ?

বিশেষ কিছু না!—ব'লে আমি হাসলুম—আজকের দিনটা আপনাদের এখানে থাকবো ব'লেই আমি এসেছিলুম, পিসিমা।

তা বেশ ত', বেশ ত'—তবে কি জানো বাবা, খাওয়া দাওয়ার কষ্ট কিনা—বলতে বলতে পিসিমা চা খেয়ে বাটি সরিয়ে দিলেন। আমার থাকার কথায় তাঁর দিক থেকে কিছুমাত্র আনন্দ অথবা উৎসাহ দেখা গেল না।

বললুম, শোভনা কোথায়, পিসিমা?

সে আসছে এখুনি, বোধ হয় ও-বাড়ি গেছে।

ঈষৎ অসন্তোষ প্রকাশ ক'রে আমি বললুম, সে কি আজকাল একলা বাসা থেকে বেরোয় ?

পিসিমা বললেন, না, তেমন কই ? তবে তেলটা, নুনটা, মধ্যে মাঝে দোকান থেকে আনে বৈকি। বিনোদবালা যায় সঙ্গে।

পিসিমা তাঁর কথায় দায়িত্ব কিছু নিলেন না, কিন্তু কেমন একটা মনোবিকারে আমার মাথা হেঁট হয়ে এলো। বললুম, শোভনার ছেলেটি কোথায় ? কত বড়টি হয়েছে ?

পিসিমা বললেন, তা'র খুড়ো-জ্যাঠা আমাদের কাছে ছেলেটাকে রাখলো না, নলিনাক্ষ। তাদের ছেলে তা'রা নিয়ে গেছে।

সে কি পিসিমা, অতটুকু ছেলে মা ছেড়ে থাকতে পারবে ? শোভনা পারবে থাকতে ?

তা পারবে না কেন বলো ? এক টাকায় দু'সের দুধও পাওয়া যায় না, ছেলেকে খাওয়াবে কি ? নিজেদেরই হাঁড়ি চড়ে না কতদিন ! অসুখ হ'লে ওষুধ নেই। শাড়ীর জোড়া বার-চোদ্দ টাকা। চা'ল পাওয়া যায় না বাজারে। আর কতদিন চোখ বুজে সহ্য করবো, নলিনাক্ষ ? ভিক্ষে কি করিনি ? করেছি। রাত্তিরে বেরিয়ে মান খুইয়ে হাত পেতেছি!—বলতে বলতে পিসিমা নিঃশ্বাস ফেললেন। পুনরায় বললেন, কই কেউ আমাদের চা'ল ডালের খবর নেয়নি, নলিনাক্ষ !

অনেকটা যেন আর্তকণ্ঠে বললুম, পিসিমা, টুনুদেরও এই অবস্থা। সবাই মরতে বসেছে আজ, তাই কেউ কা'রো খবর নিতে পারে না। টুনুর কাছেই আপনাদের ঠিকানা পেলুম।

পিসিমা এতক্ষণ বসেছিলেন, অতটা লক্ষ্য করিনি। তিনি এবার উঠে দাঁড়াতেই তাঁর ছিন্নভিন্ন কাপড়খানার দিকে চেয়ে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালুম। তিনি বললেন, এ বাড়ির ঠিকানা তুমি আর কাউকে দিয়ো না, বাবা।

এমন সময় মীনু এসে দরজার কাছে চঞ্চল হাসিমুখে দাঁড়ালো। বললে, মা, মা শুনছ ? এই নাও একটা আধুলি···হরিশবাবু দিল—

মীনুর মাথার চুল এলোমেলো, পরণের কাপড়খানা আলুথালু। মুখখানা রাঙা, গলার আওয়াজটা উত্তেজনায় কাঁপছে। অত্যন্ত অধীরভাবে পুনরায় সে

বললে, যোগীন মাস্টার বললে কি জানো মা, আজ রাত্তিরে গেলে সেও আট আনা দিতে পারে।

পিসিমা অলক্ষ্যে আমার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে ঝঙ্কার দিয়ে বললেন, বেরো—বেরো হারামজাদি এখান থেকে। ঝেঁটিয়ে মুখ ভেঙে দেবো তোর।

মীনু যেন এক ফুৎকারে নিবে গেল। মায়ের মেজাজ দেখে মুখের কাছ থেকে স'রে গিয়ে সে অনুযোগ ক'রে কেবল বললে, তুমিই ত' বলেছিলে!

হারু ওপাশ থেকে চেঁচিয়ে উঠলো, ফের মিছে কথা বলছিস্, মীনু? এখন তোকে কে যেতে বলেছিল? মা তোকে রাত্তিরে যেতে বলেছিল না?

পিসিমা ব্যস্তভাবে বললেন, নলিনাক্ষ, তুমি বড্ড হঠাৎ এসে পড়েছ, বাবা। এখন ভারি আতান্তর, তুমি ঘরে গিয়ে বসো গে।

ধীরে ধীরে ঘরের ভিতরে এসে তক্তার মলিন বিছানাটার ওপর বসলুম। গলার ভিতর থেকে কি যেন একটা বারংবার ঠেলে উঠছিল, সেটার প্রকৃত স্বরূপটা আমি কিছুতেই বোঝাতে পারবো না। আমি এই পরিবারের মানুষ, আমি এদেরই একজন, এই আত্মীয় পরিবারেই আমার জন্ম। অথচ আজ মনে হচ্ছে এখানে আমি নবাগত, অপরিচিত ও অনাহূত একটা লোক। যারা আমার পিসিমা ছিল, ভগ্নী ছিল, যাদের চিরদিন আপনার জন ব'লে জেনে এসেছি—এরা তা'রা নয়, এরা বৌবাজারের বিনোদবালাদের সহবাসী, এরা সেই আগেকার সম্ভ্রান্ত পরিজনদের প্রেতমূর্তি!

মনে ছিল না জানালাটা খোলা। বৌবাজারের পথের একটা অংশ এখান থেকে চোখে পড়ে। সেখানে অসংখ্য যানবাহনের জটলা—ট্রাম, বাস, মোটর, গরুর গাড়ি আর মিলিটারী লরির চাকার আঁচড়ানির মধ্যে শোনা যাচ্ছে অগণ্য মৃত্যুপথযাত্রী দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের আর্তরব। জঞ্জালের বালতি ঘিরে ব'সে গেছে কাঙালীরা, পরিত্যক্ত শিশুর কঙ্কাল গোঙাচ্ছে মৃত্যুর আশায়, স্ত্রীলোকদের অনাবৃত মাতৃবক্ষ অন্তিম ক্ষুধার শেষ আবেদনের মতো পথের নালার ধারে প'ড়ে রয়েছে।

জানালাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে এদিকে মুখ ফিরাবো, এমন সময় শুনি হারু আর মীনুর কান্না—পিসিমা একখানা কাঠের চেলা নিয়ে তাদের হঠাৎ প্রহার করতে আরম্ভ করেছেন। উঠে গিয়ে বলবার ইচ্ছা হোলো, তাদের কোনো অপরাধ নেই—নিরপরাধকে অপরাধী ক'রে তোলার জন্য দিকে দিকে যেসব

ষড়যন্ত্রের কারখানা তৈরী করা হয়েছে, 'ওরা সেই ফাঁদে পা দিয়েছে, এইমাত্র। কিন্তু উঠে বাইরে যাবার আগেই, বাইরে শোনা গেল কলকণ্ঠের সম্মিলিত খলখলে হাসি। সেই হাসি নিকটতর হয়ে এলো।

ঘরের কাছাকাছি আসতেই দেখি, বিনোদবালার সঙ্গে শোভনা। আমি তা'কে ডাকতেই সে যেন সহসা আঁৎকে উঠলো। দরজার কাছে এসে শোভনা শিউরে উঠে বললে, একি, ছোড়দাদা? তুমি ঠিকানা পেলে কেমন ক'রে?

বললুম, এমনি এলুম সন্ধান ক'রে। কেমন আছিস্ তোরা শুনি?

নিজের চেহারা এতক্ষণে শোভনার নিজেরই চোখে পড়লো। জড়সড় হয়ে বললে, আমি আশা করিনি তুমি আমাদের ঠিকানা খুঁজে পাবে।

বললুম, কিন্তু আমাকে দেখে কই একটুও খুশী হলিনে ত?

শোভনা চুপ ক'রে রইলো। পুনরায় বললুম, এতদিন বাদে তোদের সঙ্গে দেখা। কত দেশ বেড়ালুম, দিল্লীতে কেমন ছিলুম—এইসব গল্প করার জন্যেই এলুম রে। তোর ছেলেকে পাঠিয়ে দিলি, থাকতে পারবি?

না পারলে চলবে কেন ছোড়দা?

এদিক ওদিক চেয়ে আমি বললুম, কিন্তু এ-বাড়িটা তেমন ভালো নয়, তোরা এখানে আছিস্ কেন শোভা?

এখানে আমাদের ভাড়া লাগে না।

সবিস্ময়ে বললুম, ভাড়া লাগে না? এমন দয়ালু কে রে?

শোভনা বললে, যাঁর বাড়ি সে ভদ্রলোক আমাদের অবস্থা দেখে দয়া ক'রে থাকতে দিয়েছেন।

আজকালকার বাজারে এমন দয়া দুর্লভ!

শোভনা বললে, তাঁর কেউ নেই, একলা থাকেন কিনা তাই—

বোধহয় বিনোদবালা আড়াল থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল, সেই দিকে মুখ তুলে চেয়ে শোভনা সরে গেল। মিনিট পাঁচেক পরে আবার সে যখন এসে দাঁড়ালো, দেখি পাতলা জালের মতন শাড়ীখানা ছেড়ে শোভনা একখানা সরু পাড় ধুতি প'রে এসেছে।

বললুম, শোভনা, তোরা ঠিকানা বদলালি, আমাকে চিঠি দিতে পারতিস্!

ঠিকানা ইচ্ছে ক'রে দিইনি ছোড়দা!

কিন্তু মাসোহারার টাকা নেওয়া বন্ধ করলি কেন রে ?

একটু থতিয়ে শোভনা বললে, ছেলের জন্যেই নিতুম তোমার কাছে হাত পেতে। কিন্তু ছেলে ত' নেই, ছেলে আমার নয়, তাই নেওয়া বন্ধ করেছি।

প্রশ্ন করলুম, তোদের চলছে কেমন ক'রে ?

শোভনা বললে, তুমি আজ এসেছ, আজই চ'লে যাবে—তুমি সে কথা শুনতে চাও কেন ছোড়দা ?

চুপ ক'রে গেলুম। একথা শোনবার অধিকার আমার নেই, খুঁচিয়ে জানবারও দরকার নেই। বললুম, মুটু কোথায় ?

সে লোহার কারখানায় চাকরি করে, টাকা পঁচিশেক পায়। সপ্তাহে সপ্তাহে কিছু চাল-ডাল আনে। আজকাল আবার নেশা করতে শিখেছে, সবদিন বাড়িও আসে না।

বললুম, সে কি, মুটু অমন চমৎকার ছেলে, সে এমন হয়েছে ? হারুর পড়াশুনোও ত' বন্ধ। ও কি করে এখন ?

শোভনা নত মুখে বললে, এই রাস্তার মোড়ে চায়ের দোকানে হারুর কাজ জুটেছিল, কিন্তু সেদিন কতকগুলো খাবার চুরি যাওয়ায় ওর কাজ গেছে। এখন ব'সেই থাকে।

স্বভাবতই এবার প্রশ্নটা এসে দাঁড়ালো শোভনার ওপর। কিন্তু আমি আড়ষ্ট হয়ে উঠলুম। কথা ঘুরিয়ে বললুম, কিন্তু একটা ব্যাপার আমার ভালো লাগেনি, শোভা। মীনুটা এখন যাই হোক একটু বড় হয়েছে, ওকে যখন তখন বাইরে যেতে দেওয়া ভালো নয়। বাড়ীটায় নানা রকম লোক থাকে, বুঝিস্ ত।

বাইরে জুতোর মস্‌মস্ শব্দ পাওয়া গেল। চেয়ে দেখলুম, আধ ময়লা জামাকাপড় পরা একটি লোক এক ঠোঙা খাবার হাতে নিয়ে ভিতরে এল। মাথায় অল্প টাক, খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ—লোকটির বয়স বেশী নয়। চাতালের ওপর এসে দাঁড়িয়ে বললে, কই, বিনোদ কোথা গেলে ? এক ঘটি জল দাও আমার ঘরে। আরে কপাল, খাবারের ঠোঙা হাতে দেখলে আর রক্ষে নেই। নেড়ি কুকুরের মতন পেছনে পেছনে আসে মেয়ে-পুরুষ-গুলো কেঁদে কেঁদে। ছোঁ মেরেই নেয় বুঝি হাত থেকে। পচা আমের খোসা নর্দমা থেকে তুলে চুষছে, দেখে এলুম গো। এই যে, এনেছ জলের

ঘটি, দাও। এ-দুর্ভিক্ষে চারটি অবস্থা দেখলুম, বুঝলে বিনোদ? আগে ঝুলি নিয়ে ভিক্ষে, যদি দুটি চাল পাওয়া যায়। তারপর হোলো ভাঙা কলাইয়ের থাল, যদি চারটি ভাত কোথাও মেলে। তারপর হাতে নিল হাঁড়ি, যদি একটু ফ্যান কেউ দেয়। আর এখন, কেবল কান্না,—কোথাও কিছু পায় না! আরে পাবে কোত্থেকে—গেরস্থরা যে ভাত গুলে ফ্যান খাচ্ছে গো। যাই, দু'খানা কচুরি চিবিয়ে প'ড়ে থাকি। —বলতে বলতে লোকটি ভিতর দিকে চ'লে গেল।

আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি লক্ষ্য ক'রে শোভনা বললে, উনি ছিলেন এখানকার কোন ইস্কুলের মাস্টার। এখন চাকরি নেই। রান্নাঘরের পাশে ওই চালাটায় থাকেন।

একলা থাকেন, না সপরিবারে?

না। ওঁর সবাই ছিল, যখন উপার্জ্জন ছিল। তারপর বড় মেয়েটি কোথায় চলে যায়, স্ত্রী তা'র জন্যে আত্মহত্যা করেন। ছেলে দুটি আছে মামার বাড়ী। ছোড়দা, বলতে পারো আর কত দিন এমনি ক'রে বাঁচতে হবে? এ যুদ্ধ কি কোন দিন থামবে না?

উত্তর দেওয়া আমার সাধ্যের অতীত, সান্ত্বনা দেবারও কিছু ছিল না। চেয়ে দেখলুম শোভনার দিকে। চোখের নীচে তার কালো কালো দাগ, মাথার চুলগুলো রুক্ষ ও বিবর্ণ, সরু সরু হাত দুখানা শির ওঠা, রক্তহীন ও স্বাস্থ্যহীন মুখখানা। যেন যুদ্ধের দাগ তার সর্ব্বাঙ্গে, যেন দেশজোড়া এই দুর্ভিক্ষের অপমানজনক চিহ্ন মুখেচোখে সে মেখে রয়েছে। তার কথায় ও কণ্ঠস্বরে কেমন যেন আত্মদ্রোহিতার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখতে পাচ্ছিলুম। সেদিনকার শান্ত ও চরিত্রবতী শোভনা—আমার ছোট বোন—আজ যেন অসন্তুষ্ট অগ্নিশিখার মতো লক্‌লকে হয়ে উঠেছে। আমার কোন সান্ত্বনা, কোন উপদেশ শোনবার জন্য সে আর প্রস্তুত নয়। কিন্তু আমার অপরিতৃপ্ত কৌতূহল আমাকে কিছুতেই চুপ ক'রে থাকতে দিল না। এক সময়ে বললুম, শোভা, এটা ত' মানিস্, সামনে আমাদের চরম পরীক্ষার দিন। চারিদিকে এই ধ্বংসের চক্রান্তের মধ্যে আমাদের টি'কে থাকতেই হবে। যেমন ক'রেই হোক নিজেদের মান-সম্ভ্রম বাঁচিয়ে—

মান-সম্ভ্রম?—শোভনা যেন আর্তনাদ ক'রে উঠলো—কোথায় মান-সম্ভ্রম, ছোড়দা? আগে বুকের আগুন নিয়ে ছিলুম সবাই, এবার পেটের আগুনে

সবাই খাক্ হয়ে গেলুম! কে বলেছে প্রাণের চেয়ে মান বড়? কোন্ মিথ্যেবাদী রটিয়েছে, আমাদের বুক ফাটে ত' মুখ ফোটে না? ছোড়দা, তুমি কি বলতে চাও, যদি তিল তিল ক'রে না খেয়ে মরি, যদি পোড়া পেটের জ্বালায় ভগবানের দিকে মুখ খিঁচিয়ে আত্মহত্যা করি, যদি তোমার মা-বোনের উপবাসী বাসি মড়া ঘর থেকে মুদ্দোফরাসে টেনে বা'র করে, সেদিন কি তোমাদেরই মান-সম্ভ্রম বাঁচবে? যারা আমাদের বাঁচতে দিলে না, যারা মুখের ভাত কেড়ে নিয়ে আমাদের মারলে, যারা আমাদের বুকের রক্ত চুষে-চুষে খেলে, তাদেরই কি মান-সম্ভ্রম পৃথিবীর ভদ্রসমাজে কোথাও বাড়লো? যাও, খোঁজ নাও, ছোড়দা, ঘরে-ঘরে গিয়ে। কাঙ্গালীদের কথা ছাড়ো, গেরস্থ বাড়ীতে ঢুকে দেখে এসো। কত মায়ের বত্রিশ নাড়ী জ্বলে-পুড়ে গেল দুটি ভাতের জন্যে, কত দিদিমা-পিসিমা- খুড়িমা-বোন-বৌদিদিরা আড়ালে বসে চোখের জল ফেলছে একখানি কাপড়ের জন্যে। অন্ধকারে গামছা আর ছেঁড়া বিছানার চাদর জড়িয়ে কত মেয়ে-পুরুষের দিন কাটছে, জানো? বাসি আমানি নুন গুলে খেয়ে কত লাজুক মেয়ে প্রাণধারণ করছে, শুনেছ? মান-সম্ভ্রম! মান-সম্ভ্রম নিজের কাছেই কি রইলো কিছু, ছোড়দা?

সপ্রতিভ লজ্জাবতী নিরীহ শোভনাকে এতকাল দেখে এসেছি। তার এই মুখর উত্তেজনায় আমার যেন মাথা হেঁট হয়ে এলো। আমি বললুম, কিন্তু কনট্রোলের দোকানে অল্প দামে চাল-কাপড় এসব পাওয়া যাচ্ছে—তোমরা তার কোন স্থবিধে পাও না?

শোভনা আমার মুখের দিকে একবার তাকালো। দেখতে দেখতে তা'র গলার ভিতর থেকে পচা ভাতের ফেনার মতো একপ্রকার রুগ্ন হাসি বমির বেগে উঠে এলো। শীর্ণ মুখখানা যেন প্রবল হাসির যন্ত্রণায় সহসা ফেটে উঠলো। শোভনা হা হা হা ক'রে হাসতে লাগলো। সে-হাসি বীভৎস, উন্মত্ত, নির্লজ্জ এবং অপমানজনকও বটে। আমার নির্ব্বোধ কৌতূহল স্তব্ধ হয়ে গেল।

পিপিমার কাছে মার খেয়ে মীনু ও হারু এসে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদছিল। হঠাৎ তাদের দিকে চেয়ে শোভনা চেঁচিয়ে বললে, কেন, কাঁদছিস্ কেন, শুনি? দূর হয়ে যা সামনে থেকে—

বিনোদবালা যেন কোথায় দাঁড়িয়েছিল, সেখান থেকে গলা বাড়িয়ে বললে, দিদি, মাসি মেরেছে ওদের। ও বাড়ীর হরিশবাবুর কাছ থেকে মীনু পয়সা এনেছিল কিনা—হরু কি যেন ব'লে ফেলেছিল তাই—

শোভনার মাথায় বোধ হয় আগুন ধ'রে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে ঝঙ্কার দিয়ে বললে, মা? কেন তুমি ওদের মারলে শুনি?

পিসিমা কলতলার পাশ থেকে বললেন, মারবো না? কলঙ্কের কথা নিয়ে দুজনে বলাবলি করছিল, তাই বেদম মেরেছি। বেশ করেছি।

কিন্তু ওদের মেরে কলঙ্ক ঘোচাতে তুমি পারবে?

পিসিমা চীৎকার ক'রে উঠলেন, ভারি লম্বা লম্বা কথা হয়েছে তোর, শোভা। এত গায়ের জ্বালা তোর কিসের লা? দিনরাত কেন তোর এত ফোঁসফোঁসানি? কপাল পোড়ালি তুই, মান খোয়ালি, সে কি আমার দোষ? পেটের ছেলেমেয়েকে আমি মারবো, খুন করবো, যা খুশি তাই করবো—তুই বলবার কে?

শোভনা গর্জ্জন ক'রে বললে, পেটের মেয়েরা যে তোমার পেটে অন্ন জোগাচ্ছে, তার জন্যে লজ্জা নেই তোমার? মেরে মেরে মিনুটার গায়ে দাগ করলে—তোমার কী আক্কেল? একেই ত' ওর ওই চেহারা, এর পর ঘর খরচ চলবে কোত্থেকে? লজ্জা নেই তোমার?

তবে আমি হাটে হাঁড়ি ভাঙবো, শোভা—এই ব'লে পিসিমা এগিয়ে এলেন। উচ্চকণ্ঠে বললেন, নলিনাক্ষ আছে তাই চুপ ক'রে ছিলুম। বলি, ফরিদপুরের বাড়িতে ব'সে বিনোদবালার ঠিকানা কে জোগাড় ক'রেছিল? গাড়িভাড়া কা'র কাছে নিয়েছিলি তুই?

অধিকতর উচ্চকণ্ঠে শোভনা বললে, তাহলে আমিও বলি? মাস্টারকে কে এনে ঢুকিয়েছিল এই বাসায়? হরিশ-যোগেনদের কাছে কে পাঠিয়েছিল মীনুকে? আমাকে কেরাণীবাগানের বাসায় কে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল? উত্তর দাও? জবাব দাও? হোটেলের পাউরুটি আর হাড়ের টুকরো তুমি কুড়িয়ে আনতে বলোনি হারুকে? নুটু বাড়ি আসা ছাড়লো কার জন্যে?

মুখ সামলে কথা বলিস্, শোভা?

এমন সময়ে বিনোদবালা মাঝখানে এসে দাঁড়ালো ঝগড়া মিটাবার জন্য। মারমুখী মা ও মেয়ের এই অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য অধঃপতন দেখে আমি আর স্থির থাকতে পারলুম না। উঠে বাইরে এসে দাঁড়ালুম। বললুম, পিসিমা, আপনি স্নান করতে যান। শোভা, তুই চুপ কর্, ভাই। এরকম অবস্থার জন্যে কা'র দোষ দিবি বল্? তোর, আমার, পিসিমার, হারু-মিনুর,—এমন কি ওই বিনোদবালা, মাষ্টারমশাই, হরিশের দলেরও কোন দোষ নেই! কিন্তু

অপরাধ যাদের, তা'রা আমাদের নাগালের বাইরে, শোভা! যাকগে আমি এখন যাই, আবার এক সময়ে আসবো!

শোভনা কেঁদে বললে, আর তুমি এসো না ছোড়দা!

আমি একবার হাসবার চেষ্টা করলুম। বললুম, পাগল কোথাকার!

পিসিমা বললেন, এত গোলমালে তোমার কিছু খাওয়া হোল না বাবা, নলিনাক্ষ। কিছু মনে ক'রো না।

বিনোদবালা বললে, চলো, ঢের হয়েছে! এবার নেয়ে-খেয়ে তৈরি হও দিকি? গলাবাজী করলে ত' আর পেট ভরবে না। পেটটা যাতে ভরে তার চেষ্টা করো। আমি কি আগে জানতুম তোমরা ভদ্দরলোকের ঘর, তাহলে এমন ঝকমারি কাজে হাত দিতুম না!

অপমানিত মুখে পলকের জন্য বিনোদবালার দিকে চোখ তুলে অগ্নিবৃষ্টি ক'রে আমি নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলুম। পাতালপুরীর সুড়ঙ্গলোকের কদর্য-কলুষ রুদ্ধশ্বাস থেকে মুক্তি নিয়ে এসে দাঁড়ালুম রাজপথের ওপর দিগন্ত-জোড়া মুমূর্ষুর আর্তনাদের মধ্যে। এ বরং ভালো, এই অগণ্য ক্ষুধাতুরের কান্না চারিদিকে পরিব্যাপ্ত থাকলেও কেমন একটা দয়াহীন সকরুণ ঔদাসিন্যে এদের এড়ানো চলে। কিন্তু যেখানে চিত্ত-দারিদ্র্যের অশুচিতা, যেখানে দুর্ভিক্ষপীড়িত উপবাসীর মর্মান্তিক অন্তর্দাহ, যেখানে কেবল নিরুপায় দুর্নীতির গুহার মধ্যে ব'সে উৎপীড়িত মানবাত্মা অবমাননার অন্ন লেহন করছে, সেই সংহত বিভৎসতার চেহারা দেখলে আতঙ্কে গলা বুজে আসে।

কিন্তু এরা কে? সেই ফরিদপুরের ছোট্ট বাড়িটিতে ফুলের চারা আর শাকসব্জী দিয়ে ঘেরা ঘরকন্নার মধ্যে আচারশীলা মাতৃরূপিণী পিসিমা, লাজুক একটি সদ্য-ফোটা ফুলের মতন কুমারী ভগ্নী শোভনা, চাঁপার কলির মতন নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক হারু, মুটু, মীনু—এরা কি সেই তা'রা? কেন একটি সুখী পরিবার ধীরে ধীরে এমন সমাজ-নীতিভ্রষ্ট হোলো? কেন তাদের মৃত্যুর আগে তাদের মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু ঘটলো এমন ক'রে? কোন্ দয়াহীন দস্যুতা এর জন্যে দায়ী?

এই কয়মাসের মাসোহারার টাকাটা আমি অনায়াসে খরচ করতে পারি বৈকি। অন্তত দিল্লী যাবার আগে ওদের এই অবস্থায় রেখে চুপ ক'রে চলে যেতে পারিনে। সুতরাং অপরাহ্নকালটা নানা দোকানে ঘুরে-ঘুরে কিছু কিছু

খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করা গেল। শতকরা দশগুণ বেশী দামে চাল এবং পাঁচগুণ বেশী দামে আর সব খাবার জিনিসপত্র এখান ওখান থেকে কিনতে লাগলুম। কিনতে কিনতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। সেটা মাত্র এই বিগত শ্রাবণের কৃষ্ণপক্ষ, টিপ টিপ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে। স্বল্পালোক কলকাতার পথঘাট পেরিয়ে একখানা গাড়িতে জিনিসপত্র তুলে নিয়ে চললুম আবার শোভনাদের ওখানে। নিজের বদান্যতায় কোনো গৌরব বোধ করছিনে, বরং সমস্ত খাদ্যসমগ্রীগুলোকে ঘৃণ্য মনে হচ্ছে। খাদ্য আজ জীবনের সকল প্রশ্নকে ছাপিয়ে উঠেছে ব'লেই হয়ত খাদ্যের প্রতি এত ঘৃণা এসেছে। এসব পদার্থ আগে ছিল ভদ্রজীবনের নীচের তলাকার লুকানো আশ্রয়ে, সেটার কোনো আভিজাত্য ছিল না— আজ সেটা যেন মাথার ওপর চ'ড়ে বসে আপন জাতিচ্যুতির আক্রোশটা সকলের ওপর মিটিয়ে নিচ্ছে!

তবু দুর্গম পথঘাট পেরিয়ে সেগুলো নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হলুম বৌবাজারের বাড়ির দরজায়। বহু পরিশ্রম আর অধ্যবসায় ব্যয় ক'রে দু-তিনজন লোকের সাহায্যে সেগুলো নিয়ে গিয়ে রাখলুম সেই সরু আনাগোনার পথের এক ধারে। মাস তিনেকের মত খাদ্যসম্ভার কিনে এনেছিলুম। জিনিসপত্র বুঝে নিয়ে লোকগুলোকে বিদায় করলুম।

ভিতর দিকে কোথায় যেন একটা কেরোসিনের ল্যাম্প্ জ্বলছিল, তারই একটা আভা এসে পড়েছিল আমার গায়ে। কলতলার ওপাশ থেকে শোনা গেল, নারী-কণ্ঠের সঙ্গে ইস্কুল-মাস্টারের কথালাপের আওয়াজ জড়ানো। তা ছাড়া নীচের তলাটা নিঃসাড়—মৃত্যুপুরীর মতো।

আমি কয়েক পা অগ্রসর হয়ে গেলুম। ডাকলুম, মীনু? হারু?

কোনো সাড়া নেই। যে ঘরখানায় দুপুরবেলায় আমি বসেছিলুম, সে ঘরখানা ভিতর থেকে বন্ধ। বুঝতে পারা গেল, ক্লান্ত হয়ে পিসিমারা সবাই ঘুমিয়েছে। আবার আমি ডাকলুম, মীনু, ও মীনু?

বোধ করি বাইরের থেকে আমার গলার আওয়াজটা ঠিক বোধগম্য হয়নি, ঘরের ভিতর থেকে শোভনা সাড়া দিয়ে বললে, দিনরাত এত আনাগোনা কেন গা তোমার? মীনু ও-বাড়িতে গেছে, আজ তাকে পাবে না, যাও। হতভাগা, চামার!

আমি বললুম, শোভা, আমি রে, আর কেউ নয়, আমি—ছোড়দা। দরজাটা খোল দেখি?

ছোড়দা ?—শোভনা তৎক্ষণাৎ দরজাটা খুলে দিয়ে আমার পায়ের কাছ এসে ব'সে পড়লো। অশ্রুসজল কণ্ঠে বললে, ছোড়দা, পেটের জ্বালায় আমরা নরককুণ্ডে নেমে এসেছি! তুমি আমাকে মাপ করো, তোমার গলা আমি চিনতে পারিনি।

শোভনার হাত ধ'রে আমি তুললুম। বললুম, কাঁদিসনে, চুপ কর্। তোরা ত' একা নয় ভাই, লক্ষ লক্ষ পরিবার এমনি ক'রে মরতে বসেছে। কিন্তু ভেঙে পড়লে চলবে না, এমনি ক'রেই এই অবস্থাকে পেরিয়ে যেতে হবে, শোভা। শোন্, কালকেই আমি দিল্লী যাবো, তাই তাড়াতাড়িতে তোদের জন্যে চারটি চাল-ডাল কিনে আনলুম—ওগুলো তুলে রাখ্।

চাল-ডাল এনেছ? দুর্বল শরীরের উত্তেজনায় শোভনা যেন শিউরে উঠলো। যেন ভাবী ক্ষুধাতৃপ্তির কল্পনায় কেমন একটা বিকৃত উগ্র ও অসহ্য উল্লাস তার কণ্ঠস্বরের মধ্যে কাঁপতে লাগলো। রুদ্ধশ্বাসে সে বললে, তুমি বাঁচালে—তুমি বাঁচালে, ছোড়দা! তোমার দেনা আমরা কোনদিন শোধ করতে পারবো না!—এই ব'লে আমার বুকের মধ্যে মাথা রেখে আমার চিরদিনকার আদরের ভগ্নী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

বললাম, ওর সঙ্গে নতুন জামা-কাপড়ের একটা পুঁটলি রয়েছে, ওটা আগে তুলে রাখ্, শোভা।

শোভনা আমাকে ছেড়ে দিয়ে কেরোসিনের ডিবেটা নিয়ে এসে খাদ্যসামগ্রীর কাছে দাঁড়িয়ে একবার সব দেখলো। তারপর অসীম তৃপ্তির সঙ্গে কাপড়ের বস্তাটা তুলে নিয়ে ঘরের ভিতরে চৌকীর নীচে রেখে এলো। বললে, ছোড়দা, মনে আছে, কোরা জামা-কাপড় পরে লোকের সামনে এসে দাঁড়ানো আমাদের পক্ষে কী লজ্জার কথা ছিল? দোকান থেকে চাল-ডাল এলে লুকিয়ে সেগুলোকে সরিয়ে ফেলতুম—পাছে কেউ ভাবে, চাল কেনার আগে আমাদের বুঝি খাবার কিছু ছিল না! মনে আছে ছোড়দা?

হেসে বললাম, সব মনে আছে রে!

শোভনা করুণকণ্ঠে বললে, তুমি বলতে পারো ছোড়দা, এ দুর্ভিক্ষ কবে শেষ হবে? সবাই যে বলছে, নতুন ধান উঠলে আমাদের আর উপোস করতে হবে না?

তার আর্তকণ্ঠ শুনে আমি চুপ ক'রে রইলুম। কারণ, সরকারী চাকর হলেও ভিতরের খবর আমার কিছুই জানা ছিল না। শোভনা পুনরায়

বললে, ফরিদপুরের সেই মস্ত মাঠ তোমার মনে আছে, ছোড়দা? ভাবো ত, সেই মাঠে আমনের সোনার শীষ পেকেছে, হাওয়ায় তারা ঢেউ খেলছে আনন্দে, মাঠে মাঠে চাষার দল গান গেয়ে কাটছে সেই ধান,—সেই লক্ষ্মীকে ভারে ভারে তারা ঘরে তুলে আনছে! মনে পড়ে?

শোভনার স্বপ্নময় দুটি চোখ হয়ত সেই সোনার বাঙলার মাঠে মাঠে একবার ঘুরে এলো, কিন্তু আমি কেরোসিন ডিবের আলোয় এই নরককুণ্ড ছাড়া আর কোথাও কিছু দেখতে পেলুম না। কেবল নিঃশ্বাস ফেলে বললুম, মনে পড়ে বৈকি।

কিন্তু এ কি শুনছি ছোড়দা? শোভনা আমার মুখের দিকে আবার ফিরে তাকালো। সভয় চক্ষু তুলে সে পুনরায় বললে, গোছা গোছা কাগজ বিলিয়ে আবার নাকি ওরা শুষে নিয়ে যাবে সেই আমাদের ভাঙা বুকের রক্ত? নবান্নর পর আবার নাকি ভরে যাবে আমাদের ঘর কাঙালীর কান্নায়? বলতে পারো, তুমি?

কিছু একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলুম, সহসা বাইরে কা'র পায়ের শব্দ পেয়ে শোভনা সচকিত আতঙ্কে অন্ধকারের দিকে ফিরে তাকালো। তারপর কম্পিত অধীরকণ্ঠে সে বললে, ছোড়দা, এবার তুমি যাও, তোমার অনেক রাত হয়ে গেছে। এখন নিশ্চয় ন'টা—আমার মনে ছিল না, নিশ্চয় ন'টা বেজেছে। এবার তুমি যাও ছোড়দা!

এগুলো তুলে রাখ্ আগে সবাই মিলে?

রাখবো, ঠিক রাখবো—একটি একটি চাল-ডালের দানা গুণে গুণে রাখবো—কিন্তু এবার তুমি যাও, ছোড়দা। আলো ধরছি....তুমি যাও, একটুও দেরী ক'রো না...লক্ষ্মীটি ছোড়দা...

শোভনা চঞ্চল অস্থির উদ্দাম হয়ে এসে আমাকে যখন একপ্রকার টেনে নিয়ে যাবে, সেই সময় একটি লোক চাল-ডালের বস্তার ওপর হোঁচট খেয়ে ভিতরে এসে দাঁড়ালো। একেবারে গায়ের উপর এসে প'ড়ে বললে, ওঃ, নতুন লোক দেখছি। চাল-ডাল এনে একেবারে নগদ কারবার।

লোকটার পরণে একটা খাকি সার্ট, সর্বাঙ্গে কেমন একটা নেশার দুর্গন্ধ। আমি বললুম, কে তুমি?

আমি কারখানার ভূত, স্যার।—এই ব'লে হঠাৎ শোভনার একটা হাত ধরে ঘরের দিকে টেনে নিয়ে বললে, এসো, কথা আছে।

কথা কিচ্ছু নেই, ছাড়ো। ব'লে শোভনা তার হাতখানা ছাড়িয়ে নিল।

বটে!—লোকটি ভুরু বাঁকিয়ে বললে, আগাম একটা টাকা দিইনি কাল?

রুদ্ধশ্বাসে শোভনা বললে, বেরিয়ে যাও বলছি ঘর থেকে?

বাঃ—বেরিয়ে যাবো ব'লে বুঝি এলুম দেড় মাইল হেঁটে? বেশ কথা বলে পাগ্‌লি!

চীৎকার ক'রে শোভনা বললে, বেরোও বলছি শিগ্‌গির? চলে যাও—দূর হয়ে যাও ঘর থেকে—

লোকটা বোধ হয় তক্তাখানার ওপর বসবার চেষ্টা করছিল। হেসে বললে, আজ বুঝি আবার খেয়াল উঠলো?

শোভনা আর্তনাদ ক'রে উঠলো—ছোড়দা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছ তুমি? এ অপমানের কি কোনো প্রতিকার নেই?······দাঁড়াও, আজ খুন করবো—বঁটিখানা······

বলতে বলতে ছুটে সে বেরুলো—রান্নাঘরের দিকে চললো। লোকটা এবার উঠে বাইরে এলো। বললে, মশাই, এই নিয়ে মেয়েটা আমাকে অনেকবারই খুন করতে এলো, বুঝলেন? আসলে মেয়েটা মন্দ নয়, কিন্তু ভারী খেয়ালী! তবে কি জানেন স্যার, আমরা হচ্ছি 'এসেন্‌সিয়াল্ সার্ভিসের' লোক, যুদ্ধের কারখানায় লোহা-লক্কড় নিয়ে কাজ করি—মেয়েমানুষের মেজাজ-টেজাজ অত বুঝিনে! এসব জানে ওই 'আই-ই' মার্কা লোকগুলো, ওরা নানারকম ভাঁড়ামি করতে পারে!

এমন সময় উন্মাদিনীর মতন একখানা বঁটি হাতে নিয়ে শোভনা ছুটে বেরিয়ে এলো। পিসিমা ধড়মড়িয়ে এলেন, হারু ছুটে এলো। লোকটি শান্তকণ্ঠে বললে, আচ্ছা, আচ্ছা, আর খুন করতে হবে না, দেখছি আজ খেয়ালের ভূত চেপেছে ঘাড়ে। আচ্ছা—এই যাচ্ছি স'রে।

বিনোদবালা আর পিসিমা দৌড়ে এসে ধ'রে ফেললেন শোভনাকে।

লোকটি পুনরায় নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বললে, বেশ, সেই ভালো। বিনোদের ঘরে রইলুম এ-রাত্তিরটার মতন। কিন্তু মাঝ রাত্তিরে আমাকে নিশ্চয় ডেকে ঘরে নিয়ো, নৈলে কিছুতেই আমার ঘুম হবে না, বলে রাখলুম।—আচ্ছা, বেশ, কাল না হয় আড়াই সের চাল'ই দেওয়া যাবে। আয় বিনোদ, তোর ঘরে যাই। বলতে বলতে বিনোদের হাতখানা টেনে নিয়ে সেই কদাকার লোকটা ইস্কুল-মাস্টারের ঘরের দিকে চ'লে গেল।

শোভনা সহসা আমার পায়ের ওপর লুটিয়ে প'ড়ে হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে লাগলো। বললে, কবে, কবে ছোড়দা, কবে এই রাক্ষুসে যুদ্ধ থামবে, তুমি ব'লে যাও। তুমি ব'লে যাও, কবে এই অপমানের শেষ হবে, আমাদের মৃত্যুর আর কতদিন বাকি?

আস্তে আস্তে আমি পা ছাড়িয়ে নিলুম। শোভনার হৃৎপিণ্ড থেকে আবার রক্ত উঠে এলো। বললে, তুমি যেখানে যাচ্ছ, সেখানে যদি কেউ মানুষ থাকে, তাদের ব'লো এ যুদ্ধ আমরা বাধাইনি, দুর্ভিক্ষ আমরা আনিনি, আমরা পাপ করিনি, আমরা মরতে চাইনি....

শোভনা কাঁদুক, সবাই কাঁদুক। আমি অসাড় ও অন্ধের মতো হাতড়ে হাতড়ে সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা বাইরে এসে পথে নামলুম। অন্ধকারে কোথাও কিছু দেখতে পেলুম না। শুধু অন্ধকার, অনন্ত অন্ধকার। কেবল মনে হলো, অঙ্গারের আগুন যেমন পুড়ে পুড়ে নিস্তেজ হয়ে আসে, তেমনি মহানগরের ক্ষুধাশ্রান্ত কাঙ্গালীরা চারিদিকে চোখ বুজে পথে-ঘাটে নালা-নর্দমায় শুয়ে মৃত্যুর পদধ্বনি কান পেতে শুনছে!

শেষ